GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

Class No. 182.৯৮.

Book No. 914.6.

N. L. 38.

MGIPC—S8—37 LNL/55—14-3-56—30,000.

৩য় বর্ষ, ১ম খণ্ড। ১৩২৪

জ্যৈষ্ঠ — কার্ত্তিক, ১৩২৪ (1917)

নারায়ণ

RARE BOOK

মাসিক পত্র

NATIONAL LIBRARY
Imp 39185
28|4|07
CALCUTTA

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪ সাল

সূচী

	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
১।	পয়্-আহারী বাবা (কবিতা)	শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী	৪৮১
২।	বাঙ্গলার কথা	....	৪৮৫
৩।	তিনুর মা	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৩৮
৪।	সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য	শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত	৫৪৬
৫।	বিরহে পাগল	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫৫২

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"বসুমতী" প্রেসে,—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

182.Rb.917.6

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ১ম সংখ্যা] [জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৪

পয়্-আহারী বাবা *

গোলাপের গাজীপুরে, লোকালয় হ'তে দূরে
পাহাড়ের প্রান্তে, এক নিভৃত গুহায়,—
ভূমানন্দে নিগমন, করুণার প্রস্রবণ,
যোগ-মগ্ন যতি এক জীবন গোঁসায়।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি মানে, স্তব্ধ, স্থির মহাধ্যানে,
নিমগ্ন নিয়ত সাধু আপনার মনে ;
নাহি করে দৃক্‌পাত, বহে' যায় দিন-রাত ;
মুদিত নয়ন দু'টি বসি' পদ্মাসনে।

বহুদিন এইমত সমাধিতে হ'লে গত,
মাঝে-মাঝে কভু উঠি', খুলি' গুহা-দ্বার,
সম্মুখে জাহ্নবী-নীরে অবগাহি', ধীরে ধীরে,
আসনে আসিয়া পুনঃ বসেন আবার।
সেই পুণ্য শুভক্ষণে মহাত্মার দরশনে,
কত শত নর-নারী সেথা আসি' ভিড়ে ;
ভক্তিভরে যুক্তকরে কেহ স্তব-স্তুতি করে,
কেহ বা প্রণমে সেই সিদ্ধ সন্ন্যাসীরে।

---

* ঠাকুর শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী-মহাপ্রভুর কৃপা-ভাজন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী-প্রণীত "শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ" পুস্তকে কথিত একটি সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত।—লেখক।

কত ধনী, কত দীন, কত পাপী তাপী হীন,
আসে সেথা লভিবারে দু'টি উপদেশ ;
সাধুও সে জনে জনে প্রেমামৃত-বরিষণে
ভুলাইয়া-দেন যত দুঃখ-তাপ-ক্লেশ ।
সন্ন্যাসী নিষ্কামী, তবু আসে সেথা যেবা কভু
রিক্ত হস্তে নাহি আসে,—যথাসাধ্য যা'র,
প্রণমি' সে শ্রীচরণ, করে তাহা নিবেদন
ফল-মূল, ভক্ষ্য, পেয়, অর্থ, বস্ত্র-ভার ।
সন্ন্যাসী সে উপহারে ফুল্ল-মুখে, নির্ব্বিচারে,
একে একে সমুদায় তখনি সেথায়
সমবেত অগণন দুঃখী-দীনে বিতরণ
করিয়া হাসেন,—নেত্রে অশ্রু বহে' যায় !
সেই মহা পুণ্যক্ষণে মুহুর্মুহুঃ সে বিজনে
শত কণ্ঠে জগদীশ-জয়ধ্বনি ওঠে,
সংসারের জ্বালা-জীর্ণ পাপ-ক্লিন্ন, শুষ্ক, শীর্ণ,
শত-প্রাণে সে লগনে প্রেম-পুষ্প ফোটে ।
এই ভাবে সে দয়াল বৈরাগীও বহুকাল
সবার কল্যাণ সাধি' সে প্রদেশে থাকে,
পয়ঃ মাত্র পান করি', রহিতেন দেহ ধরি',
"পয়্-আহারী বাবা" সবে তা'ই তাঁকে ডাকে ।

মুক্ত করি' নেত্র দু'টি, সমাধি হইতে উঠি',
একদা প্রত্যূষে সাধু খুলি' গুহা-দ্বারে,
"জয় গুরু ভগবান্" কহি, বাহিরিয়া যান
অদূরে জাহ্নবী-স্রোতে স্নান করিবারে ।
অপরাহ্নে পূর্ব্বদিন তথা গুটি দুই তিন
ধনবান্ গৃহী বন্দি' পাদপদ্ম তাঁর,
বহুমূল্য দ্রব্যরাশি উপহার দেছে আসি,'
আজো সে সকলি আছে গুহার মাঝার ।
তস্কর সে ভাগ্যবান্ লভি' সুখে এ সন্ধান,
সুযোগ অন্বেষি' ছিল নিকটে লুকায়ে,
গুহা-দ্বার খোলা রেখে' সাধু স্নানে গেল, দেখে'
সে-ও তথা ব্যগ্র হ'য়ে এল দ্রুত-পায়ে ;
গুহাতলে প্রবেশিতে এ কি,—শঙ্কা কেন চিতে ?
সে তখন উঁকি দিয়ে দেখে ক্ষণতরে,
কেহ নাই চারিভিতে জানিয়া, নিশ্চিন্ত-চিতে
প্রবেশিল তথা । দেখে—দ্রব্য স্তরে স্তরে

রয়েছে সাজানো সেই গুহা-মাঝে। "কেহ নেই
—সাবাস্‌!" কহিয়া, চোর একে, একে, একে,
মূল্যবান্‌ যেইগুলি বাছি' ত্বরা লয় তুলি,'
বাঁধিতে পুঁটুলি পিছে চে'য়ে চে'য়ে দেখে।
এ কি কাণ্ড অসম্ভব! শুনে' কা'র কণ্ঠরব
চমকিয়া ওঠে চোর স্কন্ধে বোঝা নিতে?
তাড়াতাড়ি চারিধারে চে'য়ে দেখে বারে বারে,—
ভ্রম বুঝে', নিজ মনে লাগিল হাসিতে।
স্থির হ'য়ে, পুঁটুলীটে শেষে, তুলি' নিল পিঠে;
গুহা হ'তে বাহিরিয়া, দু'পদ চলিয়া,
হেরি' কাছে সন্ন্যাসীরে, ফেলে দিল বোঝাটিরে,
মহাত্রাসে, উর্দ্ধশ্বাসে পলাল ছুটিয়া।
ছুটিতে ছুটিতে শেষে থামে গৃহ-দ্বারে এসে।
চাহিয়া পশ্চাতে পুনঃ কাঁপে "থর-থর",—
সেই বোঝা শিরোপর লইয়া, সন্ন্যাসিবর
ধাইয়া আসিছে পিছে, ও কি ভয়ঙ্কর!
তস্করের কাছে আসি' 'পয়্‌-আহারী' সন্ন্যাসী
নামায়ে পুঁটুলীটিরে অবসন্নদেহে,
বিশ্রাম লভিয়া, পরে কহিলা কম্পিত-স্বরে,
—চোরের সর্ব্বাঙ্গে কর বুলাইয়া স্নেহে—
"বৃদ্ধ আমি অতিশয়, এতও কি কভু সয়,
যষ্টি ভর করে' চলা কষ্টকর মোর,
অথর্ব্ব এ বৃদ্ধ' শিরে এত বড় বোঝাটিরে
বহিবারে রেখে এলি? ওরে, মনে তোর
কিছুই কি মায়া নাই? নে রে বুঝে,' নে রে ভাই,
তোর দ্রব্য তোরে এনে' দিয়ে গেনু আমি।
'জীতা রহ বাপজান!— জয় গুরু-ভগবান্‌!'
এত বলি' উঠিলেন পয়্‌-আহারী স্বামী।

নির্ব্বাক্‌ বিস্ময়ে ভোর এতক্ষণ ছিল চোর,
ঠাকুর উঠিয়া যেই চলিলা আশ্রমে,
অমনি সে পদে পড়ি,' কেঁদে' ওঠে 'হা হা' করি,'
বুকে হানি' কর, কহে,—"প্রভু গো, অধমে
হে দয়াল, ক্ষম, ক্ষম, পাষণ্ড নারকী, মম
কেহ নাই, কিছু নাই ও গো ও ঠাকুর!
রক্ষা কর, ক্ষম মোরে!" কহি' চোর ভূমি'পরে
আছাড়িয়া পড়ে।

করুণা-জড়িত স্বরে কহে সাধু প্রেম-ভরে—
"এতে তো তোমার কিছু অপরাধ নাই ;
অনশনে, অনাহারে পার নাই সহিবারে,
এ আশ্রমে দয়া ক'রে এসেছিলে তাই।
রাশি রাশি দ্রব্যভার প্রয়োজন নাহি যার,—
ল'য়ে সে সকল, তুমি গুহাটিরে মোর
করিয়াছ পরিষ্কার। এ যে দয়া বিধাতার।
তবে ভাই, বৃদ্ধ আমি, আমার উপর,
—আমারি একার ঘাড়ে এত বড় বোঝাটিরে
ফেলে না এলেই হ'ত ন্যায় বিবেচনা।
যাক্ ভাই, এর তরে কি হয়েছে? স্থির হ' রে!
এস মোর বুকে এস,—কেঁদ না, কেঁদ না!"

তস্কর তখন তাঁর পদে নমি' একবার,
শ্রীচরণ-পুণ্য-রজ সর্ব্ব অঙ্গে মাখি',
"পতিতপাবন হরি প্রভু দীনবন্ধু!" স্মরি'
মুছে নিল দু'টি করে ধীরে সিক্ত আঁখি,
তার পরে, একবার ঊর্দ্ধপানে চাহি', কা'র
অভয় ইঙ্গিত কিবা যেন লক্ষ্য করি',
দু' বাহু গগনে তুলি' চলে' গেল হেলি' দুলি'।
বহুক্ষণ শোনা গেল—"হরি, হরি, হরি"!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

বাঙ্গলার কথা

আজ বাঙ্গালীর মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি, আপনারা আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, আপনাদের আদেশ শিরোধার্য্য। আজ এই মিলন-মন্দিরে আমার যোগ্যতা অযোগ্যতা লইয়া জটিল কুটিল অনেক প্রকার বিচারের মধ্যে বিনাইয়া বিনাইয়া বিনয় প্রকাশ করিয়া আমার ও আপনাদের সময় অযথা নষ্ট করিব না। দেশের নায়ক হইবার অধিকারের যে অহঙ্কার, তাহা আমার নাই, কিন্তু আমার বাঙ্গলাকে আমি আশৈশব সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছি, যৌবনে সকল চেষ্টার মধ্যে আমার সকল দৈন্য, সকল অযোগ্যতা, অক্ষমতা সত্ত্বেও আমার বাঙ্গলার যে মূর্ত্তি, তাহা প্রাণে প্রাণে জাগাইয়া রাখিয়াছি, এবং আজ এই পরিণত বয়সে আমার মানস-মন্দিরে সেই মোহিনী মূর্ত্তি আরও জাগ্রত জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে! এই যে আশৈশব ও আজীবন শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহার অভিমান আমার আছে। সেই প্রেম জ্বলন্ত প্রদীপের মত আমাকে পথ দেখাইয়া দিবে। আপনাদের সকলের সমবেত যে যোগ্যতা, তাহাই আমাকে আশ্রয় করিয়া আমাকে যোগ্য করিয়া তুলিবে।

সেই ভরসায় আজ আমি আপনাদের সম্মুখে বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি। যে কথাগুলি অনেক দিন ধরিয়া আমার প্রাণে জাগিয়াছে, যে সব কথা আমার জীবনের সকল রকমের চেষ্টা ও অভিজ্ঞতার মধ্যে আরও ভাল করিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, যে কথাগুলিকে সত্য বলিয়া জীবনের ধ্যান-ধারণার বিষয় করিয়াছি, সে সব কথাগুলি আপনাদের কাছে নিবেদন করিব। যাহা সত্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, তাহা প্রকাশ করিতে আমার কোন ভয় হয় না, লজ্জা হয় না। হয় তো আমাদের শাসন-কর্ত্তাদের কাছে আমার অনেক কথা অপ্রিয় লাগিবে, হয় তো আমার অনেক কথার সঙ্গে আপনাদের অনেকের মনের মিল হইবে না। কিন্তু "সত্যম্ ব্রূয়াৎ প্রিয়ম্ ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যম্ অপ্রিয়ম্," এই বচনের এমন অর্থ নহে যে, যাহা সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছি, এবং যাহা প্রকাশ করিবার আবশ্যকতা আছে, তাহা করিও না। সে তো কাপুরুষের কথা, দেশ-ভক্তের রীতি নহে। যে সত্য আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছে, যাহাকে চক্ষের সম্মুখে দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে ঢাকিয়া রাখিতে হইলে যে পাটোয়ারী বুদ্ধির আবশ্যক, তাহা আমার নাই। আর নাই বলিয়া তার জন্য কোনও অনুতাপও হয় না। তাই আজ যে কথাগুলি সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করি, সেই কথাগুলি প্রিয়ই হউক, কি অপ্রিয়ই হউক, অম্লানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে আপনাদের কাছে নিবেদন করিব।

প্রথমেই হয় তো অনেকেরই মনে হইবে যে, এই মহাসভা শুধু রাজনৈতিক আলোচনার জন্য, এই সভায় বাঙ্গলার কথার আবশ্যক কি? এই প্রশ্নই আমাদের ব্যাধির একটি লক্ষণ। সমগ্র জীবনটাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া লওয়া আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা ও সাধনের স্বভাববিরুদ্ধ। আমরা ইউরোপ হইতে ধার করিয়া এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি, এবং এই ধার-করা জিনিষ ভাল করিয়া বুঝি নাই বলিয়া আমাদের অনেক পরিশ্রম, অনেক চেষ্টাকে সার্থক করিতে পারি নাই। যে জিনিষটাকে আমরা রাজনীতি বা Politics বলিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, তাহার সঙ্গে কি সমস্ত বাঙ্গলা দেশের, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির একটা সর্ব্বাঙ্গীন সম্বন্ধ নাই? কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পারে, আমাদের জাতীয় জীবনের কোন্ অংশটা রাজনীতির বিষয়, কোন্ অংশটা অর্থনীতির ভিত্তি, কোন্ অংশটা সমাজনীতির প্রাণ, আর কোন্ অংশটা ধর্ম্মসাধনের বস্তু? জীবনটাকে মনে মনে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া, এই সব মনগড়া জীবন-খণ্ডের মধ্যে কি আমরা অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলিয়া দিব? এই কাল্পনিক প্রাচীরবেষ্টিত যে কাল্পনিক জীবন-খণ্ড, ইহারই মধ্যে কি আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা সাধনা আবদ্ধ থাকিবে? আমাদের রাজনৈতিক আলোচনা বা আন্দোলনের যে বিষয়, তাহাকে কি বাঙ্গালী জাতির যে জীবন, সেই জীবনের সব দিক্ দিয়া দেখিতে চেষ্টা করিব না? যদি না দেখি, তবে কি সত্যের সন্ধান পাইব?

কথাটা একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট করিয়া বোঝা যায়। রাজনীতি কাহাকে বলে? এই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? আমাদের সাধনায় ইহার কোন বিশিষ্ট নাম নাই, আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ ইহার নামকরণ করার আবশ্যক তা মনে করেন নাই। ইউরোপীয় সাধনায় যাহাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে, তাহার উদ্দেশ্য সঙ্ক্ষেপে বলিতে গেলে রাজায় প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা নির্ণয় করা এবং এই সম্বন্ধের মধ্যে যে একটা নিত্য সার্ব্বভৌমিক সত্য নিহিত আছে, তাহাকে প্রকাশ করা। ঐ মতে রাজনৈতিক আন্দোলন বা আলোচনার বিষয় কোন জাতির বা দেশের পক্ষে রাজা প্রজায় কি রকম সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। বাঙ্গলার রাজনৈতিক আন্দোলনের অর্থ এই যে, আমাদের দেশে রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ, তাহা পরীক্ষা করা ও কিরূপ হওয়া উচিত, তাহাই বিচার করা। অর্থাৎ সমস্ত রাজ্যটা সদ্ভাবে ও সৎপথে চালনা করিতে হইলে যে শক্তির প্রয়োজন, তাহা কতটা রাজার হাতে থাকিবে, কতটা প্রজার হাতে থাকিবে, তাহাই বিচার ও নির্ণয় করা।

কিন্তু ঐ যে রাষ্ট্রীয় চিন্তা বা চেষ্টা, ইহার সার্থকতা কোথায়? এক কথায় বলিতে হইলে, যে কথা অনেকবার শুনিয়াছি, তাহাই বলিতে হয়, বাঙ্গালীকে মানুষ করিয়া তোলা। বাঙ্গালী যে অমানুষ, তাহা আমি কিছুতেই স্বীকার করি না। আমি যে আপনাকে বাঙ্গালী বলিতে একটা অনির্ব্বচনীয় গর্ব্ব অনুভব করি, বাঙ্গালীর যে একটা নিজের সাধনা আছে, শাস্ত্র আছে, দর্শন আছে, কর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে, বীরত্ব আছে, ইতিহাস আছে, ভবিষ্যৎ আছে! বাঙ্গালীকে যে অমানুষ বলে, সে আমার বাঙ্গলাকে জানে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, বাঙ্গালীর কতকগুলা দোষ আছে, যাহার সংশোধন আবশ্যক এবং সেই ভাবে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, বাঙ্গালী অমানুষ। তাহাকে মানুষ করিয়া তোলাই রাষ্ট্রীয় চেষ্টা বা চিন্তার উদ্দেশ্য, এবং সেই জন্যই আমাদের দেশে রাজা প্রজায় যে সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করা অবশ্যক। কিন্তু আমাদের দেশে রাজা প্রজায় কি সম্বন্ধ হওয়া উচিত, তাহা বিচার করিতে গেলে, আমাদের যে এখন ঠিক কি অবস্থা, তাহার বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের আর্থিক অবস্থা কিরূপ, তাহা বিচার করিতেই হইবে। সেই বিচার করিতে হইলে, আমাদের চাষাদের চাষের সন্ধান লইতে হইবে। আমাদের চাষের সন্ধান ভাল করিয়া লইতে হইলে, আমাদের চাষ বাড়িতেছে কি কমিতেছে, তাহার খোঁজ রাখিতে হইবে। সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে হইবে, কেন আমাদের পল্লীগ্রাম ছাড়িয়া, অনেক লোক সহরে আসিয়া বাস করে, সেই কারণ অনুসন্ধান করিতে হইলে বিচার করিতে হইবে যে, সে কি পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের জন্য, কি অন্য কোন কারণে? সেই সঙ্গে সঙ্গে অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক হইবে। ইহাতেই দেখা যাইতেছে যে, রাজনীতির সাধন করিতে হইলে আমাদের চাষাদের অবস্থা চিন্তা করা আবশ্যক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গ্রামের অস্বাস্থ্যের কারণ অনুসন্ধান করাও আবশ্যক।

সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার করিতে হইবে, আমাদের দেশে যত চাষ-যোগ্য জমী আছে, সব ভাল করিয়া চাষ করিলেও আমাদের অবস্থা সহজ সচ্ছল হয় কি না। যদি না হয়, তবে ব্যবসাবাণিজ্যের কথা আলোচনা ও বিচার করিতে হইবে।

এই সব কথা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে আমাদের চাষের প্রণালী কিরূপ ছিল, আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, কেমন করিয়া আমরা গ্রামের স্বাস্থ্যরক্ষা করিতাম, এ সব কথা তলাইয়া বুঝিতে হইবে।

শুধু তাহাই নহে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা আলোচনা করিতে হইবে। কেমন করিয়া আমরা শিক্ষা বিস্তার করিতাম, কেমন করিয়া আমরা আপনাকে শিক্ষিত করিয়া

লইতাম এবং এখন বর্ত্তমান অবস্থায় আমাদের শিক্ষা-প্রণালী কি রকম হওয়া উচিত, রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে এই সব কথারই বিচার আবশ্যক।

শুধু তাহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য্য, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে আমাদের সমাজের কি সম্বন্ধ ছিল এবং তাহাতে আমাদের কতটা উপকার, কতটা অপকার সাধিত হইতেছে, এ কথাকেও তাচ্ছিল্য করা যায় না। কি সম্বন্ধ ছিল, তাহা ভাল করিয়া না বুঝিতে পারিলে আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় কি সম্বন্ধ থাকা উচিত, কিরূপে তাহার মীমাংসা হইবে? এই প্রশ্নের মীমাংসা যদি না করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় শক্তির কতটা রাজার হাতে, কতটা আমাদের হাতে থাকা উচিত, এই প্রশ্নের বিচারই বা কেমন করিয়া হইবে?

শুধু ইহাই নহে। আমাদের কৃষিকার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া বড় বড় সামাজিক ব্যবহার পর্য্যন্ত আমাদের সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চেষ্টা ও সকল সাধনার সঙ্গে আমাদের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ ছিল ও আছে, তাহার বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য। সে দিকে চোখ না রাখিলে সব দিক্‌ই যে অন্ধকার দেখিব! সব প্রশ্নই যে অকারণে অস্বাভাবিক-ভাবে জটিল ও কঠিন হইয়া উঠিবে। সেই দিকে দৃষ্টি না রাখিলে কোন মীমাংসাই সম্ভবপর হইবে না।

আমাদের অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। কিন্তু আমাদের সব চেয়ে বেশী বিপদ যে, আমরা ক্রমশঃই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারে অনেকটা ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছি। রাজনীতি বা Politics শব্দটি শুনিবামাত্র আমাদের দৃষ্টি আমাদের দেশ একেবারে অতিক্রম করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া পঁহুছায়। ইংরাজের ইতিহাসে এই রাজ-নীতি যে আকার ধারণ করিয়াছে, আমরা সেই মূর্ত্তিরই অর্চ্চনা করিয়া থাকি। বিলাতের জিনিষটা আমরা যেন একেবারে তুলিয়া আনিয়া এই দেশে লাগাইয়া দিতে পারিলেই বাঁচি। এ দেশের মাটীতে তাহা বাড়িবে কি না, তাহা ত একবারও ভাবি না। Purke-এর বুলি যাহা স্কুলে কলেজে মুখস্থ করিয়াছিলাম, তাহাই আওড়াই, Gladstoneএর কথামৃত পান করি আর মনে করি, ইহাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চরম। "Seely'র Expansion of England" নামে যে পুস্তক আছে, তাহা হইতে বাছা বাছা বচন উদ্ধার করি। Sidgwickএর কেতাব হইতে কথার ঝুড়ি টানিয়া বাহির করি, ফরাসী স্কুল, জার্ম্মান স্কুল এবং ইউরোপে রাজনীতির যত স্কুল আছে, সব স্কুলের কেতাবে, কোরাণে যত ধারাল বাক্য আছে,একেবারে এক নিঃশ্বাসে মুখস্থ করিয়া ফেলি, আর মনে করি, এইবার আমরা বক্তৃতা ও তর্কে অজেয় হইলাম, দেখি আমাদের শাসনকর্ত্তারা কেমন করিয়া আমাদের তর্ক খণ্ডন করেন। মনে করি, রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু তর্ক-বিতর্কের বিষয়—বক্তৃতার ব্যাপার মাত্র। আমরা তর্ক করিয়া,বক্তৃতা

করিয়া জিতিয়া যাইব। আমাদের সকল উদ্যম ও সকল চেষ্টার উপরে আমাদের ধার-করা কথার ভার চাপাইয়া দিই। যাহা স্বভাবতঃ সহজ সরল, তাহাকে মিছামিছি বিনা কারণে জটিল করিয়া তুলি। শুধু যাহা আবশ্যক,তাহা করি না; দেশের প্রতি মুখ তুলিয়া চাই না,বাঙ্গলার কথা—বাঙ্গালীর কথা ভাবি না,আমাদের জাতীয় জীবনের ইতিহাসকে সর্ব্বতোভাবে তুচ্ছ করি। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার দিকে একেবারেই দৃক্‌পাত করি না। কাযেই আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন অসার, বস্তুহীন। তাই এই অবাস্তব আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রাণের যোগ নাই, এই কথা হয় ত অনেকে স্বীকার করিবেন না। কিন্তু স্বীকার না করিলেই কি কথাটা মিথ্যা হইয়া যাইবে? আমরা চোখ বুজিয়া থাকিলেই কি কেহ আমাদের দেখিতে পাইবে না? আমরা যে শিক্ষিত বলিয়া অহঙ্কার করি, আমরা দেশের কতটুকু স্থান অধিকার করিয়া থাকি? আমরা কয় জন? দেশের আপামর সাধারণের সঙ্গে আমাদের কোথায় যোগ? আমরা যাহা ভাবি, তাহারা কি তাই ভাবে? সত্য কথা বলিতে হইলে কি স্বীকার করিব না যে, আমাদের উপর আমাদের দেশবাসীদের সেরূপ আস্থা নাই? কেন নাই? আমরা যে ভিতরে ভিতরে ইংরাজী ভাবাপন্ন হইয়াছি। আমরা যে ইংরাজী পড়ি ও ইংরাজীতে ভাবি, এবং ইংরাজী তর্জ্জমা করিয়া বাঙ্গলা বলি ও লিখি, তাহারা যে আমাদের কথা বুঝিতে পারে না। তাহারা মনে করে, নকলের চেয়ে আসলই ভাল। আমরা যে তাহাদের ঘৃণা করি। কোন্ কাযে তাহাদের ডাকি? Governmentএর কাছে কোনও আবেদন করিতে হইলে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইয়া একটা বিরাট্ সভার আয়োজন করি, কিন্তু সমস্ত প্রাণ দিয়া কোন্ কাযে তাহাদের ডাকি? আমাদের কোন্ কমিটীতে কোন্ সমিতিতে চাষা সভ্য-শ্রেণীভুক্ত? কোন্ কায তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহাদের মত লইয়া করি? যদি না করি, তবে কেন অবনতমস্তকে আমাদের ক্রটী স্বীকার করিব না? কেন সত্য কথা বলিব না? মিথ্যার উপর কোনও সত্য বা সত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাই বলিতেছিলাম, আমাদের যে রাজনৈতিক আন্দোলন, ইহা একটা প্রাণহীন, বস্তুহীন, অলীক ব্যাপার। ইহাকে সত্য করিয়া গড়িতে হইলে বাঙ্গলার সব দিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে। বাঙ্গলার যে প্রাণ, তাহারই উপর ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম, আজ এই মহাসভায় আমি বাঙ্গলার কথা বলিতে আসিয়াছি।

কিন্তু আমি যে বিপদের কথা বলিয়াছি, তাহার জন্য নিরাশ হইবার কোনই কারণ নাই। আমাদের এ অবস্থা প্রকৃতপক্ষে অস্বাভাবিক হইলেও ইহার যথাযথ কারণ আছে। ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের দেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্ব্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম্ম একেবারেই নিস্তেজ

হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে চিরপুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দুধর্ম্ম কেবল-মাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিব-শক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল; অপর দিকে যে অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মবলে মহাপ্রভু সমস্ত বাঙ্গলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্ম্মের অনন্ত মহিমা ও প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলক-কাটা ও মালা-ঠক্‌ঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাঙ্গলার হিন্দুর সমগ্র ধর্ম্মক্ষেত্র শক্তি-হীন শাক্ত ও প্রেম-শূন্য বৈষ্ণবের ধর্ম্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তখন নবদ্বীপের চিরকীর্ত্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা—অতীত কাহিনী। বাঙ্গালী জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সমন্ধ ছিল না। এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি জ্ঞানে বাঙ্গলার হিন্দু তখন সর্ব্ববিষয়ে প্রাণহীন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। আলিবর্দ্দি খাঁর পর হইতেই বাঙ্গলার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক্-বেশে আগমন করিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্ব্বলতানিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্ব্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজী সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারি-লাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহ বশতঃ আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূর দুর্গম পথকে সহজ ও সন্নিকট মনে করিয়া, সেই পথেই অগ্রসর হয়, আমরাও ঠিক সেইরূপ নিজের ধর্ম্ম কর্ম্ম সকলই অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে "বিজ্ঞা-নের তূর্য্যধ্বনি" করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রাম-মোহন যে গম্ভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে ত আমা-দের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন, সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তার পর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল। তার পর বঙ্কিম সর্ব্বপ্রথমে বাঙ্গলার মূর্ত্তি গড়িলেন,—প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। বঙ্গ-

জননীকে দর্শন করিলেন। সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্" তাহারই গান গাহিলেন। সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।" কিন্তু আমরা ত তখন সে মূর্ত্তি দেখিলাম না; সে গান শুনিলাম না!. তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।" তার পর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশের অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন, আমাদের অশেষ উপকার-সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা লইয়া অলোচনা করা আমি অনাবশ্যক মনে করি। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অন্ধ ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালী জাতির, অন্ততঃপক্ষে শিক্ষিত বাঙ্গালীর আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস—একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তার পর আরও দিন গেল। ১৯০৩খৃঃ হইতে স্বদেশী আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল। বাঙ্গালী আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"বাংলার মাটী বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্"

বাঙ্গলার জল বাঙ্গলার মাটী আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল।

কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকে জ্ঞানী গুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাঁহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশী আন্দোলন ইহা একটা বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্থ করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহঙ্কার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যাঁরা জ্ঞানী, তাঁহারা সব জিনিষ সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। তাঁহারা অঙ্কশাস্ত্রের শাস্ত্রী, সব জিনিষ লইয়া আঁক কসিতে বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে বন্যা, সে ত অঙ্ক-শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপ-কাটী ভাসাইয়া লইয়া যায়। স্বদেশী আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। প্রাণ যখন জাগে, তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে ত হিসাব করিয়া জন্মায় না। না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহা বন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া, বাঁচিয়াছি। বাঙ্গলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাই-

য়াছি। বাঙ্গলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাঙ্গলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধন-সঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এ দেশে আসিল, বুঝিলাম, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ়র্ম কি? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্ত্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি
তোমারি প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—

সেই মাকে দেখিলাম চিনিলাম। বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধি কোথায়! বুঝিলাম, কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্ম্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙ্গালী হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, খৃষ্টান হউক, বাঙ্গালী বাঙ্গালী। বাঙ্গালার একটা বিশিষ্ট রূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙ্গালীর একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে, কর্ত্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙ্গালীকে প্রকৃত বাঙ্গালী হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙ্গালী সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্টসৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপবৈচিত্র্যে বাঙ্গালী একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাঙ্গলা সেই রূপের মূর্ত্তি। আমার বাঙ্গলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ। যখন জাগিলাম, মা আমার আপনার গৌরবে তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন। সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল। দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে রূপ অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—আমি সে রূপের বালাই লইয়া মরি।

স্বদেশী আন্দোলন হিসাব না করিয়াই আসিয়াছিল, হিসাব না করিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু এখন আমাদের হিসাব করিবার সময় আসিয়াছে, মা দেখা দিয়াছেন—এখন

যে পূজার আয়োজন করিতে হইবে। হিসাব করিয়া ফর্দ্দ তৈয়ারি করিতে হইবে, হিসাব করিয়া পূজার উপকরণ সংগ্রহ করিতে হইবে। এই যে মহা বন্যায় দেশ ভাসিয়া গিয়াছিল, এখন যে, সব পতিত জমী আবাদ করিয়া সোনা ফলাইতে হইবে। বিশ্বাস রাখিও, সোনা ফলিবেই।

এখন আমাদের ইহাই বিচার্য্য যে, কেমন করিয়া এই নব-জাগ্রত বাঙ্গালী জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তুলিতে পারি। সেই কারণে সেই দিক্ দিয়াই দেখিতে হইবে, আমাদের বিকাশের জন্য কি কি আবশ্যক এবং তাহা কি করিয়া পাইতে পারি।

এই বিচার লইয়াই সম্প্রতি একটা গোল বাধিয়াছে। ইউরোপে নাকি কোন কোন পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন যে, এই যে জাতিগত ভাব—ইংরাজীতে যাহাকে "Nation Idea" বলে, ইহা নাকি একেবারেই কাল্পনিক, কোন বস্তুর উপরে প্রতিষ্ঠিত নহে। কোন বিশিষ্ট জাতির নাকি কোন একটা স্বতন্ত্র মূল নাই। প্রত্যেক জাতির রক্তের মধ্যে অন্যান্য জাতির রক্ত মিশ্রিত আছে। আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল বিষয়েই ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে আদান-প্রদান চলিয়াছে এবং এই আদান-প্রদানের মধ্যে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহা কোন বিশিষ্ট জাতির জাতিত্বের ফল নহে। এই জাতিত্বের ভাব পোষণ করিলে নাকি জাতিতে জাতিতে সংগ্রাম ও সংঘর্ষ বাড়িয়া যাইবে ও সমগ্র মানবজাতির অমঙ্গলের কারণ হইয়া উঠিবে। কথাটি অনেকদিনকার, কিন্তু বর্ত্তমান যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আবার নূতন করিয়া প্রচারিত হইতেছে, কাযেই আমাদের দেশেও দুই একজন পণ্ডিত তাহা ধরিয়া বসিয়াছেন, এবং এই মতের জোরেই আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতীয় জীবনাকাঙ্ক্ষাকে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন। ইউরোপের এই মত ইউরোপে অনেক বড় বড় পণ্ডিত অনেকবার খণ্ডন করিয়াছেন; আমি ভরসা করি, এবারও করিবেন। তাঁহাদের সমস্যা তাঁহারাই পূরণ করিবেন। কিন্তু সূর্য্যের চেয়ে বালীর তাপ বেশী; আমাদের দেশে এই সব নকল পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্য এত বেশী যে, তাহাদের কোন মতকে কিছুতেই খণ্ডন করা যায় না। এমন কি, যে রবীন্দ্রনাথ সেই স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জলকে সত্য করিবার কামনায় ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ— এখন স্যার রবীন্দ্রনাথ—এবার আমেরিকায় ঐ মতটি নাকি খুব জোরের সঙ্গে জাহির করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত বক্তৃতাটি কোন কাগজে প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং পড়িতে পারি নাই, Modern Reviewতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পড়িয়াছি, হয় ত সমস্ত না পড়িতে পাইয়া তাঁহার মতের সম্বন্ধে ভুল ধারণা করিয়াছি, কিন্তু যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, সেই মতের, এই ক্ষেত্রে

বাঙ্গালী জাতির এই মহাসভায় সভাপতির আসন হইতে প্রতিবাদ হওয়া উচিত মনে করি।

এই সমস্ত মতটাই বস্তুহীন, বিশ্বমানবের ছায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমস্ত মানবজাতির মধ্যে সত্য ভ্রাতৃভাব জাগাইতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন জাতিসমূহকে বিকশিত করিতে হইবে। তাহার পূর্ব্বে এই ভ্রাতৃভাব অসার কল্পনা মাত্র। জাতি তুলিয়া দিলে বিশ্বমানব দাঁড়াইবে কোথায়? যেমন প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশ না হইলে একটি পরিবারের উন্নতি হয় না, যেমন পরিবারসমূহের উন্নতি না হইলে সমাজের উন্নতি হয় না, যেমন সমাজের উন্নতি না হইলে জাতির উন্নতি হয় না, ঠিক তেমনি সেই একই কারণে সকল ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্ট জাতির উন্নতি না হইলে সমগ্র মানবজাতির উন্নতি হয় না। বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, সে রক্ত আর্য্যই হউক কি অনার্য্যই হউক, কি আর্য্য-অনার্য্যের মিশ্রিত রক্তই হউক, যাহা সত্য, তাহা সত্যকামের মত স্বীকার করিতে বাঙ্গালী কখনও কুণ্ঠিত হইবে না—বাঙ্গালীর শিরায় শিরায় যে রক্তই প্রবাহিত হউক না কেন, বাঙ্গালী যে বাঙ্গালী, সে কথা আর ত সে ভুলিতে পারে না, সে যে বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জলে বাড়িয়া উঠিয়াছে, বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জলের সঙ্গে নিত্যই যে তাহার আদান-প্রদান চলিতেছে। আর সেই আদান-প্রদানের মধ্যে যে একটা নিত্য সত্য জাগ্রত সম্বন্ধের সৃষ্টি হইয়াছে, সেই সম্বন্ধের উপর বাঙ্গলার জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা। অন্যান্য জাতির সহিত ব্যবসাবাণিজ্য শিক্ষা-দীক্ষায় যে আদান-প্রদান, তাহাও এই জাতিত্বের লক্ষণ। জাতিত্বের গুণেই এক জাতি দান করিতেও সক্ষম হয়, গ্রহণ করিতেও সক্ষম হয়। ইহা সেই জাতির অবস্থার বিষয়, স্বভাবের বিষয়। তার পর বিরোধের কথা, জাতিত্বের প্রভাবে যে কতকটা বিরোধ জাগিয়া উঠে, তাহা অস্বীকার করা চলে না। সেও যে জাতির স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তা বলিয়াই জাতিগুলাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। প্রত্যেক পরিবারমধ্যে প্রত্যেক সমাজে বিরোধ-বিসংবাদ ত লাগিয়াই আছে, তা বলিয়াই কি সেই ব্যক্তিগুলার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হইবে, না উড়াইয়া দিতে হইবে? শত প্রকারের বিরোধ-বাদ বিসংবাদের মধ্যেই মানুষ মানুষ হইয়া উঠে ও মিলনের পথ খুঁজিয়া পায়। এই যে সব বিশিষ্ট জাতিসমূহ, ইহাদের পক্ষেও ঐ কথাই খাটে। এই বিরোধ-বিসংবাদ সংঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যেই এই সব বিশিষ্ট জাতি সমস্ত মানবজাতির যে মিলন-মন্দির, সেই দিকে অগ্রসর হইতেছে ও হইবে।

সংসারে প্রত্যেক জিনিষের প্রত্যেক ভাবের দুইটা মুখ আছে, এই যে বাদবিসংবাদ, ইহারও দুইটা মুখ। আমরা এক মুখ দেখি আর এক মুখ দেখি না। বিরোধ আছে চক্ষে দেখিতেছি, মনে জানিতেছি, ইহাকে অস্বীকার করিতে পারি না, কিন্তু এই

বিরোধেরই অপর মুখে যে মিলন, তাহা দেখিতে পাই না বলিয়া অস্বীকার করিয়া থাকি। ইউরোপে আজ যে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত, এই অনলে ইউরোপের সকল ঈর্ষা, বিদ্বেষ, দৈন্য, অপার শক্তির অভিমান-জনিত যে হীনতা, অসীম স্বার্থপরতার যে মলিনতা, সব পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইতেছে। আমি দেখিতেছি, চক্ষে স্পষ্ট দেখিতেছি, এই পবিত্র ভস্ম-সমাধির উপরে ইউরোপ তাহার মিলন-মন্দির রচনা করিতেছে। সকল প্রকার হীনতা ও স্বার্থপরতার ধর্ম্মই এই যে, সে নিজের আবেগে নিজের বিনাশ-সাধন করে এবং সেই বিনাশের মুখে পরানুরক্তি জাগাইয়া দেয়। সেই পরানুরক্তি না জাগিলে যথার্থ মিলন অসম্ভব। অনেকে হয় ত মনে করেন, এই যে কলিযুগের কুরুক্ষেত্র, ইহাতে ইউরোপের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। আমি বলি, কখনও না। সকল যুদ্ধক্ষেত্র যে ধর্ম্মক্ষেত্র, সকল ইতিহাস যে ভগবৎলীলার পূত পুণ্যকাহিনী, ভারতের কুরুক্ষেত্রের ফলে কি তখনকার ভারত মিলনপথে অগ্রসর হয় নাই? নবজীবন লাভ করে নাই? আর্য্য অনার্য্যের মধ্যে কি একটা স্বাভাবিক মিলন সংঘটিত হয় নাই? আমরা অমঙ্গলের দিক্‌টাই দেখি, কিন্তু তাহার সঙ্গে জড়িত যে মঙ্গল, সেই দিক্ দেখিতে ভুলিয়া যাই।

ইউরোপ আজ অসীম দুঃখ কষ্ট, যাতনা-বেদনা, অর্দ্ধ অনশনের মধ্যেই মিলন-পথে পা বাড়াইয়া আছে। অহঙ্কারের অবসান না হইলে প্রেমের জন্ম হয় না। এই যে দুঃখ-কষ্ট আজ ইউরোপকে ব্যথিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা সেই প্রেম-মিলনের আগমন-প্রতীক্ষার প্রসববেদনা। এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দেখিতে পাইবে, ইউরোপ আপনার স্বার্থপরতাকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বাস করিয়ো, একদিন দেখিবে, যে প্রবল অপ্রতিহত বেগে ইউরোপ আজ তাহার স্বার্থ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে এবং সমস্ত প্রাণ পণ দিয়া সেই স্বার্থপরতাকেই পোষণ করিতেছে, সেই ইউরোপ তেমনি: অপ্রতিহত বেগে ঠিক সেই রকম সমস্ত প্রাণপণ দিয়া সে নিজের ও জগতের যথার্থ মঙ্গল-সাধন করিতেছে। এই সমর, এই বিরোধ যে জাতিত্বের ফল, তাহা আমি স্বীকার করি. কিন্তু এই সমরক্ষেত্রের অপর পারে যে মিলনমন্দির রচিত হইতেছে, তাহাও যে এই জাতিত্বেরই ফল, সে কথা অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? যদি কোন দিন সুদূর ভবিষ্যতে সমস্ত মানবজাতি লইয়া একটা যুক্তরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে যে, তখন সমস্ত বিশিষ্ট জাতিগুলি নিজ নিজ স্বভাব-ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করিয়া অপূর্ব্বরূপে বিকশিত হইয়াছে এবং সেই যুক্তরাজ্যে সকল জাতিরই সমান অধিকার। কিন্তু আমার মনে হয়, এই বিশিষ্ট জাতিসমূহ সেই অবস্থায় উপস্থিত হইলে সমস্ত মানবজাতির কল্যাণের জন্য কোন রাজত্বেরই আবশ্যক হইবে না।

এই যে বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বের দাবী, ইহার সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথার

আলোচনা আবশ্যক। আমি এমন কথা শুনিয়াছি--আমার কাছেই অনেকে বলিয়াছেন যে—আমাদের পক্ষে জাতিত্বের গৌরব করা নিতান্ত অসঙ্গত, কারণ, এই যে জাতিত্বের ভাব, ইহার সমস্তটাই আগাগোড়া বিলাতের আমদানি--একটা ধারকরা সামগ্রী মাত্র। এটা যে তাঁহাদের বুঝিবার ভুল, তাহা আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমি আগেই বলিয়াছি, কোন একটা বিশিষ্ট দেশের সঙ্গে সেই দেশবাসীদের যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহারই উপরে জাতিত্বের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, এ সম্বন্ধ যাহা নিত্য আবহমান কাল হইতে আছে ও চিরদিনই থাকিবে, তাহার প্রতি এতকাল এমনভাবে আমাদের চোখ পড়ে নাই; হইতে পারে, আমাদের সভ্যতা ও সাধনায় এই সম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট নাম রাখা হয় নাই; ইহাও হইতে পারে, ইউরোপীয় সভ্যতা ও সাধনা, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিজ্ঞান, ইতিহাস লইয়া এমন করিয়া হুড়মুড় করিয়া আমাদের ঘাড়ের উপর না পড়িলে, হয় ত এত সহজে এত শীঘ্র আমাদের জাতিত্বের চৈতন্য হইত না—তাহা বলিয়া কি যাহা আমাদের, আমাদেরই দেশের, যাহা বাঙ্গলার মাটী বাঙ্গলার জলের সঙ্গে অণুতে অণুতে প্রাণে প্রাণে জড়াইয়া আছে, তাহাকে বিলাতের আমদানি বলিয়া সমস্ত বাঙ্গালীজাতিকে অপমান করিব? যাহা চিরকাল আছে, তাহাকে দেখিতে পাই নাই, বুঝিতে পারি নাই বলিয়া কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, তাহার কোন অস্তিত্বও ছিল না? বিজ্ঞান-জগতে যে বড় বড় সত্য আবিষ্কার হইয়াছে, সে সব সত্যই যে সনাতন—তাহাদের সত্তা বা অস্তিত্ব ত কোন বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবিদের উপরে নির্ভর করে না? মাধ্যাকর্ষণ যেমন নিউটনের জন্মাইবার আগেও ছিল, আমাদের জাতির জাতিত্ব তেমনি ইংরাজ আসিবার আগেও ছিল। আমরা দেখিতে পাই নাই বলিয়া যে ছিল না, তাহা নহে। ইউরোপ হইতে একটা বিপরীত সভ্যতা আসিয়া আমাদের জীবনে আঘাত করিল, সেই আঘাতে আমাদের চৈতন্য হইল, সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের জাতির যে জাতিত্ব, তাহার সাক্ষাৎ পাইলাম। এমন করিয়াই ত মনুষ্য-জীবনে আত্মজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা হয়, বাহিরের রূপ ইন্দ্রিয়ের ভিতর দিয়া আত্মাকে আঘাত করে, সেই আঘাতেরই ফলে আমরা আপনাকে দেখিতে পাই, কিন্তু যাহা দেখি, তাহা ত বাহিরের নয়, তাহা আমাদের প্রাণের বস্তু। আমাদের নবজাগ্রত বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব, তাহা আমাদেরই প্রাণবস্তু, বিদেশের নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় ভগবৎ-কৃপায় আমাদেরই প্রাণের মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি—তাহাকে ধার করিয়া সাত সমুদ্র তের নদী পার করিয়া লইয়া আসি নাই।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথার বিচার ও আলোচনার আবশ্যক। আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি, আমাদের দেশে ইংরাজের আগমন বিধির বিধান। আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ ১৯১৫খৃঃ অব্দের কংগ্রেসের সভাপতির

অভিভাষণে এই কথাই বলিয়াছিলেন—এই কথার গূঢ় মর্ম্ম কি, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলিয়া থাকি। এই দুইটি কথাই মূলে এক কথা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভবপর কিনা, এই বিষয়ে যে অনেক মতভেদ আছে। সেই সব ভিন্ন ভিন্ন মতের মর্ম্ম কথাটি কি, তাহা তলাইয়া বুঝিলে জাতির জাতিত্বের কথা আরও পরিষ্কার হইয়া উঠিবে। Keepling লিখিয়াছিলেন—"The East is East, and the West is West, never the twain shall meet" অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য চিরকালই ভিন্ন ভিন্ন থাকিবে, তাহাদের মিলন অসম্ভব।

আবার বিলাতে ও আমাদের দেশে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা বলেন যে, এই মিলন একেবারে অবশ্যম্ভাবী। স্যার রবীন্দ্রনাথ এবার আমেরিকায় বলিয়াছেন যে—জাতির বদলে একটা Universal brotherhood of mankind হইবে অর্থাৎ সমস্ত মানবজাতি ভ্রাতৃভাবে একত্র হইবে। বোম্বাইএর কংগ্রেসে স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন বলিয়াছেন :

"The East and the West have met—not in vain. The invisible scribe, who has been writing the most marvellous history that has ever been written, has not been idle. Those who have the discernment and the inner vision to see will note that there is only one goal, there is only one path."

অর্থাৎ—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন ব্যর্থ হয় নাই, যে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষ এতাবৎকাল পর্য্যন্ত রচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যে আশ্চর্য্য লেখা লিখিতেছেন, তিনি ত নিশ্চিন্ত হইয়া নাই। যাঁহাদের বিচারবুদ্ধি ও দিব্য চক্ষু আছে, তাঁহারা বলিবেন যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের একই ইষ্ট, একই পন্থা। এই বিষয়ে আমি যতই চিন্তা করি, মনে হয়, এই দুইটা কথাই সত্য, আবার দুইটা কথাই মিথ্যা, ইহার কোনটাই একেবারে সত্য নয়। দুইটা একেবারে বিপরীত রকমের সভ্যতা ও সাধনা লইয়া এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, ইহাদের মধ্যে মিলনের সম্ভাবনা কোথায়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বদলে আমি ইংলণ্ড ও বাঙ্গলা দেশ ধরিয়া লই, তাহা হইলে কথাটা অনেক পরিমাণে সরল হইয়া আসিবে। এই মিলন কত প্রকারে হইতে পারে, তাহা বিচার করা যা'ক্। আমাদের ও ইংরাজের মিলনের মর্ম্ম যদি এই হয় যে, আমরা ইংরাজের ইতিহাসের সাহায্যে সেই ছাঁচে গড়িয়া উঠিব অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশটা একটা নকল ইংলণ্ড হইবে, আমাদের নর নারী নকল সাহেব-মেম হইয়া উঠিবে, আমাদের শিক্ষাপ্রণালী ঠিক হুবহু বিলাতের মত হইবে, আমাদের চাষবাস ব্যবসা-

বাণিজ্যের চেষ্টায় সমস্ত দেশটাই যথার্থ গৃহস্থের আশ্রম না হইয়া, একটা বৃহৎ ভীষণ কলের কারখানা হইয়া উঠিবে, তাহা হইলে আমি বলি, এ মিলন একেবারে অসম্ভব। অনেকে হয় ত বলিবেন, কেন অসম্ভব ?

এই সহরে ত অনেকেই ইংরাজী রকমে জীবনযাপন করেন। আহারে বিহারে, আচারে ব্যবহারে, চালচলনে ইংরাজের সহিত তাঁহাদের কোন পার্থক্যই দেখা যায় না। কলিকাতায় আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ত এক রকম বিলাতের ছাঁচেই ঢালা, আর কলিকাতায় যাহা দেখা যায়, তাহা যে ক্রমশঃ দেশে ছড়াইয়া পড়িতেছে, তবে কেমন করিয়া বলা যায় যে, আমরা বিলাতের ছাঁচে গড়িয়া উঠিব না ? আমার কথা এই যে, নকল সাজা সহজ, কিন্তু যথার্থ নকল হওয়া বড়ই কঠিন। সাজা জিনিষটা খেয়ালের ব্যাপার, একদিন থাকে, তার পর থাকে না; কিন্তু হওয়া জিনিষটার সঙ্গে রক্তমাংসের সম্বন্ধ আছে, কোন একটা জাতিকে কিছু হইতে হইলে তাহার স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে সেই হওয়া জিনিষটার বীজ থাকা চাই। আমার কিছুতেই মনে হয় না, বাঙ্গালীর স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে ইংলণ্ডের সভ্যতা ও সাধনার বীজ আছে, সুতরাং এই অর্থে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিলন অসম্ভব, এবং এইভাবে দেখিতে গেলে Keeplingএর কথাই ঠিক বলিয়া মনে হয়, প্রাচ্য প্রাচ্যই থাকিবে, প্রতীচ্য প্রতীচ্যই থাকিবে, ইহারা কখনও মিলিবে না।

তবে কি এই দুইটা জাতি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নিজ নিজ সত্তা হারাইয়া একটা নূতন রকমের দোআঁসলা জাতি গড়িয়া উঠিবে, না একটা নূতন বর্ণশঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইবে ? এ কথা অর্ব্বাচীনের কথা, ইহার বিচারের কোন আবশ্যকতা নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই মিলনের অর্থ এই যে, ইংরাজের যাহা কিছু ভাল, আমরা লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল, তাহা ইংরাজ লইবে এবং উভয়ের যাহা কিছু মন্দ, তাহা বিসর্জ্জন করিতে হইবে। এ কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কি ইংরাজের যাহা ভাল যাহা মন্দ, তাহা কি এমন পৃথক্‌ভাবে জাতির জীবনের মধ্যে অবস্থিতি করে যে, একটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়া আর একটা লওয়া যায় ? একটা বিশিষ্ট জাতির ভালমন্দ যে এক সঙ্গে সেই জাতির রক্তমাংসের সঙ্গে জড়ান। খাঁটি ভালটুকু ছিঁড়িয়া লইবে কি করিয়া ? এমন করিয়া ত ছেঁড়া যায় না। একটা জাতির জীবন ত ঠিক ইটের এমারত নয় যে, ঠেকা দিয়া খানিকটা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে দিক্‌টা আবার নূতন ধরণে নূতন উপকরণে গড়িয়া তুলিবে। কোন জাতির সংস্কার অন্য জাতির আদর্শে সম্ভব হয় না। আমাদের যে সব সংস্কারের আবশ্যক, তাহা আমাদের স্বভাবধর্ম্মের মধ্যে যে সব শক্তি নিহিত আছে, তাহার বলেই হইবে। বিলাতের সমাজশক্তির বলে আমাদের

আবশ্যকীয় সংস্কার সাধিত হইবে না—হইতেই পারে না। দুইটা জিনিষ যেমন আঠা দিয়া দিয়া জোড়া লাগান যায়, ঠিক তেমনি করিয়া ত বিলাতের ভালটুকু আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে জোড়া লাগান যায় না। এ যে জীবনের লীলা—জীবন বিকশিত হয়, তাহার বিকাশের মধ্যে যাহা নাই, সে ত তাহার সঙ্গে জোড়া লাগে না।

এই কথাটি আর একদিক্ দিয়া দেখা যায়। ধরিয়া লও যে, বিলাতের ভালটুকু তুলিয়া আনিয়া আমাদের জীবনের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু তাহার ফলে কি হইবে, বিলাতি সামাজিক প্রথা বা অবস্থা যদি আমাদের মধ্যে চালাইয়া দেওয়া যায়, তবে সেই প্রথা বা অবস্থার যাহা স্বাভাবিক ফল, তাহা ফলিবেই, এবং তাহার ফলে আমাদের দেশের যে বিশিষ্ট রূপ, তাহা নষ্ট হইয়া বাঙ্গালী-সমাজ একটি দ্বিতীয় বিলাতি সমাজ হইয়া উঠিবে। এমন করিয়া আর একটা জাতির প্রতিধ্বনি হইয়া উঠিলে আমাদের বাঁচিয়া থাকার সার্থকতা কোথায়?

এভাবে যাঁহারা আমাদের দেশে বিলাতি সমাজের প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের চেষ্টা করিতে দাও, আমাদের ভীত হইবার কোন কারণ নাই। আমি জানি, বাঙ্গালী জাতির একটা বিশিষ্ট জাতিত্ব আছে, তাহার একটা বিশিষ্ট স্বভাব-ধর্ম্ম আছে, সেই স্বভাবধর্ম্ম নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকাশ করিবে, এবং যাহা সেই স্বভাবধর্ম্ম-বিরুদ্ধ, তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া এই সব প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

তবে এই যে মিলন—যাহাতে অনেকেই বিশ্বাস করেন এবং আমিও বিশ্বাস করি, সেই মিলনের যথার্থ মর্ম্ম কি? এই বিষয়টা দুই দিক্ দিয়া দেখা যায়, ইহাকে জাতিত্বের দিক্ দিয়া অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির যে জাতিত্ব ও ইংরাজ জাতির যে জাতিত্ব, এই দুইটি সত্যের দিক্ দিয়া দেখা যায়। আর একটা দিক্ দিয়াও দেখা যায়, সেটা আমাদের নিজ নিজ শাসন-বিভাগ অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের দিক্ দিয়া।

এই শেষোক্ত দিক্ দিয়া বিচার করিতে হইলে ইহা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, দুইটি স্বতন্ত্র জাতি নিজ নিজ বিশিষ্টরূপেই বিকশিত হইয়াও এই দুইটি জাতির শাসন-বিভাগের উপরদিকে একটা একচ্ছত্র যোগাযোগ থাকিবে। বাঙ্গালী জাতির ও ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরস্পরের শাসন-বিভাগের একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হইবে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের যে শাসন-বিভাগ, তাহার সহিত ইংলণ্ডের সম্বন্ধ, একটা বাস্তবিক সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে। কিন্তু সেই সম্বন্ধের ভিতরের প্রকৃতি কি হইবে, বাহিরের আকার কি হইবে, তাহা এখনও ঠিক করিয়া বুঝা এবং বলা অসম্ভব। স্যার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ বোম্বাইএর কংগ্রেসে বলিয়াছিলেন :—

"It seems to me that having fixed our goal it is hardly necessary

to attempt to define in concrete terms the precise relationship that will exist between England and India when the goal is reached."

অর্থাৎ:—আমাদের যে উদ্দেশ্য, তাহা সম্পূর্ণভাবে সফল হইলে ইংলণ্ডের সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যে ঠিক কি সম্বন্ধ থাকিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা আমার মতে এখন অনাবশ্যক।

আমারও ঠিক তাহাই মনে হয়, তবে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, এমন সম্বন্ধ হইতে বা থাকিতে পারে না, যাহাতে আমাদের ও ইংরাজের জাতীয় স্বভাবধর্ম্মের বিনাশ-সাধন হইবে। শুধু জাতিত্বের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর যথার্থ মিলনভূমি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। আমি আগেই বলিয়াছি, দুইটি জাতি যখন নিজ নিজ প্রকৃতির মধ্যে নিজ নিজ স্বাভাবধর্ম্মের গুণে উন্নত অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাদের মধ্যে যথার্থ আদান-প্রদান ও মিলন সম্ভব হয়। যখন ইংরাজ ও বাঙ্গালী এই উভয় জাতিই সেই প্রকার উন্নতির পথে অগ্রসর হইবে, তখনই তাহাদের মধ্যে প্রকৃত মিলন হইবে। প্রকৃত মিলনের ফল এই যে, শত শত ভিন্ন ভিন্ন বিশিষ্টরূপে বিকশিত স্বতন্ত্র জাতিসমূহ বিধাতার সৃষ্টিস্রোতে ভাসিতেছে, ফুটিতেছে, ইহাদের সকলের মধ্যেই যে একটা একত্ব আছে, এই সব ভিন্নরূপের যে স্বরূপ, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয় না। জাতিত্ব মরে না—শুধু সকল জাতির মধ্যে সকল বিশিষ্টরূপের মধ্যে যে একত্ব আছে, তাহাই জাগিয়া উঠে। এই জন্যই ইংরাজ এ দেশে আসিয়াছিল। এইখানেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের যথার্থ মিলন। এই ক্ষেত্রেই Universal Brotherhood of man সম্ভব। তাই শুধু এই দিক্ দিয়া দেখিলেই দেখা যায়, the East and the West have met—not in vain. অর্থাৎ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যে একত্র হইয়াছে, তাহা ব্যর্থ হইবে না।

এখন দেখা যাইতেছে যে, আমাদের দেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে আমাদের এই নব-জাগ্রত জাতিত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, আমাদের ইতিহাসের ধারাকে উপলব্ধি করিয়া ও সাক্ষী রাখিয়া আমাদের দেশের সকল দিকের বর্ত্তমান অবস্থা আলোচনা করিতে হইবে এবং সেই আলোচনার ফলে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত অথচ সার্ব্বভৌমিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে হইবে।

Imp 3935 ১১-২২/৩/৫৭

কৃষকের কথা

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার কথা ভাবিতে গেলে প্রথমেই আমাদের কৃষিজীবীর কথা মনে আসে, তার পরই আমাদের দারিদ্রের কথা মনে হয়। কৃষকের কথা ও দারিদ্রের কথা একই কথা বলিয়া মনে হয়। আমরা সকলেই জানি যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের অভাবে কৃষিকার্য্যই আমাদের উপজীবিকার প্রধান উপায়। আমরা সকলেই জানি যে, বাঙ্গালী জাতির মত এত দরিদ্র জাতি বোধ হয় জগতে আর কোথাও নাই। কিন্তু ঘোর দারিদ্রের প্রকৃত অবস্থা বোধ হয় ভাল করিয়া জানি না, সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করিতে পারি না। আমরা ত একেবারে এক মুহূর্ত্তে দরিদ্র হইয়া পড়ি নাই—আমরা যে ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িয়াছি। তাই এই অতি সত্য যথার্থ অবস্থা আমরা ঠিক ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। বিদেশীরা যখন প্রথম আমাদের দেশে আসে, তখন তাহারা আমাদের সোনা-রূপার প্রাচুর্য্য দেখিয়া অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। সে সোনা-রূপা আসিত কোথা হইতে? বাঙ্গলা দেশে ত সোনা-রূপার খনি নাই, তবেই বলিতে হইবে যে, আমাদের কৃষিকার্য্য ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাহায্যে আমরা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতাম।

সরকারী কাগজপত্রে পাওয়া যায় যে, আমাদের সমস্ত জনসংখ্যা ধরিলে এবং আমাদের সমস্ত চাষযোগ্য ভূমি হিসাব করিলে জন পিছে দুই বিঘারও কিছু কম থাকে। এই দুই বিঘা জমি চাষ করিয়া একজনের সমুদয় খরচ নির্ব্বাহ করা অসম্ভব। তার পরে অনাবৃষ্টি আছে, দুর্বৎসর আছে, আমাদের চাষারা রোগক্লিষ্ট স্বাস্থ্যহীন—এই দুই বিঘা জমিও বার মাস পরিশ্রম করিয়া ভাল করিয়া কাযে লাগাইতে পারে না।

সরকারী কাগজ হইতে ইহাও দেখা যায় যে, জন প্রতি বৎসরে সাত মণ করিয়া খাদ্য-শস্য আবশ্যক হয়। আমাদের সমস্ত বাঙ্গলা দেশে এই হিসাবে বৎসরে বত্রিশ কোটি কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য-শস্যের আবশ্যক। আমি এই ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জাতির যে বাঙ্গলা, তাহার কথা না বলিয়া গবর্ণমেণ্টের হিসাবে যে বর্ত্তমান বাঙ্গলা, তাহারই কথা বলিতেছি। আমাদের উৎপন্ন হয় মোটে চব্বিশ কোটি আশী লক্ষ মণ। তাহা হইতে প্রায় এক কোটি মণ প্রত্যেক বৎসরে রপ্তানি হইয়া যায়। খাদ্য-শস্যের আমদানি বড় একটা বিদেশ হইতে হয় না, সুতরাং যেখানে আমাদের বত্রিশ কোটি কুড়ি লক্ষ মণ খাদ্য-শস্যের আবশ্যক, সেখানে থাকে মাত্র তেইশ কোটি আশী লক্ষ মণ অর্থাৎ প্রত্যেক ব্যক্তির বৎসরে যদি সাত মণ করিয়া খাদ্য-শস্য যথার্থ আবশ্যক হয়, তাহা

হইলে আমরা দেখিতে পাই যে, এক কোটি কুড়ি লক্ষ লোকের আহারের ব্যবস্থা নাই। আবার আর একদিক্ দিয়া দেখিলে আমাদের দারিদ্র্যের কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝা যায়। সরকারী কাগজে পাওয়া যায় যে, আমাদের সকল রকম চাষের উৎপন্ন দ্রব্য অর্থাৎ যব, গম, ছোলা, সরিষা ইত্যাদি, পাট, চিনি, তামাক– এই সকল উৎপন্নের দাম একশ' ত্রিশ কোটি টাকা এবং সরকারী কাগজপত্র অনুসারে প্রত্যেক জনের বৎসরে ত্রিশ টাকা করিয়া আয়। আমার হিসাবে প্রত্যেকের বাৎসরিক আয় ষোল টাকা হইতে কুড়ি টাকার মধ্যে। কুড়ি টাকাই হউক বা ত্রিশ টাকাই হউক, এই টাকায় কোন চাষাই তাহার নিতান্ত আবশ্যকীয় অভাবগুলিও পূরণ করিতে পারে না,—গবর্ণমেণ্টের জেলেও প্রত্যেক ব্যক্তির পিছে বৎসরে আটচল্লিশ টাকা করিয়া খরচ হয়!—ইহা কি আমাদের ঘোর দারিদ্র্যের স্পষ্ট প্রমাণ নহে?

আমাদের রাজকর্ম্মচারীদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, বাঙ্গলায় অনেক পরিমাণে "গুপ্তধন" (Hidden wealth) আছে অর্থাৎ বাঙ্গলা দেশে নাকি অনেকে অলঙ্কার ব্যবহার করেন এবং অনেকে টাকা পুতিয়া রাখেন। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যে কাহারও কখনও টাকা পুতিয়া রাখিবার সুযোগ ঘটিয়াছে বলিয়া আমার ত মনে হয় না। পুরাকালে অনেকে টাকা পুতিয়া রাখিতেন, এইরূপ প্রবাদ আছে সত্য, কিন্তু যদি এইরূপ কেহ টাকা পুতিয়া রাখিয়া থাকেন, তবে সে মাটীতে পোতা টাকা মাটীর মধ্যেই লুকাইয়া আছে, আজ পর্য্যন্ত কেহ তাহার বড় একটা সন্ধান পায় নাই। অলঙ্কারের বিষয় একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, খুব অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া বাঙ্গালীর মেয়েরা রূপার অলঙ্কারই পরিয়া থাকেন। ইংলণ্ডে স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত থাকায় আমাদের দেশে সেই সোনার দামের ওজনে সব দ্রব্যেরই দাম ঠিক হয়। /

ইহার ফলে আমাদের দেশের রূপার দাম কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং এই যে যৎকিঞ্চিৎ রূপার অলঙ্কার আমাদের দেশে আছে, তাহার মূল্য একটা আকস্মিক ও আমাদের দেশের পক্ষে অস্বাভাবিক কারণে অনেকটা কমিয়া গিয়াছে,—ইহাও আমাদের দারিদ্র্যের আর একটা কারণ। আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের আরও প্রমাণ আবশ্যক হইলে সরকারী কাগজেই তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়। বাঙ্গলা দেশে এমন গ্রাম নাই—যেখানে অন্ততঃপক্ষে শতকরা পঁচাত্তর জন ঋণগ্রস্ত নহে। এমন অনেক গ্রাম আছে, যেখানে শতকরা একশ' জনই ঋণদায়ে পীড়িত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কৃষি-কাযের উৎপন্ন হইতে চাষা ত জীবন ধারণ করিতেই পারে না এবং যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহারও একটা অংশ মহাজনের ঘরে গিয়া পড়ে। মানুষ ভাল করিয়া জীবন ধারণ না করিতে পারিলে মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব। আমি বিলাতি আরামের

আদর্শের (Standard of Comfort) কথা বলিতেছি না, কিন্তু শরীরকে সুস্থ ও সবল রাখিবার জন্য, মনকে শান্ত ও প্রসন্ন রাখিবার জন্য এবং অনাবৃষ্টি ও দুর্বৎসরের যে বিপদ্, তাহা হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য যে অর্থের আবশ্যক, সেই পরিমাণ অর্থাগমের ব্যবস্থা যদি না থাকে, তবে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ অসম্ভব।

আমরা কথায় কথায় বলিয়া থাকি যে, অভাবে স্বভাব নষ্ট, আমাদের চাষাদের অবস্থা ভাল করিয়া ভাবিতে গেলে এই ঘোর দরিদ্রতানিবন্ধন দুইদিক্ দিয়া আমাদের স্বভাব নষ্ট হইতেছে, একদিকে অর্থাভাবে আমাদের যে মনুষ্যত্বের আদর্শ, তাহা সাধন করিতে না পারিয়া আমরা দিন দিন শক্তিহীন, ধর্ম্মহীন, মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পড়িতেছি; আবার অন্য দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে আমাদের মধ্যে সেই একই কারণে চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অনেক প্রকার দুষ্কার্য্য বাড়িতেছে; সুতরাং যে দিক্ দিয়াই দেখা যায়, আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যকে দূর করিতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমাদের গ্রাম-সমূহ ম্যালেরিয়াতে উৎসন্ন যাইতেছে—পল্লী-সমাজ বাঙ্গালীর সভ্যতা-সাধনার কেন্দ্রস্থল, সেই কেন্দ্রস্থল যদি ব্যাধিদুষ্ট হইয়া তাহার সঞ্জীবনী শক্তি হারাইয়া ফেলে, তাহার ফলে সমস্ত জাতিটাই অক্ষম ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই অস্বাস্থ্য নিবন্ধন পল্লীগ্রাম ক্রমশঃই জনশূন্য হইয়া পড়িতেছে, এক দিকে ম্যালেরিয়ার আতঙ্ক, আর এক দিকে বড় বড় সহরে বিলাতি ব্যবসা-বাণিজ্যের লোভ ও মোহ, কাজেই এই বড় বড় সহরগুলা এক একটা বৃহৎ অজগর সর্পের মত গ্রামবাসী-দের টানিয়া টানিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে; সুতরাং আমাদের প্রথম কার্য্য গ্রামের ও দেশের স্বাস্থ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

এই অস্বাস্থ্যের সঙ্গেও আমাদের দারিদ্র্যের যোগ আছে। শরীর দুর্ব্বল হইলেই ব্যাধিমন্দির হইয়া পড়ে, আমাদের এক হাতে এই দেশের স্বাস্থ্যকে রক্ষা করিতে হইবে, আর এক হাতে তাহারই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে দারিদ্র্য, তাহা ঘুচাইতে হইবে। স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে হইলে চাষাদিগকে সেই সম্বন্ধে শিক্ষাদান করিতে হইবে, গ্রামে গ্রামে জলকষ্ট নিবারণ করিতে হইবে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিতে হইবে, পুরাতন পুষ্করিণীর সংস্কার করিতে হইবে, বন জঙ্গল পরিষ্কার করিতে হইবে এবং চাষারা যাহাতে আরও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন-ভাবে জীবন-যাপন করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। অর্থাগমের ব্যবস্থা করিতে হইলে চাষাকে কম সুদে তাহার আবশ্যকীয় টাকা ধার দিবার জন্য গ্রামে গ্রামে গ্রামবাসীদের উপকারের জন্য তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ছোটখাট ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের কার্য্যের তালিকা ত এই—কিন্তু কাজ করিবে কে? রাজসরকার, না আমরা? সে কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য

যাহা বলিয়াছি, তাহাতেই বুঝা যায় যে, শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের চলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য না হইলে আমাদের এই ঘোর দারিদ্র্যের অবসান কিছুতেই হইবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বিচার করিতে হইলে আমাদের কি ছিল, তাহার অনুসন্ধান করিতে হইবে, এবং যাহা ছিল, তাহাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তাহার আরও উন্নতি-সাধন করিতে হইবে।

আমাদের বাণিজ্য নাই, তাই মা লক্ষ্মীও বাঙ্গলা ছাড়িয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলার সুখ-দুঃখও সেই সঙ্গে সঙ্গে ফুরাইয়া গিয়াছে, আছে সুধু সুখের মোহ আর দুঃখের যন্ত্রণা ও অবসাদ। পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আজ আমরা নিজের সুখদুঃখ ভুলিয়াছি, কিন্তু এমনই ত আমরা ছিলাম না, সবই ত আমাদের ছিল, পেটের ভাত, কটির লজ্জা-নিবারণ—আমরা নিজেরাই আমাদের সে লজ্জা নিবারণ করিতাম। আলিপনা দেওয়া আঙ্গিনা, মুক্ত আকাশ, শ্যামল পল্লীবীথি, শ্রমলব্ধ অন্ন, পরস্পরের প্রীতি—সবই আমাদের ছিল। আজ ঘরে লক্ষ্মী নাই, তাই আমরা লক্ষ্মীছাড়া,—কেন আমরা লক্ষ্মীছাড়া হইলাম? দোষ আমাদেরই,—সব দোষই কি আমাদের? ইতিহাস নিজকৃত দোষকে কখনও ত্যাগ করে না। তবে প্রবলের সংঘাতে দুর্ব্বলের দোষ শতগুণ বাড়িয়া যায়। আমাদের সে সময়কার ইতিহাস ঘোর অন্ধকারে মর্ম্মভেদী নিঃশ্বাসে তপ্ত ও সিক্ত, সে কথার বিচার আর করিয়া কাজ নাই, বিচার করিলেই গরল উঠিবে। আজি মিলনের দিনে সে কথা ভোলাই ভাল। একদিন ছিল—বাঙ্গলা শুধু নিজের লজ্জা নিবারণ করিত না, জগতের ঘরে ঘরে কাপড় বিলাইত। সে বসন ও বৈভব জগতের নরনারীর সৌন্দর্য্য ফুটাইয়া তুলিবার অতুলনীয় উপাদান ছিল। ইংরাজ আগমনের সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গলার সেই বৈভব নষ্ট হইয়া গেল। কেন নষ্ট হইয়া গেল, কে নষ্ট করিল? ইতিহাসের সাক্ষ্য?—আমি আগেই বলিয়াছি, সে কথা ভোলাই ভাল। সেই দূর শতাব্দীর অন্ধকারে যখন চোখ ফিরাইয়া দেখি—সকলই বিভীষিকাময়, ভয় হয়, মনে হয়, সে কি স্বপ্ন! আমরা বাস্তবিকই মনুষ্যত্ব হারাইয়াছিলাম, দাবি করিবার কিছুই ছিল না, শুধু প্রাণের দাবি ছিল। হায়, দুর্ভাগা বাঙ্গালী আমরা বণিকের যূপকাষ্ঠে আমাদের শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য সকলই বলি দিলাম। আমাদের ঘরে ঘরে চরকা ভাঙ্গিয়া গেল, আমাদের হস্তপদ ছিন্ন করিলাম, জীবন্ত অগ্নিতে সকলই দাহ করিয়া দিলাম, আমাদের ঘরের লক্ষ্মীকে গলা

টিপিয়া মারিয়া ফেলিলাম। আমরা যে অক্ষম তাই—দোষ কারও নয়, দোষ আমাদেরই, আমরা "স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিলাম।" অনাচারে, অশ্রদ্ধায়, শক্তিহীনতায়, ভক্তিহীনতায় আমাদের গৃহধর্ম্মকে, আমাদের স্বভাব-ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিলাম।

আমার বাঙ্গলার ঘরে ধান ছিল, ঘরের গাই দুধ দিত, জলাশয় মাছ দিত, তৃণ-শ্যাম শস্যক্ষেত্র, গোচারণ-ভূমি ছিল, গাছের ফল ছিল, খড়ের ছাউনির ঘর ছিল, সুনীল আকাশ ও সবুজ গাছের ও মাঠের পানে চাহিলে চোখ জুড়াইয়া যাইত। চাষা সারা দিনের পরিশ্রমের পর ঘর্ম্মাক্ত-কলেবরে সন্ধ্যাদীপ-জ্বালা-ঘরে মেঠোসুরে প্রাণের গান গাহিতে গাহিতে ফিরিয়া আসিত। বাঙ্গলার পুকুরের জল তখন মিঠা ছিল, চাষা বৎসরে ছয় মাস তাহার পেটের জন্য খাটিত, তাহার ঘরে ধানের মরাই ছিল, বাকি ছয়মাস সে গৃহস্থালী করিয়া বাঙ্গলার স্বভাব-ধর্ম্ম-সঙ্গত চিরকালের অভ্যাস বশতঃ নানাবিধ পণ্যদ্রব্য তৈয়ারি করিত। সেই পণ্যদ্রব্যই বিশ্বের হাটে হাটে বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিত। সে চাষা এখন নাই, সে গৃহস্থালী এখন নাই, সে গৃহধর্ম্মও এখন নাই,—আর সে গৃহও এখন নাই। ঘরে চাল নাই, গরু দুধ দেয় না, তৃণ-শ্যাম ক্ষেত্র শুকনা কাঠ হইয়া ফাটিতেছে, ঘরে সন্ধ্যাদীপ পড়ে না, দেবতা উপবাসী—সেবা হয় না, পেটের দায়ে হালের গরু বেচিয়া কোন রকমে খাইয়া বাঁচে। জলাশয় শুকাইয়া কাদা হইয়াছে, জলকষ্টে—বিশুদ্ধ জলের অভাবে নানা প্রকার ব্যাধি আসিয়া চাষার সে স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি একেবারে নষ্ট করিয়াছে, তাহার যে সহজ সরল স্বাভাবিক জীবন ছিল, তাহা হারাইয়া উৎকট ব্যাধি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছে। যে সুখ তাহাদের ছিল, তাহা আর নাই। নাগপাশ—অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়—অবশ হইয়া পড়িয়া আছে।

কেন এমন হইল, কি পাপে মা লক্ষ্মী আমাদের ত্যাগ করিলেন? ইতিহাসের সাক্ষ্য যাহাই হউক, ভিতরের কথা ভাবিয়া দেখিলে দোষ আমাদেরই। যে আপনাকে দুর্ব্বল করিয়া রাখে, দুর্ব্বল হইতে দেয়, তাহার বলহীনতা যে তাহারই দোষ। নিজের ঘরের ধন "চৌকি না দিয়া" যে পরের হাতে তুলিয়া দেয়, দোষ তাহার,—না, সেই সুযোগ পাইয়া যে সব ধনরত্ন লইয়া যায়—সেই সুযোগ-প্রয়াসীর? আমরা যে সেই সময় নিজের ঘরকে পর করিয়াছিলাম ও নিজের প্রাণের আদর্শ ভুলিয়াছিলাম, শুধু পরের দোষ দিলে ত আমাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না।

ভুল কোথায়? ভুল আদর্শের সংঘাতে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের আদর্শের যে বিরোধ, সেই বিরোধেই আমাদের এই দুর্ব্বল শক্তিহীন অবসন্ন দেহ। নিজেদের বাঁচাইয়া রাখিবার শক্তি ছিল না, সেই দৌর্ব্বল্যই আমাদের দোষ, সে দোষ ত এখনও যায় নাই, আমরা জাগিয়া—নিজের আস্বাদ পাইয়াও নিজের আদর্শকে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছি

না, সেই আদর্শের সংঘাত এখনও ত চলিতেছে, এখনও ত আমাদের নিজের আদর্শকে পরের হাতে তুলিয়া দিয়া সচ্ছন্দে বাস করিতেছি! যে ভুলে নিজের আদর্শকে ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই ভুলের মোহ যে এখনও কাটাইতে পারিতেছি না। বিলাতের আদর্শ বিলাতেই শোভা পায়, তাহা বিলাতেই থাকুক, আমাদের সে আদর্শকে ত্যাগ করিতে হইবে। জীবন গড়িবার সময় ত্যাগের সময়—ভোগের নয়। আমাদের এখন বিলাতি আদর্শ-জনিত যে বিলাসের ভোগ, তাহাকে সবলে দুই হাতে ছিঁড়িয়া ফেলিতে হইবে। জীবনকে সহজ সরল করিতে হইবে, জীবনের ধারা ও গতির মুখ একেবারে ফিরাইয়া দিতে হইবে। প্রতীচ্যের যে Indus.rialism—এই Industrialism, যাহাকে শিল্প-চেষ্টা কি সকল রকমের বাণিজ্য-চেষ্টা বলিলেও ঠিক বুঝা যায় না—সেই I dustrialism যাহা আমাদের দেশে কখনও ছিল না ও আমাদের স্বভাব ও ধর্ম্মের মধ্যে থাকিতেই পারে না, সেই Industrialism ধীরে ধীরে চোরের মত আমাদের গৃহে প্রবেশ করিয়াছে ও করিতেছে। আমাদের স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে হইবে যে, এই Industrialism আমাদের দেশে চলিবে না, চলিতে পারে না, বাঙ্গলার আদর্শ তাহা নয়। বাঙ্গলার মাটীতে যাহা হয়, বাঙ্গলার ধাতে যা সয়, তাহাকেই বরণ করিতে হইবে।

বাঙ্গলার নাই কি! ছিল না কি! কি জোরে, কি কল-কল স্রোতে গঙ্গা সাগরের সঙ্গে মিশিতেছে। আজিও পদ্মা জলোচ্ছ্বাসে কি উদ্দাম ভাবের ভাঙ্গন অটুট রাখিয়াছে, কি তোড়ে ব্রহ্মপুত্র কলকলনাদে গ্রামের পর গ্রাম ভাসাইয়া যায়, আর যখন দামোদর ঘোর ঘর্ঘর রবে নাচিয়া উঠে, আজিও তাহার গতি কেহ ত রোধ করিতে পারে না, সাগরের অশ্রান্ত গর্জ্জন আজিও ত থামে নাই। বৃদ্ধ হিমালয় তাহার দুই বাহু লইয়া আজিও তেমনি দাঁড়াইয়া আছেন, তমালতালীবনরাজি-নীলা আজিও আছে—যাহার উপরে বাঙ্গলার প্রাণের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, তাহার স্বভাব-ধর্ম্মের বিকাশ হইয়াছিল, সেই সব ত তেমনি আছে, তবে নাই কি? বাঙ্গলার যে মন্দিরে মন্দিরে মস্‌জিদে মস্‌জিদে সাধন-সঙ্গীত ধ্বনিত হইত, আজিও ত সেই মন্দির আছে, মস্‌জিদ আছে, তবে নাই কি? সে বল, সে স্বাস্থ্য, সে ধৈর্য্য, সে আত্মস্থ জাগ্রত অবস্থা সবই তমের অবসাদে ডুবিয়াছে। দেশ আছে, দেশের আদর্শ চলিয়া গেল কেন? জাতি আছে, সেই জাতির যে প্রাণসঞ্চারিণী শক্তি, তাহা ভাসিয়া গেল কেন? সে গ্রাম নাই কেন? সে পল্লী নাই কেন? সে পল্লীসমাজ নাই কেন? বাঙ্গলায় যে শত শত গ্রাম লইয়া শত শত সমাজ ছিল, সে সমাজ নাই কেন? খর্ব্ব, নগ্ন, স্বাস্থ্যহীন, রুক্ষকেশ, কঙ্কালসার প্রাণীর দল ক্ষয়গ্রস্ত মরণাহত পশুর মতন পানা-পুকুরের ধারে পথে পড়িয়া ধুঁকিতেছে কেন? আজ যে বাঙ্গালীর মেয়ে

আধপেটা খাইয়া লোক-চক্ষের অন্তরালে চোখের জল চোখে শুকাইতেছে, তাহার কথা ভাবি না কেন? মায়ের ছেলে ম্যালেরিয়ায়, প্লীহা-যকৃতে নিঃশেষ হইয়া যাইতেছে, তাহার খোঁজ রাখি না কেন? আজ যে আমরা Industrialism, Industrialism বলিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছি, Joint Stock Company—বনিয়াদি জুয়াচুরির জন্য অহোরাত্র মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতেছি, কংগ্রেস, কন্‌ফারেন্স ডাকিয়া একটা বড় রকমের ধারকরা Indian Nati n তৈয়ারি করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি—এই সব চেষ্টা যে আমাদিগকে কোন্ পথে কোন্ দিকে লইয়া যাইতেছে, তাহা কি আমরা ভাবিয়া দেখিয়াছি? কেহ কি আমায় বলিয়া দিতে পার, আজ দুই শত বৎসরের ভিতর কয়টা নূতন পুষ্করিণী খনন হইয়াছে, কয়টা নূতন দেউল রচিত হইয়াছে, কয়টা নূতন অন্নছত্র খোলা হইয়াছে, গঙ্গার তীরে তীরে কয়টা ঘাট নূতন বাঁধান হইয়াছে, পথে পথে অশ্বত্থ-বটের বিবাহ দিয়া তাহার তলাখানি সান্‌বাঁধাইয়া—পথশ্রান্ত নরনারীর বিশ্রাম-সেবার জন্য --কয়টা নূতন বট অশ্বত্থের সেবা-সংস্কার হইয়াছে, কেহ কি আমাকে বলিয়া দিতে পার? কয়টা পল্লী, কয়খানা গ্রাম আজ বাঙ্গলায় আছে? ঘর ভাঙ্গিয়াছে, ব্যবসা গিয়াছে, বাণিজ্য গিয়াছে, রসকস্ যাহা ছিল, সকলই ফুরাইয়া শেষ হইয়া আসিয়াছে; কিন্তু তবু কি আমাদের চৈতন্য হইবে না? সে কালে যখন গ্রামে গ্রামে দুর্গোৎসব হইত, পল্লীতে পল্লীতে বারমাসে তের পার্ব্বণ ছিল, তখন সকল গৃহস্থ সকল গ্রাম কেমন একপরিবার হইয়া উঠিত, সুখ দুঃখ, আনন্দ উল্লাস, উৎসব এক সঙ্গে ভাগ করিয়া উপভোগ করিতাম, এখন সে আনন্দ কই, সে উৎসব কই? এখন ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের বৎসরে একবার সাক্ষাৎ হয় না, খুড়া, ভাইপো, ভাইঝি Cousin হইয়াছে—পরিবারের সে সুখ নাই, শান্তি নাই, আনন্দ নাই। একটা প্রবল সভ্যতার সংঘাতে আমরা শক্তিহীন আরও দুর্ব্বল শতচ্ছিন্ন হইয়া নিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু এখনও আমাদের ঘুমের ঘোর ভাল করিয়া ভাঙ্গে নাই, এখন মিল-ফ্যাক্টরির কথা ভাবিতে গেলে আমাদের জিবে জল আসে, আমাদের মধ্যে যাঁহাদের সামান্য কিছু টাকা আছে, তাঁহারা Cheap labourএর কথা ভাবিয়া লোভে, মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়েন,—এই যে দাসসুলভ-অনুকরণ-মোহ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমাদের জীবনের উপরে চাপিয়া বসিয়াছে, তাহাকে না সরাইতে পারিলে আমাদের বাঁচিবার আশা নাই।

Industrialism বাঙ্গলা দেশে চালাইতে আরম্ভ করিলেই আবার নূতন করিয়া আমাদের বিনাশের পথ প্রস্তুত হইবে। বিলাতি-ফ্যাক্টরি-রাক্ষস তাহার রাক্ষসী মায়ায় আমাদিগকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলিবে। বিলাতি কারখানায় নানান কারখানা করিবে, নিজেরা সেই কলকারখানায় কলের চাকার মত ঘুরিব, প্রাণহীন স্তব্ধ জড়বৎ হইয়া সে চাকার দাঁতের সঙ্গে মিলাইয়া আমাদের লাগাইয়া দিব—সেই দাঁতে দাঁতে লাগিয়াই

থাকিব, বিদ্যুতের কল টিপিয়া ধনী মালেক আমাদের চালাইবে, তাহাদের টাকা আছে, আমাদের পোকা-পড়া—রস রক্ত অস্থি মজ্জা আছে, যতদূর পারিবে, মালেক আমাদের রসসার হরণ করিবে। এই Industrialism যতটুকু আমাদের ভিতর প্রবেশ করিয়াছে, তাহারই ফল দিয়া ইহাকে বিচার করা যায়। কলিকাতা ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের কি ভীষণ অবস্থা। সহরের বাঙ্গালীবাবুরা বিলাসের চক্চকানিতে চকিত হইয়া বেশ সুখের মোহেই বাস করিতেছে। এত যে দুঃখ, এত যে কষ্ট, এত যে দারিদ্রের পীড়ন, তাহাও বিলাতি সভ্যতা বা বিলাসের জন্য অকাতরে সহ্য করিতেছে। কালে যে কি হইবে, তাহার ভাবনা নাই, চিন্তা নাই। আর বাবুদের ছাড়িয়া দিলে যাহা থাকে, তাহার চিত্র আরও ভীষণ। গঙ্গার দুই ধারে বাঁধ আর কলের চিম্নির ধোঁয়া, মা গঙ্গা আর পূতসলিলা নাই, সহরের ও মিলের সকল ময়লা তিনিই গ্রহণ করেন। কলের চিম্নি দেশ শুধু কালী ও ধোঁয়ায় ভরিয়া দিতেছে। স্বাস্থ্যের দেখা নাই, একটা মিলে অনেক লোকের সমাবেশ, এই চিম্নিই তাহাদের জীবনী শক্তি কাড়িয়া লইয়াছে। কেহ কলের চাকার দাঁত হইয়া আছে। কেহ একটুকু ফর্সা কাপড় পরিয়া সেই প্রাণ দিয়া বুকের রক্ত ঢালা শ্রমলব্ধ অর্থের ভার ওজন করিয়া, মাথায় করিয়া মালেকের সিন্দুকে তুলিয়া দিতেছে। আমাদের শ্রমজীবীদের যে নৈতিক জীবন, তাহা এই মিল-ফ্যাক্টরিতে একেবারে নষ্ট হইয়া যাইতেছে। সব রকমের মাদকতা বাড়িয়াছে! হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, প্রত্যেক মিলের কাছে কাছে যত শুঁড়িখানা আছে, তাহাদের আয় শতগুণ বাড়িয়া গিয়াছে, এই Industrialismকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক। ইউরোপেও এই Industrialismএর বিরুদ্ধে ইউরোপের অনেক জ্ঞানী গুণী ব্যক্তিরা আজকাল অনেক কথা বলিতেছেন, এই Industrialismএর ফলে ইউরোপের কি দুর্দ্দশা—মানুষগুলা, রক্তমাংসের মানুষগুলাকে পাথরের আর লোহার চাকা তৈয়ারি করিয়া ফেলিয়াছে। তাহারা খাটে শুধু পেটের দায়ে, কিন্তু মানুষ শুধু ত তার পেট লইয়াই মানুষ নয়। তাহার সহজাত ভোগের, প্রবৃত্তির ক্ষুধা আছে, সে ক্ষুধাও পেটের ক্ষুধা অপেক্ষা কোন অংশে কম নয়, সে যাহা অর্জ্জন করে, সে তাহা শুধু পেটের জন্য ব্যয় করিতে পারে না। সকল রকমেই সে চাপে পিষ্ট হইতেছে। নেশায় ডুবিতেছে। পারিবারিক সুখ-সচ্ছন্দতা সম্বন্ধে জ্ঞান হারাইয়া ফেলিতেছে, বহুতর অসঙ্গত অনাবশ্যক অভাব জুটাইতেছে, ফলে সামাজিক অত্যাচারে যত প্রকার পাপের সৃষ্টি হয়, সেই সব বীভৎস সর্ব্বদাহী দেহ-মন-পোড়ান রোগে ভুগিতেছে ও পাপের অন্ধতমে ডুবিতেছে।

আমাদের মধ্যে অনেকের ইউরোপের এই ভীষণ ছবি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি দেখিয়াছি, বিলাতের যে কোন মিল-ফ্যাক্টরি হউক না কেন, তাহার সম্মুখে সন্ধ্যার সময়

দাঁড়াইয়া থাকিলে যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সারা জীবনে ভোলা যায় না। Industrialismএ যে ধনের বৃদ্ধি হয়, সে ধনীর ধনবৃদ্ধি, সাধারণ লোকের অবস্থা যেমন ছিল,তেমনি থাকে। ধনীর ধনবৃদ্ধি হইলেই ধনের অত্যাচার আরম্ভ হয়। এই প্রবল ধনীর অত্যাচারে ইউরোপ আজ নাস্তিক হইয়া উঠিয়াছে, ধর্ম্ম তাহাদের ধারণ করিতে পারে না। যথেষ্ট অর্থ-বৃদ্ধি, কিন্তু টাকা মালেকের, মালেকান্ স্বত্বও মালেকের, এই সব মালেকের দল ধন-কুবের হইয়া উঠে, কিন্তু টাকা ছড়াইয়া পড়িতে পায় না। সমাজের যে স্থানে অর্থশক্তি বদ্ধ হইয়া পড়ে, সেই স্থানই শক্তি-সম্পন্ন হয়; কিন্তু অন্যান্য স্থানে অবসাদ, অন্ধকার! শক্তির ধর্ম্মই বিকিরণ সম্প্রসারণ, তবেই শক্তির শক্তিত্ব ও অস্তিত্ব বজায় থাকে, শক্তি বজায় না থাকিলে সব কলই বিকল হইয়া পড়ে। ইউরোপের এই কলকারখানার ফল, শ্রম ব্যর্থ হইয়া আকাশ পানে নিরর্থক চাহিয়া আছে এবং যে সব শ্রমজীবীদের রক্ত-মাংস দিয়া এত অর্থ অর্জ্জিত ও সঞ্চিত হইয়াছে, সে অর্থও সার্থক হয় নাই। ইহারই ফল **Strik** Combine Socialism! খৃশ্চান ইউরোপ গত তিনশত বৎসরের Industrialismকে বরণ করিয়া খ্রীষ্টকে পরিত্যাগ করিয়াছে। মানুষকে মানুষ ও দেবতা বলিয়া গ্রহণ করিতে ভুলিয়া গিয়াছে এবং শুধু অর্থের পশ্চাতে ধাবিত হইয়া নিজের জীবনকে পিষিয়া মারিতেছে। আমরাও কি এই Industrialismকে বরণ করিয়া আমাদের জীবনকে অমনি করিয়া সকল রকমে ব্যর্থ করিয়া দিব?

জীবন এক অখণ্ড সত্য। ব্যষ্টি ও সমষ্টি তাহার এক স্বাভাবিক জীবন্ত প্রকাশ, জীবনকে খণ্ড করিয়া দেখাই মস্ত ভুল। পঞ্চপ্রদীপ সাজাইয়া আরতি করিয়া পাঁচটি আলোকে এক করিয়া দেবতার কাছে তুলিয়া ধরাই অখণ্ড জীবনের পরিচয়। সমস্ত জীবনকে সেই ঈশ্বরের অনুমুখী করাই শ্রেষ্ঠ সত্য। ব্যক্তি ও সমাজ এক সঙ্গে মহাসত্য, উভয়েই পবিত্র। শুধু যে তাহারা উভয়ে মহাসত্য, তাহা নহে, আমাদের মনুষ্য-জীবনের ধর্ম্ম ও মহাসত্য তাহাই। ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির নিজস্ব সংবিৎ, সমাজ জাতির আত্মস্থ সংবিৎ। সত্য কাহাকেও ত্যাগ করিয়া ফুটিয়া উঠে না। ব্যক্তিত্ব যদি সমাজকে বাদ দিয়া আপনাকে বড় করিয়া তোলে, তাহাতে ফল হয় অত্যাচার, আর সমাজ যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বাদ দিয়া আকাশে গৃহ নির্ম্মাণ করিতে চায়, তবে সে চেষ্টাও ব্যর্থ। উভয়ই যখন সত্য, তখন উভয়কে এই সঙ্গে অখণ্ডভাবেই ধরিতে হইবে। ইউরোপে Industrailismএর ফলে তাহার সমাজ নষ্ট হইতে চলিয়াছে, আর ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ফুটিবার সুযোগ পায় নাই। তবু এই Industrialism ইউরোপে কতকটা সয়, কেন না, ইউরোপের স্বভাবধর্ম্মের ভিতর দিয়াই ইহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইউরোপ আপনার চেষ্টায় আপনার স্বভাব-ধর্ম্মের বলে সুস্থ ও সবল হইলে এই ব্যাধি দূর হইয়া যাইবে। এই যে ইউরোপে আজি সমরানল প্রজ্বলিত,

ইহা কি অনল অক্ষরে এই ব্যাধি কি, দেখাইয়া দিতেছে না? ইউরোপ তাহার সমস্তার পূরণ আপনিই করিবে। আমি আগেই বলিয়াছি, এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে দেখিবে, ইউরোপ তাহার পথ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

কিন্তু আমরা অকারণে ইউরোপের ব্যাধি আমাদের দেশে আনিয়া তাহাকে পোষণ করি কেন? সমস্তটাই যে আমরা আনিয়াছি, আমি এমন কথা বলি না, ইহার কতকটা যে ইংরাজের সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, সে কথা মানিয়া লইতেই হইবে। কিন্তু ইহার অনেকটা যে আমরা মোহাবিষ্ট হইয়া আপনায় আনিয়াছি, সে কথা ভুলিলে চলিবে না। আমরা আহারে ব্যবহারে, আচারে বিচারে, ভাষায় ভাবে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, সমস্ত জীবনক্ষেত্রে, প্রতিপদক্ষেপে বিলাতের অনুকরণ করিয়াছি। মন্দিরের বদলে সভা করিয়াছি, সদাব্রতের বদলে হোটেল করিয়াছি, থিয়েটার করিয়া আনন্দের মূল্যে দুর্ভিক্ষে দান করি, লটারি করিয়া অনাথ আশ্রমের চাঁদা তুলি, দেশে যত রকমের স্বাস্থ্যরক্ষা করিবার সহজ উপায় ছিল, তাহার বদলে বিলাতি খেলা আমদানি করিয়াছি, জাতিসঙ্কর, বর্ণসঙ্কর, ভাবসঙ্কর, নিজেদের প্রাণ, রক্তকেও সঙ্কর করিয়া প্রাণে প্রাণে ফেরঙ্গ হইতে চেষ্টা করিতেছি। অর্থোপার্জ্জন যে আমাদের প্রকৃত জীবনযাপনের উপায় মাত্র, তাহা ভুলিয়া গিয়া বিলাতি Industrialism এর নকল করিয়া অর্থ উপার্জ্জনের জন্তই জীবনযাপন করিবার চেষ্টা করিতেছি। সাবধান, এখনও সময় আছে, বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন, সে বাণী তখন শুনি নাই, এখন শোনা ও বোঝা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। কমলাকান্তের দপ্তরে তিনি বলিয়াছেন :—

"আবার আমাদের দেশ ইংরেজী মুলুক হইয়া এই বিষয়ে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া উঠিয়াছে, ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটিরিয়েল প্রস্পেরিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছি, ইংরেজজাতি বাহ্যসম্পদ বড় ভালবাসেন—ইংরেজী সভ্যতার এইটি প্রধান চিহ্ন—তাঁহারা আসিয়া এদেশের বাহ্যসম্পদ-সাধনেই নিযুক্ত—আমরা তাহাই ভাল ভাবিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষে অন্যান্ত দেবমূর্ত্তি সকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে। সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে, দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে, দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল, দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ্ কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাস্য এই, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? * * * কি ইংরেজী, কি বাঙ্গলা সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, স্পিচ, ডিবেট, লেক্‌চার, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্যসম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয় কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্প-

দের পূজা কর। হর হর বম্‌ বম্‌! টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল! টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা মতি, টাকা গতি! টাকা ধর্ম্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ! ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে! ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে! বম্‌ বম্‌ হর হর! টাকা বাড়াও, টাকা বাড়াও, রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অর্থপ্রসূতি, ও মন্দিরে প্রণাম কর! যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর, শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক, টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পুরিয়া যাউক! মন? মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই, টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্যসম্পদ! হর হর বম্‌ বম্‌! বাহ্যসম্পদের পূজা কর, এই পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে ঋষিগণ পুরোহিত, এডাম স্মিথ পুরাণ এবং মিল তন্ত্র হইতে এই পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়। এই উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্র সকল ঢাক-ঢোল, বাঙ্গলা সংবাদপত্র কাঁসীদার, শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য এবং হৃদয় ইহাতে ছাগবলি। এই পূজার ফল ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক, তবে আইস, সবে মিলিয়া বাহ্যসম্পদের পূজা করি, আইস যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া বঞ্চনাবিল্বদলে মিষ্টকথাচন্দন মাখাইয়া এই মহাদেবের পূজা করি! বল হর হর বম্‌ বম্‌! বাজা ভাই ঢাক-ঢোল, ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁসীদার ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং নাট্যাং। আসুন পুরোহিত মহাশয়! মন্ত্র বলুন! আমাদের এই বহুকালের ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা বলিয়া আগুনে ঢালুন।"

এই Industrialismএর যজ্ঞে শুধু হৃদয় নহে, এই নবজাগরিত বাঙ্গালীজাতির যে আত্মা, তাহাই ছাগবলি, আমাদের মরিবার ইহাই প্রশস্ত পথ, আমাদের বাঁচিতে হইলে ইহাকে বর্জ্জন করিতেই হইবে।

আমি আগেই বলিয়াছি যে, শুধু কৃষিকার্য্যে আমাদের জীবন ধারণ করা অসম্ভব। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপায় অবলম্বন করিতেই হইবে। কিন্তু সে উপায় বিলাতি Industrialism নহে। আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও একটা বিশিষ্ট রীতি আছে, পদ্ধতি আছে। আমাদের বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের মধ্যে আমাদের স্বভাবধর্ম্ম সে রীতি, সে পদ্ধতি সৃষ্টি করিয়াছে। মোটামুটী ভাবে দেখিতে গেলে আমাদের ইতিহাসের ইঙ্গিতকে মানিয়া চলিলে সে পদ্ধতি সহজেই প্রকাশ হইয়া পড়ে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেশে চিরকালই চাষা তাহার কৃষিকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সে আপনার আবশ্যকীয় জিনিষপত্র অর্থাৎ খাদ্য ও পরিধানের বস্ত্র আপনিই তৈয়ারি করিয়া লইত। তাহার লজ্জানিবারণের জন্য ম্যান্‌চেষ্টারের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। তাহা ছাড়াও চাষাদের ঘরে ঘরে অনেক কুটীর-শিল্পের চলন ছিল, সুতরাং এই কুটীর-শিল্প-পণ্য ও কৃষিকার্য্যের দ্বারা তাহার যথেষ্ট অর্থাগম হইত। কিন্তু বর্ত্তমান

অবস্থায় তাহারা এত ব্যাধি-পীড়িত যে, কৃষিকার্য্য ছাড়া আর কোন কাযই করিতে পারে না। কুটীরশিল্পজাত যে পণ্য, তাহা এক রকম উঠিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে আমাদের বাঙ্গলায় ঢাকা, টাঙ্গাইল, শ্রীরামপুর, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর ও আরও অনেক স্থানে কাপড় প্রস্তুত হইত। এখনও যে একেবারে হয় না, তাহা নহে। কিন্তু প্রায় মরিয়া আসিয়াছে। তুলার চাষ উঠিয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে কি এখন এমন তুলা আজিও উৎপন্ন হয় না, চাষ করিলে কি সেটুকু ফসল ফলে না, যাহাতে আমাদের মোটা কাপড় লজ্জানিবারণের জন্য তৈয়ারি হইতে পারে? এখনও ত আমরা উপবীতের সূতা আমরা নিজেরাই তৈয়ারি করি, সে সূতা যেমন মোটা হয়, তেমনি সরুও ত হয়। যে ভাবে পূর্ব্বে আমরা কাপড় ও সূতা তৈয়ারি করিতাম, চরকায় আবার কেন তেমনি ভাবে সূতা কাটিয়া কাপড় তৈয়ারির ব্যবস্থা করি না? আমাদের গৃহস্থের ঘরে পূর্ব্বে যেমন সংসারের কাজ ও ক্ষেতের কাজ সারিয়া আপনাদের লজ্জা-নিবারণের পরিধেয় বসন নিজেরাই তৈয়ারি করিয়া লইতাম, তেমনি করিয়া আবার করিতে হইবে। ম্যান্‌চেষ্টারের মিহি বিলাতি ধুতি আর নানাপ্রকারের মাছ-পাড়, বাগান-পাড় যাহা ঢাকার তাঁতির হাতে বুনা হইত, তাহারই নকলে ছাপা কাপড় পরিতেছি ও পরাইতেছি। কাঁসা-পিতলের বাসন যাহা মুরশিদাবাদ, খাগড়া, ঢাকা, এমন কি, কলিকাতার কাঁসারিপাড়ায়ও তৈয়ারি হইত, তাহা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে, তাহার বদলে বিলাতি এনামেলের বাসন আর নানাপ্রকার ফুল লতাপাতা কাটা রঙ্গিন কাচের বাসন আমাদের ঘরে ঢুকিয়াছে। এইরূপে আমাদের দেশে কাগজ তৈয়ারি হইত, হাতীর দাঁতের অনেক রকম জিনিষ তৈয়ারি হইত, সোনা-রূপার অনেক প্রকার অলঙ্কার আমরা তৈয়ারি করিতাম, দিশী রঙ্গের ছোপান কাপড়ের যে শিল্প-ব্যবসা আমাদের দেশে অনেক স্থানে ছিল, তাহা প্রায় নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ঝিনুকের শিল্প, ডাকের সাজ ও অনেক প্রকার শিল্পের কায যাহা এক সময় আমাদের দেশের গর্ব্ব ছিল, আজ তাহা তেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আমাদের ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দেয় যে, আমাদের চাষারা নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্য নিজেরাই প্রস্তুত করিত, কৃষিকার্য্য ত করিতই, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে কুটীর-শিল্পের অনেক শিল্প-পণ্য অবসর-সময়ে প্রস্তুত করিত। যাহারা কৃষিকার্য্য করিত না, তাহারা অন্যান্য শিল্প-পণ্য প্রস্তুত করিয়া আমাদের দেশে ও জগতের হাটে হাটে বিক্রয় করিত। অবশ্য তখন আজকালকার মত কলকারখানার যে প্রতিযোগিতা, তাহা ছিল না। কলকারখানার উপরে যে ব্যবসা-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠিত, তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা যে পারিব না, এ কথা নিশ্চিত। তবে আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যকে উদ্ধার করিতে হইলে ও তাহাদের উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের কি কি উপায়

অবলম্বন করা উচিত? আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, আমরা বিলাতি Industrialism বর্জ্জন করিব। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের পণ্য-সমূহের সঙ্গে আমরা প্রতিযোগিতা করিয়া জয়লাভ করিতে পারিব না। এই সব ভাবিয়া চিন্তিয়া হিসাব করিয়া আমাদের উপায় স্থির করিতে হইবে।

প্রথম কথা, আমাদের বিলাস-বর্জ্জন। আমরা চাল বিগ্‌ড়াইয়া ফেলিয়াছি, যাহা বিগ্‌ড়াইয়াছে, তাহাকে ফিরাইতে হইবে। সকল প্রকার আক্রমণ হইতে নিজেকে সম্ভ্রমের সহিত রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম্ম, আমাদের জীবনের সেই একমাত্র মূল সূত্র। এই বিলাস, এই অযাচিত অবসাদ, জড়তা যাহা আমাদের নানাপ্রকার অস্বাস্থ্য ও ব্যাধির সঙ্গে সঙ্গে শুধু ভদ্রলোকের গৃহে নয়, কৃষকের কুটীরে পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে, তাহাকে জীর্ণবস্ত্রের মত পরিহার করিতে হইবে। মোটা কাপড় যদি আমাদের কটিতে ব্যথা দেয়, সেই বেদনা আমাদের অকাতরে আপনার ও দেশের কল্যাণের জন্য সহ্য করিতে হইবে। এই বিলাস-বর্জ্জনে যে সংযম আবশ্যক, সেই সংযমের সাধন করিতে হইবে এবং আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, ভদ্রলোকের ঘরে যাহা আরম্ভ হইবে, চাষার ঘরে তাহা অল্প দিনের মধ্যেই প্রচার হইয়া পড়িবে। এই সংযম আমাদের জীবনকে খর্ব্ব করিবার জন্য নয়, কাহারও ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করিবার জন্য নয়, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করাইয়া, আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের সংবিৎকে জাগরণের পথে আনিয়া, সমাজ ও সংবিতের সহিত এক সূত্রে বাঁধিয়া দিবার জন্য। এই সংযমে ব্যক্তিও বাঁচিবে,সমাজও বাঁচিবে এবং আমাদের বাঁচিয়া উঠা পরিপূর্ণরূপে সার্থক হইবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক্ দিয়া দেখিতে হইলে এই সংযম ও বিলাস-বর্জ্জনের ফলে আমরা অনেক অনাবশ্যকীয় পণ্যদ্রব্যের হাত হইতে রক্ষা পাইব। বাঙ্গলার জীবন সর্ব্বদাই সহজ সরল, তাহা কখনও বিচিত্র বিলাসের মধ্যে জটিল হইয়া উঠিতে পারে নাই, যখনই জটিল হইয়াছে, তখনই তাহার শক্তি হ্রাস হইয়াছে। আজ যদি বিলাতি সভ্যতার ফলে আমাদের সরল জীবনকে জটিল হইয়া উঠিতে দিই, তবে নিশ্চয় জানিও যে, আমাদের উন্নতির পথে অনেক বাধা-বিঘ্ন আসিয়া জুটিবে। যে প্রতিযোগিতায় আমরা অসমর্থ, সেই প্রতিযোগিতায় আমাদিগকে লিপ্ত হইতে হইবে এবং তাহাই আমাদের ধ্বংসের কারণ হইবে।

তার পরেই আমাদের দেখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোথায় কোথায় কি কি পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইত, সেই সব ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হইবে এবং সেই সব পণ্যশিল্পের আবার নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সকল চেষ্টার যে ভিত্তি অর্থাৎ পল্লীগ্রামের ও সহরের স্বাস্থ্য, তাহাকে পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। পল্লীগ্রামের অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাব, যেমন

করিয়াই হউক, আমাদের সেই পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে। সুতরাং আমাদের লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার ও কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ-সাধন করিতে হইলে আমাদের—

(১) ইতিহাসের বাণীকে মনে রাখিতে হইবে।

(২) ইউরোপীয় Industrialismকে বর্জ্জন করিতে হইবে।

(৩) বড় বড় সহরগুলা যে অজগর সর্পের মত পল্লীগ্রাম হইতে টানিয়া আনিয়া গলাধঃকরণ করিতেছে, তাহা বন্ধ করিতে হইবে।

(৪) তাহা বন্ধ করিবার একমাত্র উপায় পল্লীগ্রামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

(৫) পল্লীগ্রামকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত ও সঞ্জীবিত করিতে হইলে তাহার অস্বাস্থ্য দূর করিতে হইবে, কৃষক যাহাতে সুস্থ-শরীরে বারমাস পরিশ্রম করিতে পারে, তাহার উপায় করিতে হইবে।

(৬) কৃষক তাহার কৃষিকার্য্য ছাড়া যাহাতে তাহার নিজের আবশ্যকীয় দ্রব্য-গুলি প্রস্তুত করিতে পারে, তাহার উপায় দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৭) তাহার আবশ্যকীয় দ্রব্য ছাড়াও কৃষকেরা ঘরে ঘরে কি কি শিল্পপণ্য প্রস্তুত করিতে পারে, তাহাও দেখাইয়া দিতে হইবে।

(৮) আমাদের দেশে যে সব শিল্পপণ্য প্রস্তুত হইত, তাহার অনুসন্ধান করিয়া আবার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

(৯) এই সব শিল্পপণ্য লইয়া ছোট ছোট অনেকগুলি কারবার দেশের সর্ব্বস্থানে ছড়াইয়া দিতে হইবে।

(১০) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের নিতান্ত আবশ্যকীয়, তাহা রাখিয়া ইউরোপ, আমেরিকা, জাপানের অন্য সমুদয় পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন করিতে হইবে।

(১১) যে সব পণ্যদ্রব্য আমাদের দেশে সহজে প্রস্তুত হয়, সেই সম্বন্ধে আমাদের শিল্পীদিগকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে হইবে। এই শিক্ষা সহজ উপায়ে দিতে হইবে।

(১২) এই সব ছোট ছোট ব্যবসাগুলিকে ফলপ্রদ করিতে হইলে, তাহাদের টাকা দিয়া সাহায্য করিতে হইবে, এবং সেইজন্য জেলায় জেলায় জেলাবাসীদের সাহায্যে ও তাহাদের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া ব্যাঙ্ক স্থাপন করিতে হইবে।

এই ত আমাদের দেশের কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষসাধন ও লুপ্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধারের উপায়। কিন্তু এই উপায় অবলম্বন করিবার উপায় কি, অর্থাৎ এই উপায় অবলম্বন করিলে যে সব কার্য্য করিতে হইবে, তাহা আমরা করিব, না গবর্ণমেণ্ট করিবে? ইহা করা উচিত, উহা করা উচিত বলিলেই ত কাজটা আপনা আপনি হইয়া উঠে না, এই কাজের ভার কে লইবে, সেই কথা পরে বলিতেছি।

আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার কথা

যেমন সব বিষয়ে উন্নতিসাধন করিতে হইলে, আমাদের ইতিহাস ও স্বভাব-ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলেও সেই দৃষ্টি আবশ্যক। শিক্ষার মূল কথাটি কি? মানুষের যে অন্তর্নিহিত শক্তি, তাহার যে আত্মসংবিৎ, তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেওয়া, সিংহকে জাগাইয়া দেওয়া, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবার ধর্ম্মকে ফুটাইয়া তোলাই শিক্ষাদীক্ষার কার্য্য। এই অন্তর্নিহিত শক্তি উদ্বুদ্ধ করিতে পারিলে দীক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তখন প্রাণের পরতে পরতে আত্মার প্রতিবিম্ব পড়ে, ধর্ম্ম তাহাকে আশ্রয় করে, প্রেম তাহাকে আলিঙ্গন করে এবং মানুষ প্রকৃতপক্ষে মানুষ হইয়া উঠে। এই পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বকে বিকাশ করাই শিক্ষার বিশিষ্ট কার্য্য। এই শিক্ষাই বাঙ্গলার মাটীর দান, তাহার প্রাণের বাণী। এই শিক্ষার কার্য্য পুরাকালে আমাদিগের দেশে অনেক প্রকারে সাধিত হইত, গুরুর গৃহে, সংসারের সকল অনুষ্ঠানের মধ্যে, পল্লীতে পল্লীতে যাত্রা-গানে, কবি-গানে, কথকতার মধ্যে, ভাগবত-পাঠে, রামায়ণ-গানে, চণ্ডীর গানে, ধর্ম্মঠাকুরের কথায়, হরিসভার সংকীর্ত্তনে, মেয়েদের ব্রত উদ্‌যাপনে— এইরূপ নানা প্রকারে আমাদের দেশে সরল উপায়ে শিক্ষার বিস্তার হইত। দেশের বড় বড় টোলে, বিক্রমপুরে, নবদ্বীপে, কাশীতে, সংস্কৃত সাহিত্যে, শাস্ত্র ও দর্শনের সাহায্যে আমাদের দেশের সেই সরল শিক্ষাই আরও গভীরভাবে প্রচারিত হইত। যে দেশের চাষারা চাষ করিতে করিতে—

"মন রে তুমি কৃষিকাজ জান না,
এমন মানব-জনম রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

এই বলিয়া গান ধরে; যে দেশের মাঝিরা দাঁড় টানিতে টানিতে—

"মন মাঝি তোর বইঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না"

বলিয়া তান তোলে; যে দেশের মেয়েরা—

"তুলসী তুলসী নারায়ণ
তুমি তুলসী বৃন্দাবন।

তোমার তলে ঠেকাই মাথা
শুন তুলসী প্রাণের কথা।
তুলসী তোমায় করি নতি
রেখ ধরম আমার পতি।
তোমার তলে দিলেম আলো
পরকালে রেখো ভাল।"

এই মন্ত্র বলিতে বলিতে তুলসীতলায় সান্ধ্যপ্রদীপ জ্বালিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করে, যে দেশে পণ্যব্যবসায়ী হাট হইতে ফিরিবার সময় খেয়া পার হইতে হইতে—

"দিন ত গেল সন্ধ্যে হ'ল
হরি, পার কর আমারে"

বলিয়া গান গায়; যে দেশের বিবাহের অনুষ্ঠানে, গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করিতে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়—

"ওঁ ঈশে একপদী:ভব, সা মামনুব্রতা ভব"

ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত প্রথম পদনিক্ষেপ কর এবং আমার অনুব্রতা হও, যার সপ্তম পদক্ষেপে—

"ওঁ সখ্যে সপ্তপদী ভব, সা মামনুব্রতা ভব।"

আমার সহিত সখ্যবন্ধন কর ও আমার অনুব্রতা হও—

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বে দেবাঃ সমাপো হৃদয়ানি নৌ।
সম্মাতরিশ্বা সন্ধাতা সমুদেষ্ট্রি দধাতু নৌ॥"

বলিয়া গৃহকে, গার্হস্থ্য আশ্রমকে, গৃহধর্ম্মকে সকল জীবনের সঙ্গে, সকল কর্ম্মের সঙ্গে ভগবান্‌কে গাঁথিয়া লয়; যে দেশের তর্পণের শেষ কথা—

"আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু"

যে দেশে সকল কর্ম্মে ও সকল কর্ম্মশেষে প্রাণ-মন খুলিয়া "বিষ্ণু-প্রীতি-কামনায়ৈ" বলিয়া অঞ্জলি দান করিতে হয়; যে দেশের মাটীতে বিশ্বরাজ্যের, প্রাণরাজ্যের সকল রূপ, সকল রস, সকল সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিয়া, সকল জ্ঞান-সমুদ্র শোষণ করিয়াও ভগবৎপ্রেম ও করুণায় নিজেকে ডুবাইয়া, মহাপুরুষ ভোগের বীরত্বে, ত্যাগের বীরত্বে তারস্বরে বলিয়া উঠেন—

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাম্ বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্‌ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

সে দেশের শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ কি এবং কি রকম সহজ সরলভাবে সেই শিক্ষার বিস্তার হইত, তাহা বলিয়া বুঝাইবার আবশ্যক করে না।

কিন্তু আমাদের সকল আদর্শের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শও হীন হইয়া পড়িয়াছে এবং আমরা সেই একই কারণে সহজ সরল উপায় ছাড়িয়া দিয়া, শিক্ষা-দীক্ষাকে জটিল ও দুরূহ করিয়া তুলিয়াছি। এখন আমাদের দেশে যাহাকে উচ্চশিক্ষা বলে, তাহা বিস্তার করিবার জন্য ইউনিভারসিটির একটা বিরাট্ স্তম্ভ খাড়া করিয়াছি। রামমোহন যে ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা ও যে ইংরাজী ভাষার সাহায্যে দেশের শিক্ষাবিস্তার করিবার পন্থা দেখাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা হয় ত ঠিক সেই সময়ে আবশ্যকীয় ছিল। কিন্তু এখন আমার মনে হয়, ইংরাজী শিক্ষার সাহায্যে শিক্ষাবিস্তার করায় অনেক দোষ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। আমাদের হাব-ভাব, আচার-ব্যবহার সবই এত ইংরাজী-নবীস হইয়াছে যে, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, শিক্ষিত বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের কোন যোগ নাই। এই শিক্ষার ফলে আমরা বস্তুর সঙ্গে পরিচয় লাভ করিয়া তাহার প্রাণের কাছে গিয়া তাহাকে ছুঁইতে পারি নাই, কেবল উপর হইতেই দেখিয়াছি, আর কতকগুলা ইংরাজী শব্দ মুখস্থ করিয়াছি। আমরা মানুষ হইয়া উঠি নাই, একটু বেশী চালাক হইয়াছি মাত্র। বক্তৃতার সময় সেই মুখস্থ করা কথাগুলো তোতার মত আওড়াইয়া যাই এবং সেই কথার ঝুড়ি বোঝাই করিয়া মাথায় করিয়া বেড়াই। কিন্তু কথা এক জিনিষ, আর প্রকৃত জ্ঞান আর এক জিনিষ—এই কথাটি আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত। একটু বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, যাহারা ইংরাজী শিক্ষা পায় নাই, যাহাদের তোমরা অশিক্ষিত বলিয়া ঘৃণা কর, তাহাদের দয়া-মায়া আছে, ধর্ম্ম আছে, তাহারা মানুষের দুঃখ বোঝে, অতিথিসেবা করে, দেবতাকে ভক্তি করে। আমাদের যে স্বভাবজাত শিক্ষায় মানুষকে মাটীর মানুষ করে, সে শিক্ষা তাহাদের আছে। আমার মনে হয়, আমাদের এই নব-জাগরিত জাতিকে প্রকৃত জ্ঞানের দিকে চালনা করিতে হইলে, আমাদের উচ্চশিক্ষা আমাদেরই ভাষায় দিতে হইবে। নিজের ভাষা শিখিতে হইলে নিজের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপিত করিতে হইবে এবং আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার যে সরল সত্যবাণী, তাহারই দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। এই সব দিকে চোখ রাখিয়া যে উচ্চশিক্ষা, তাহাই প্রকৃত পক্ষে উচ্চ। আমরা এখন যে উচ্চশিক্ষা পাই, তাহা একটা ধার করা জিনিষ, তাহার সঙ্গে সেই কারণে আমাদের দেশের স্বভাবধর্ম্মের সঙ্গে যোগ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শুধু তাহাই নয়, এই যে একটা অলীক শিক্ষা আমাদের দেশে বিস্তারিত হইতেছে,

ইহার জন্ত এত আড়ম্বর কেন, এত রকম আড়ম্বরের মধ্যে যে শিক্ষার প্রাণটুকু মরিয়া যায়। দেশে টাকা নাই—ছেলেরা বই কিনিতে পারে না, বই কিনিবার জন্য ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তবু যেখানে একখানা বই হইলে চলে, সেখানে পাঁচখানা বইয়ের ব্যবস্থা। এই ছেলেদের শিক্ষার জন্ত আমাদের দেশে কত রকম সরল উপায় ছিল, এখন বৃহৎ প্রাসাদ না হইলে শিক্ষা হইতে পারে না। আমরাই শিশুকালে বালির কাগজে অঙ্ক কসিতাম, কলেজে পর্য্যন্ত সেই কাগজেই আমাদের কায চলিত। এখন স্কুলের নিম্ন-শ্রেণী হইতে রুল-করা ভাল কাগজের বাঁধান খাতা না হইলে নাকি লেখা-পড়া হয় না! যে বিলাসকে বর্জ্জন করাই আমাদের বাঁচিবার একমাত্র উপায়, এই উচ্চশিক্ষার প্রণালী ও ব্যবস্থা সেই বিলাসকেই বাড়াইয়া দিতেছে। বড় বড় কলেজের বোর্ডিংএর জন্ত খুব বড় বড় বাড়ীর আবশ্যক। এই সব দ্বিতল বাড়ীতে থাকা যাহাদের অভ্যাস হইতেছে, তাহারা কি আর তাহাদের নিজ নিজ পল্লীগ্রামের কুটীরে গিয়া থাকিতে পারিবে? এই যে শিক্ষাবিস্তারের উপায়, ইহা ত আমাদের দেশের উপায় নয়, তবে কেন আমরা ইহার বিপক্ষে আন্দোলন করি না! লাভ ত এইটুকু মাত্র যে, বিলাতের ফ্যাক্টারিতে যেমন নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, আমাদের এই ইউনাভারসিটি-ফ্যাক্টারিতে বিএ, এমএ, পি এচ্ ডি, পি আর এস, এইরূপ কতকগুলি জীব তৈয়ারি হয়, প্রকৃত মানুষ তৈয়ারি হয় না। শিক্ষা-দীক্ষার যে মূল উদ্দেশ্যের কথা বলিয়াছি, সে উদ্দেশ্যের অন্তরায় হয়। এই শিক্ষাতে আমাদের ছাত্রদিগের আত্মসংবিৎকে জনমের তরে বিসর্জ্জন দিবার পথ করিয়া দেয়। এই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী আত্মম্ভরী, অহঙ্কারী, সে আত্মজ্ঞানের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া, জ্ঞানের রাজ্যে দাসখত লিখিয়া দেয় আর বিজ্ঞানের বড়াই করে। তাই বলিতেছিলাম, ইহার জন্ত এত আড়ম্বর কেন? এত ধনব্যয় কেন?

বিশ্ববিদ্যালয়ে আগে বাঙ্গলা পড়া হইত না, এখন হয়, এই লইয়া সময় সময় আমরা অহঙ্কার করি। বাঙ্গলা ভাষাকে যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে সমস্ত বাঙ্গালীরই কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকা উচিত। শুনিয়াছি, এই চেষ্টার মূলে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি যে এ বিষয়ে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছেন, সন্দেহ নাই, এবং সেই জন্ত তিনি দেশের ও দশের ধন্যবাদভাজন। কিন্তু আমাদের ভাষাকে কি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রহণ করিয়াছে? আমি শুনিয়াছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষার জন্ত বাঙ্গলা কবিতা পড়ান হয় না, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে বাঙ্গলা কবিতার কোন বই পাঠ্য-পুস্তক হইতে পারে না। আমি শুনিয়াছি, এই নিয়মের উদ্দেশ্য—শুধু বাঙ্গলা লিখিবার রীতি শিখান হইবে, আর কিছু হইবে না। এ কথা শুনিয়া আমি অবাক্ হইয়াছিলাম। বাঙ্গলা

ভাষার যে অশেষ-সম্পদ্, তাহাতে কি বাঙ্গলা ছাত্রের কোন আবশ্যক নাই? বাঙ্গলা ভাষা কি শুধু একটা রীতির বিষয়? বাঙ্গলা ভাষার যে অনন্ত সৌন্দর্য্য আছে, বাঙ্গলা সাহিত্যের যে একটা অতল প্রাণ আছে, সে কথা ভুলিয়া গিয়া কি আমাদের শিক্ষা-প্রণালী নির্দ্ধারিত করিতে হইবে? আমার বাঙ্গলা ভাষা যে রাজরাণী, আপনার গৌরবে সে যে গরবিণী। এই যে তোমরা বল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলা প্রবেশ করিয়াছে, মনে রাখিয়ো, তাহার যে নিজস্ব গৌরব, সে গৌরবে তাহাকে প্রবেশ করিতে দাও নাই, সামান্যা দাসীর মত তোমাদের এই কারখানার মধ্যে একটা কোণায় তাহাকে বসিবার একটু ঠাঁই দিয়াছ মাত্র।

আমি আজ বাঙ্গলার মহাসভায় সাহস করিয়া বলিতেছি যে, এই শিক্ষা-দীক্ষার প্রণালী সমূলে পরিবর্ত্তিত না করিলে, ইহার মুখ ফিরাইয়া না দিতে পারিলে, ইহাকে আমাদের দেশের যে স্বভাবধর্ম্ম, আমাদের দেশের যে সভ্যতা, সাধনা, তাহার সহিত যোগ করিয়া না দিতে পারিলে ও এই শিক্ষাকে সাধারণের সহজসাধ্য করিয়া না তুলিতে পারিলে, আমাদের ঘোর বিপদের কথা।

তার পর, যাহাকে আমরা নিম্নশ্রেণীর শিক্ষা বলি, তাহার কথা। কেহ কেহ বলেন, জোর করিয়া আমাদের দেশের সকলকেই ক, খ আর এ, বি, সি, ডি, পড়াইতে হইবে, না করিলে তাহারা মানুষ হইবে না। এই কথা কি কেহ তলাইয়া ভাবিয়া দেখিয়াছেন? না অন্যান্য দেশে আছে বলিয়াই আমাদের দেশে চালাইতে হইবে? আমাদের দেশের চাষারা যে মানুষ, আমাদের চেয়ে তাহাদের মনুষ্যত্ব কোন রকমেই যে কম নয়। আমাদের ইউনিভারসিটি যেমন একটা বৃহৎ, প্রকাণ্ড, অশেষ ব্যয়সাধ্য বিরাট্ কলের কারখানা হইয়া উঠিয়াছে, নিম্ন-শিক্ষার জন্যও কি ঠিক ঐরূপ একটি কারখানা তৈয়ারি করিতে হইবে? ইহার উপরে কি আবার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইবে? আমি স্বীকার করি যে, আমাদিগের চাষাদের লেখা-পড়া শিখান উচিত; কিন্তু দোহাই তোমাদের, তাহাদের আবার কারখানার ভিতরে জুড়িয়া দিও না। আমাদের চাষারা সহজ জ্ঞানে ও অনেক দিনকার সাধনার বলে সভ্য। তাহাদের ক, খ, কি এ বি, সি, শিখান এমন একটা কঠিন ব্যাপার নহে। আমরা ইচ্ছা করিলে তাহা অতি সহজেই সম্পন্ন করিতে পারি। তাহার জন্য অনেকগুলা স্কুলের দরকার নাই, অনেকগুলা মাষ্টারের দরকার হইবে না, অনেকগুলা বাঙ্গলা ইংরাজী কেতাবের দরকার হইবে না, রুলকরা কাগজের বাঁধান খাতারও আবশ্যক হইবে না। ইংরাজী শিক্ষায় তাহাদিগকে খুব পণ্ডিত করিয়া তোলারও আবশ্যক নাই। আমাদের গ্রামে গ্রামে যে সকল পুরাতন প্রথা ছিল, সেই সব পুরাতন জিনিষগুলা আবার চালাইয়া দেও। তাহার সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে গ্রামে দুই একটা মোড়লের বাড়ীতে দুই একটা

নৈশবিদ্যালয় স্থাপন কর। তাহা হইলেই আমাদের চাষাদের যে শিক্ষা আবশ্যক, সেই শিক্ষার সহজেই বিস্তার হইবে। বাঙ্গলার মাটীতে, বাঙ্গলার ভাষায় যে শিক্ষা সহজে দেওয়া যায় এবং যে শিক্ষা বাঙ্গালী তাহার স্বভাবগুণে সহজেই আয়ত্ত করে, সেই শিক্ষাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ফল কথা, উচ্চশিক্ষাই হউক, কি নিম্ন-শিক্ষাই হউক, সকল রকমের শিক্ষাকেই বাঙ্গালী জাতির যে শিক্ষা-দীক্ষার আদর্শ, তাহার উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। আগেই বলিয়াছি, বাঙ্গালীর শিক্ষার আদর্শ কি—সংক্ষেপে বলিতে গেলে শিক্ষাকে শুধু কথার ব্যাপার না করিয়া তাহাকে যথার্থ করিয়া তুলিতে হইবে। ধার-করা বিজ্ঞানের অহঙ্কার হইতে তাহাকে মুক্ত করিতে হইবে। প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চ্চায় তাহাকে নিযুক্ত করিতে হইবে। তাহাকে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে এবং সর্ব্ববিষয়ে আমাদের জাতির স্বভাবধর্ম্মের পূর্ণবিকাশের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সেই শিক্ষাকে সার্ব্বভৌমিক করিয়া তুলিতে হইবে।

এই ত উপায়। কিন্তু ইহা সাধিত হইবে কিরূপে? এ কার্য্য আমাদেরই করিতে হইবে কি গবর্ণমেণ্টের করিতে হইবে, সে কথা পরে বলিতেছি।

কাযের তালিকা ত শেষ হইল, এখন কি উপায়ে এই সব কাজ হাতে করিয়া করিতে হইবে, তাহারই বিচার করিব। কিন্তু তার আগে একটা কথা বলিয়া রাখি, একটু বিচার করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, কেন এখন পর্য্যন্ত কর্ম্মক্ষেত্রে আমাদের সব চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। আমাদের দেশের জনসাধারণকে লইয়া আমরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হই নাই, তাই আমাদের দেশ আমাদের কোন কাযই আপনার বলিয়া গ্রহণ করে নাই। আমাদের উচ্চশিক্ষার অভিমান, অর্থের অভিমান, আমাদের বর্ণের অভিমান, আমাদের ধর্ম্মের অভিমান, আমাদের এমনি অন্ধ করিয়া দিয়াছে যে, যাহাদের লইয়া দেশের রক্ত, মাংস, প্রাণ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদেরই বাদ দিয়া আমরা দেশের কার্য্যকে সার্থক করিতে চাই। যাহার যাহা নাই, সে তাহারই বড়াই করে। যাহার প্রকৃত শিক্ষা হয় নাই, সে শিক্ষার বড়াই করিবে না ত কে করিবে? আমরা—দেশের বাবুরা—প্রকৃত পক্ষে অশিক্ষিত, তাই আমাদের এত শিক্ষার অভিমান। আমরা গেঁয়ে অশিক্ষিত লোকেদের সঙ্গে মিশিব কি করিয়া? তাই আমরা তাহাদের সঙ্গে পৃথক্ হইয়া কায করিতে যাই। আমাদের মধ্যে যাহারা প্রকৃতপক্ষে ধনী, তাহারা ধনগর্ব্বে এতই স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে যে, সাধারণ লোকের সঙ্গে আদান-প্রদান করিতে নিজেদের অপমানিত বোধ করে। আবার আর এক দল আছে, যাহাদের টাকা নাই অথচ টাকার অভিমান আছে। তাহারা বহুদিনের বসতবাটী ও স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া কন্যার বিবাহ দেয় এবং নিতান্ত নির্লজ্জের মত সেই বিবাহে জাঁকজমক করে।

তাহারা প্রাণে প্রাণে জানে যে, তাহারা নিতান্তই গরীব; কিন্তু তাহারা ত আর লাঙ্গল লইয়া চাষ করে না, তাহারা যে মাসান্তে মাহিয়ানার টাকা লইয়া পকেট ঝন্ঝন্ করা-ইতে করাইতে বাড়ী ফেরে। সহরে যিনি বাবু, পল্লীগ্রামে তাঁর একটু সম্পত্তি আছে; যাঁহার আয় বার্ষিক সাড়ে তিন টাকা—সেইখানে তিনি ভুঁইয়া। যিনি সহরে বাবু ও পল্লীগ্রামে ভুঁইয়া, তিনি যদি চাষাকে ডাকিয়া এক সঙ্গে কায করেন, তাঁহার মান থাকে কি করিয়া? তাই বলিতেছিলাম, টাকার অভিমান আমাদিগকে অন্ধ করিয়াছে। এই যে 'শিক্ষিত' আর 'অশিক্ষিত', এই যে 'ধনী' অথবা টাকা না থাকিয়াও টাকার 'অভিমানী' আর বাস্তবিকই যারা গরীব, ইহাদের মধ্যে নূতন করিয়া একটা বর্ণভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। আমাদের দেশে এখন শাস্ত্রে যাহাকে বর্ণাশ্রম বলে, তাহার চিহ্নও দেখিতে পাওয়া যায় না,—তাই আমাদের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের এত বড়াই। এখন ব্রাহ্মণ শাস্ত্রের আলোচনা কমই করে, কেরাণীগিরি করে, ওকালতি করে, ব্যারিষ্টারি করে, জজও হয়, সকল প্রকার ব্যবসাবাণিজ্য করে, জুতার দোকান দেয় ও ভাঁটীখানার মালিক হয়, 'অশ্বিণ ছ্যাদে' বলিয়া শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ায়। মন্ত্র পড়াইবার সময় কার্ত্তিকে মাসি বলিতে শ্রীমান্ কার্ত্তিকচন্দ্রের মাতৃ-ষসা বোঝে, বিসর্গ অনুস্বারে পূর্ণ ভূরি ভূরি মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াও শাস্ত্রের বিন্দুবিসর্গ জানে না,—এ হেন যে ব্রাহ্মণ, ইহার বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বড়াই কেন? এখন বৈদ্য-কায়স্থও তাহাদের নিজ নিজ কার্য্যের যে গণ্ডী, তাহার মধ্যে আবদ্ধ না থাকিয়া, ব্রাহ্মণেরা যে সব কার্য্য করে, অশুদ্ধ মন্ত্র পড়ান ছাড়া, তাহারাও সেই সব কাযই করে। তবে বৈদ্য ও কায়স্থের এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বড়াই কেন? আমি ত ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থের মধ্যে কার্য্যগত কোন পার্থক্য দেখিতে পাই না। এই যে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রম, তাহা বাঙ্গলায় কোথাও খুঁজিয়া পাই না, তাই এই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি না। আমি এ ক্ষেত্রে কোন সামাজিক প্রশ্ন তুলিতে চাই না। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ভাল কি মন্দ, কি বর্ণাশ্রম আবার নূতন করিয়া, আমাদের বর্ত্তমান স্বাভাবিক অবস্থার অনুযায়ী করিয়া গঠিত করা উচিত কি না, তার কোন কথাই এ ক্ষেত্রে উঠিতে পারে না। আমি শুধু এই কথাই বলিতে চাই, আবার নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়, গড়িয়া তুল। কিন্তু তাহার আগে যাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে, সেই প্রাণ-হীন জিনিষটাকে টানাটানি করিয়া, মিথ্যা অহঙ্কার ও অভিমানের সৃষ্টি কর কেন? এখন যে আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্যক্ষেত্র, এই যে দেশের কায, তাহা হিন্দু-মুসলমান একত্র হইয়া মিলিয়া মিশিয়া করিতে হইবে—ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া না করিলে কোন কার্য্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না। যে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অভিমান এই কার্য্যের অন্তরায়, আমি সেই অভিমানের কথাই বলিতেছিলাম। যাহারা বর্ত্তমান

বাঙ্গলার চারি কোটি ষাট লক্ষের মধ্যে চারি কোটি, যাহারা দেশের সার বস্তু, যাহারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া মাটী কর্ষণ করিয়া আমাদের জন্ত শস্ত উৎপাদন করে, যাহারা ঘোর দারিদ্রের মধ্যেও মরিতে মরিতে বাঙ্গলার নিজের সভ্যতা ও সাধনাকে সজাগ রাখিয়াছে, যাহারা সর্ব্বপ্রকার সেবায় নিরত থাকিয়া আজিও বাঙ্গালীর ধর্ম্মকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে, যাহারা আজিও শুদ্ধচিত্তে সরল প্রাণে মর্ম্মে-মর্ম্মে বাঙ্গলার মন্দিরে মন্দিরে পূজা দেয়, মস্‌জিদে মস্‌জিদে প্রার্থনা করে, যাহাদের জন্ত বাঙ্গালী আজিও বাঙ্গালী, যাহারা বাঙ্গলার মাটী ও বাঙ্গলার জলের সঙ্গে এক হইয়া, বাঙ্গালী জাতির জাতিত্বকে জ্ঞানে কি অজ্ঞানে সাগ্নিকের অগ্নির মত জ্বালাইয়া জাগাইয়া রাখিয়াছে, যাহাদের আমরা বিলাতী শিক্ষার মোহে, আইন-আদালতের প্রভাবে, জমিদারের খাজনা ন্যায্যভাবে কি অন্যায় করিয়া বাড়াইবার জন্ত, শত প্রলোভন দেখাইয়া, শত অত্যাচার করিয়াও একেবারে নষ্ট করিতে পারি নাই, যাহারা বাস্তবিকই বাঙ্গলা দেশের একাধারে রক্ত মাংস প্রাণ, তাহারা বড় কি আমরা বড়? কোন্ সাহসে, কিসের অহঙ্কারে তাহাদের জল স্পর্শ করি না, কাছে আসিলে ঘৃণিত কুক্কুরের মত তাড়াইয়া দিই? এত অহঙ্কার কিসের? এত দাম্ভিকতা কেন? আমরা, যাহারা হিন্দু হিন্দু বলিয়া চীৎকার করি, আস্ফালন করি, সেই আমরা যে দিনে দিনে হিন্দুধর্ম্মের যে মর্ম্মস্থান, সেখানে ছুরিকা আঘাত করিতেছি! এমনই আমাদের মোহ, আমরা কি তাহা দেখিয়াও দেখিব না—বুঝিয়াও বুঝিব না? বর্ণাভিমান লইয়া এমনই করিয়া মরণের পথে ভাসিয়া যাইব? ঐ যে মা ডাকিতেছেন—সাবধান! সাবধান! ওঠ! জাগ! মিথ্যা অভিমানকে বর্জ্জন কর! ঐ যে বাঙ্গলার কৃষক সমস্ত দিন বাঙ্গলার মাঠে মাঠে আপনার কায ও আমাদের কায শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বাঙ্গলার কুটীরে কুটীরে, বাঙ্গলার গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছে, উহারা মুসলমান হউক, শূদ্র হউক, চণ্ডাল হউক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অহঙ্কারী! মাথা নোয়াও, মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ! অবিশ্বাসী! তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, জাগাও! তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! আততায়ী! তোমার হাতের ছুরি ফেলিয়া দাও—জন্মের মত ফেলিয়া দাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ! ডাক! ডাক! সবাইকে ডাক! প্রাণের ডাক শুনিলে কেহ কি না আসিয়া থাকিতে পারে? ওঠ! জাগ! ডাক! আপনার কল্যাণকে জাগাও! বল, এস ভাই, তুমি মুসলমান হও, খৃষ্টিয়ান হও, শূদ্র হও, চণ্ডাল হও, তোমাকে আলিঙ্গন করি, এ যে আমার কায—এ যে তোমার কায, এ যে মায়ের কায! একবার তবে ডাকার মত ডাক, দেখিবে সকলেই আসিবে, দেখিবে সকল কার্য্যই সার্থক হইবে! আমি আবার বলি, উঠ, জাগ, ডাক। আপনার কল্যাণকে জাগাও!

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত—
—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় !

এক সঙ্গে কায করিতে হইবে, কিন্তু কি প্রণালীতে কায করিব ? আমাদের সরল জীবন অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। তাই নিয়ম চাই—প্রণালী চাই। আমাদের কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হইলে সমস্ত বাঙ্গলা দেশটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া লইতে হইবে, সে ভাগ নূতন করিয়া করিতে হইবে না। গবর্ণমেণ্ট আমাদের দেশটাকে জেলায় জেলায় ভাগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই আমাদের কায চলিবে। এই প্রত্যেক জেলায় একই রকম নিয়ম, একই রকম প্রণালীতে কায করিতে হইবে। আমি একটি জেলা আমার মনে রাখিয়া এই কার্য্য-প্রণালীর কথা বিচার করিতেছি। আপনারা মনে রাখিবেন, এই একই কার্য্যপ্রণালী সমস্ত জেলাতেই চালাইতে হইবে। প্রত্যেক জেলাতেই অনেকগুলি গ্রাম আছে। জনসংখ্যা ও কার্য্যের সুবিধা অনুসারে, কতকগুলি গ্রাম লইয়া, এক একটি পল্লী বা গ্রাম্যসমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। এই সব গ্রামের ১৬ বছরের যুবক হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ণ-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলেই এই সমাজভুক্ত হইবে। তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। তাহারা সকলে মিলিয়া পাঁচজন পঞ্চায়েত নির্ব্বাচন করিবে। এই পঞ্চায়েতের উপর ঐ সকল গ্রামসমূহের সকল কার্য্য—সকল শুভাশুভের ভার অর্পিত হইবে। তাঁহারা গ্রামের পথ-ঘাটের ব্যবস্থা করিবেন। গ্রামের স্বাস্থ্য কি করিয়া রক্ষা করা যায়, তাহার উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া, তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবেন। তাঁহারা এই সকল গ্রামে আমাদের দেশের যে সকল যাত্রা, গান ইত্যাদির কথা বলিয়াছি, সেই সব আবার চালাইতে চেষ্টা করিবেন। যে নৈশবিদ্যালয়ের কথা বলিয়াছি, তাহা তাঁহারাই স্থাপন করিবেন। চাষাকে কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে, স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে, যে সকল শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। তাঁহারাই আবশ্যকীয় নূতন পুষ্করিণী খনন করাইবেন ও পুরাতন পুষ্করিণী সংস্কার করাইবেন। সমস্ত গ্রামগুলি যাহাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে, তাহা দেখিবেন। চাষারা যাহাতে বারমাস পরিশ্রম করিয়া নিজেদের আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিতে পারে ও অন্যান্য কি কি শিল্প-পণ্যও প্রস্তুত করিতে পারে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে শিক্ষা দিয়া, এই সব কার্য্যের উপায় করিয়া দিবেন। এই পল্লী-সমাজ প্রতি পল্লীতে একটি সাধারণ ধান্যাগার স্থাপন করিবেন। প্রত্যেক গৃহস্থ চাষামাত্রেই সেই ধান্যাগারে তাহাদের ক্ষেতের ফসল হইতে কিছু কিছু করিয়া ধান্য দিবে। পল্লী-সমাজ সেই ধান্যাগার যাহাতে সুরক্ষিত থাকে, তাহার ব্যবস্থা করিবেন। যখন অজন্মা, দুর্ভিক্ষ বা বীজের জন্য ধান্যের অভাব হইবে, তখন

পল্লীসমাজ, চাষাদের প্রয়োজনমত হিসাব করিয়া ধার দিবেন। পরে আবার ফসল হইলে তাহারা সেই পরিমাণ ধান্য ধান্যাগারে পূরণ করিয়া দিবে।

এই সব গ্রামবাসীদের মধ্যে কোন কলহ অথবা ছোট ছোট দেওয়ানী ও ফৌজদারী মকদ্দমা উপস্থিত হইলে, উক্ত পঞ্চায়েতই তাহার নিষ্পত্তি করিয়া দিবেন এবং বড় বড় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মকদ্দমা তদন্ত করিয়া সবডিবিসন ও জেলার আদালতে পাঠাইয়া দিবেন। তাঁহাদের সেই তদন্ত-বিবরণই সব আদালতে নালিশ ও আর্জ্জী বলিয়া গৃহীত হইবে। ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে অন্য নালিশ বা আর্জ্জী গৃহীত হইবে না।

এইরূপে প্রত্যেক জেলায় জনসংখ্যা অনুসারে ২০টি ২৫টি পল্লীসমাজ থাকিবে, এই প্রত্যেক পল্লীসমাজে পাঁচ জন পঞ্চায়েত ব্যতীত, জেলা-সমাজের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে পাঁচ হইতে পঁচিশটি পর্য্যন্ত সভ্য নির্ব্বাচন করিবেন। এই পল্লীসমাজের নির্ব্বাচিত সভ্য লইয়া জেলা-সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রত্যেক পল্লীসমাজ এই জেলা-সমাজের অধীনে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। এই জেলা-সমাজ—

(১) সেই জেলা-ভুক্ত সকল পল্লীসমাজের কার্য্য:তদন্ত করিবে।

(২) সকল পল্লীসমাজের শিক্ষা-দীক্ষার কার্য্য যাহাতে সুসম্পন্ন হয়, তাহার উপায় করিয়া দিবে ও জেলার যে রাজধানী, তাহার শিক্ষা-দীক্ষার ভার লইবে।

(৩) কৃষিকার্য্য ও কুটীর-শিল্পের যাহাতে উন্নতি ও প্রসার হয়, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিয়া কার্য্যে পরিণত করিবে।

(৪) সকল পল্লীসমাজের অধীনে সেই সব গ্রাম তাহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে তদন্ত করিবে ও সকল পল্লীসমাজ সেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সৎপথে চালাইয়া লইবে। ইহা ব্যতীত জেলার যে সহর বা রাজধানী, তাহারও স্বাস্থ্যরক্ষার ভার জেলা-সমিতির অধীনে থাকিবে।

(৫) জেলার মধ্যে কোন্ কোন্ দ্রব্যের ব্যবসা-বাণিজ্য চলিতে পারে, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ও উপযুক্ত লোক নির্ব্বাচন করিয়া ছোট-খাট ব্যবসা চালাইয়া দিবে।

(৬) গ্রামে গ্রামে আবশ্যকীয় চৌকীদার নিযুক্ত করিবে। এই চৌকীদারগণ পল্লীসমাজের পঞ্চায়েতের অধীনে ও জেলা-সমাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিবে।

(৭) জেলার সাধারণ পুলিশের ভার জেলা-সমাজের হাতেই থাকিবে।

(৮) সেই জেলার যে সব আইনের দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, তাহা জেলা-সমাজের হাতে থাকিবে না। তাহারা সম্পূর্ণরূপে হাইকোর্টের অধীনে থাকিবে।

(৯) এই জেলা-সমাজের সভ্যসংখ্যা জেলার জনসংখ্যা অনুসারে দুই শত হইতে পাঁচ শত পর্য্যন্ত হইবে।

(১০) এই জেলা-সমাজ একজন সভাপতি নির্ব্বাচন করিবে, এবং প্রত্যেক

বিষয়ের জন্য ভিন্ন সভা গঠিত করিবে। কিন্তু প্রত্যেক সভাই এই জেলা-সমিতির অধীনে কার্য্য করিবে।

(১১) জেলার কৃষিকার্য্য, কুটীরশিল্প ও অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য, অর্থের সুবিধার জন্য একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করিবে। এই ব্যাঙ্কের শাখা প্রত্যেক পল্লীসমাজেই একটি একটি করিয়া থাকিবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে ভাল করিয়া চলিতে পারে, তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে। চাষারা মহাজনদের নিকট হইতে দাদন না লইয়া এই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইবে, এবং তাহারা যাহাতে খুব কম সুদে টাকা ধার পাইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই ব্যাঙ্ক যাহাতে জেলার সকলের সমবেত চেষ্টার দ্বারা চালিত হইতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১২) জেলা ও পল্লী-সমাজের কোন কার্য্যেই গবর্ণমেণ্টের কোন কর্ম্মচারী সংশ্লিষ্ট থাকিবে না।

(১৩) জেলা-সমাজ ও পল্লী-সমাজের সকল কার্য্য-নির্ব্বাহের জন্য ট্যাক্স করিয়া আবশ্যকীয় টাকা উঠাইবার ক্ষমতা জেলা-সমাজের হস্তে নিহিত থাকিবে।

(১৪) পল্লীসমাজ ও জেলাসমাজের এই সমস্ত কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকরণ করিবার জন্য ও ক্ষমতা দিবার জন্য আবশ্যকীয় আইন করিতে হইবে।

(১৫) এই আইন কার্য্যে পরিণত হইলে, এখন যে সব Local Board ও District Board আছে, তাহা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

(১৬) এই জেলাসমাজকে আবশ্যকীয় ক্ষমতা দিতে হইলে জেলার Magistrateএর এখন যে ক্ষমতা আছে, তাহার আবশ্যকীয় পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

(১৭) এই জেলা-সমাজ-সমূহকে বঙ্গীয় কার্য্য-নির্ব্বাহক সভার সঙ্গে যুক্ত করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহাতে আরও অনেক জিনিষ সন্নিবেশিত করিতে হইবে। আমি শুধু মোটা মোটা কথাগুলির উল্লেখ করিয়াছি।

এই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে কার্য্য না করিলে, আমাদের সিদ্ধিলাভ করা একেবারে অসম্ভব। আমাদের জাতীয় জীবনকে প্রতিষ্ঠিত ও পরিপুষ্ট করিতে হইলে, ইহাই একমাত্র উপকরণ। আমি ইহাকে Home Rule বলিতে চাহি না, স্বরাজ বলিতে চাহি না, স্বায়ত্তশাসন বলিতে চাহি না। আমাদের দেশে আপনার কায আপনি করিয়া লইবার যে পুরাতন প্রথা ছিল, আমি সেই পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়াই এই কার্য্য-প্রণালী স্থিরীকৃত করিয়াছি। আমি বিশ্বাস করি ও সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, আমাদের দেশের আপামর সাধারণের আপনার আবশ্যকীয়

কায আপনি করিয়া লইবার যে কৃতিত্ব বা ক্ষমতার আবশ্যক,তাহা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এই স্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের মধ্যে যাহাদের অশিক্ষিত বলিয়া এতাবৎ তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া আসিয়াছি, তাহাদের জীবনের মধ্যে একটা বড় সভ্যতা ও সাধনা আছে। আমাদের চাষারা যতই মূর্খ নিরক্ষর হউক না কেন, তাহারা আপনাদের ভাল-মন্দ বিচার করিতে সম্পূর্ণরূপে সক্ষম। আর যদি কোন বিশেষ শিক্ষার প্রয়োজন হয়, তাহার ব্যবস্থা ত এই কার্য্যপ্রণালীর মধ্যেই আছে।

আমি যে বলিলাম যে, আমাদের পূর্ব্ব পুরাতন প্রথা অবলম্বন করিয়া এই কার্য্য-প্রণালী নির্দ্ধারণ করিয়াছি। সেই কথাটি আরও একটু বুঝাইয়া বলি। আমাদের দেশে রাজার কর্ম্মক্ষেত্র অনেক প্রকারে সীমাবদ্ধ ছিল। রাজা কর লইতেন, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়া আইন বলিয়া দিতেন, কিন্তু আমাদের ঘরের কায আমরা নিজেরাই করিতাম, আমাদের জীবনযাপনের সকল উপায় আমরাই করিতাম।

আমি যে পল্লী বা গ্রাম্য-সমাজের কথা বলিয়াছি, তাহা আগেও ছিল। আমি যে নির্ব্বাচনের কথা বলিয়াছি, তাহা আগে হয় ত অব্যক্ত ছিল, আমি তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই। আগে আমাদের জীবন আরও অনেক বেশী সবল ছিল, যে পঞ্চায়েতের কথা আমি বলিয়াছি, তাহা পুরাকালে গ্রাম্য-সমাজের মধ্যে যেন আপনা-আপনিই ফুটিয়া উঠিত। পল্লী-সমাজের যে পঞ্চায়েত, তাহা এমন পাঁচজনেই হইতেন, যাঁহাদের উপর পল্লীসমাজের দৃষ্টি সহজভাবেই আপনা-আপনিই পড়িত। পল্লীবাসীদের মধ্যে যে প্রীতি জাগরিত ছিল, তাহা কোন কথা না বলিয়া, কোন আড়ম্বর না করিয়া যেন নিঃশব্দে অলক্ষিতে সেই পাঁচজনকে দেখাইয়া দিত। সেই পাঁচজন, পঞ্চায়েতের অধিকার, স্বভাবগুণে সহজভাবে আকর্ষণ করিতেন ও পল্লী-সমাজবাসীরা সেই একই স্বভাবগুণে, সেই একই প্রকার সহজ সরলভাবে সেই অধিকার মানিয়া লইত। আমি যে সব কার্য্যের কথা বলিয়াছি, বিনা নির্ব্বাচনে নির্ব্বাচিত সেই পঞ্চায়েত সেই সব কার্য্যই করিত। জমিদারের কাছে আবেদন করিয়া পুকুর কাটাইয়া সংস্কার করিয়া লইত। সহজভাবে শিক্ষা-দীক্ষা বিস্তার করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিত, পল্লীসমাজভুক্ত গ্রাম সকলের স্বাস্থ্যরক্ষার কার্য্য মিষ্ট কথা বলিয়া গায়ে হাত বুলাইয়া করাইয়া লইত। পল্লী-সমাজের কোন চেষ্টা, কোন কার্য্য তাহাদের অমতে, কি তাহাদের সাহায্য না লইয়া হইতে পারিত না।

এই যে অব্যক্ত নির্ব্বাচন, ইহাও গ্রামবাসীদের বাক্যহীন মতের উপরই নির্ভর করিত। আমরা এখনও কথায় কথায় বলি, 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল', এই কথার তাৎপর্য্য কি? অর্থাৎ পল্লীসমাজ যাহাকে না মানিবে, সে মোড়ল হইতে পারিবে না। এই যে তখনকার 'মানা' ও এখনকার আমার প্রস্তাবিত 'নির্ব্বাচন', এই দুইয়ের

মধ্যে কোন স্বাভাবিক পার্থক্য বা বিরোধ আছে কি ? আমি তাই বলিতেছিলাম, এই যে অব্যক্ত নির্ব্বাচন আমাদের দেশে চিরকাল চলিয়া আসিয়াছিল, আমি আজ তাহাকে ব্যক্ত করিয়া তুলিতে চাই। ইহা একেবারেই বিদেশী নয়, সম্পূর্ণভাবে স্বদেশী। ইহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত নিজস্ব সামগ্রী।

তবে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, যাহা অব্যক্ত ছিল, তাহাকে ব্যক্ত করিতে চাই কেন ?—যে পল্লীসমাজ ছিল, তাহাকে ছাড়িয়া জেলাসমাজ করিতে চাই কেন ?—এ প্রশ্নের উত্তর অতি সহজ। আমাদের জীবন যে পরিমাণে সহজ সরল ছিল, সে পরিমাণে আর সহজ সরল নাই। অনেকটা জটিল হইয়া পড়িয়াছে। গ্রামের সঙ্গে জেলার একটা স্বাভাবিক যোগ হইয়াছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে নানাপ্রকার কার্য্যকর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া গ্রামের লোক অনেকে জেলার সবডিবিসনে, সহরে ও রাজধানীতে আসিয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই জন্যই পুরাকালে যেখানে পল্লীসমাজই জীবনের কেন্দ্র ছিল, এখন জেলার রাজধানী সেই কেন্দ্রস্থান অধিকার করিয়াছে। তাই সমস্ত জেলাকে একটা বড় পল্লীসমাজ জ্ঞান করিয়া, সমস্ত পল্লীসমাজগুলি এই কেন্দ্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। অনেকে হয় ত বলিবেন যে, আমাদের রাজপুরুষেরা আমাদের হস্তে এত ক্ষমতা দিবেন কেন ?—একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, আমি ত বেশী ক্ষমতার দাবী করি নাই; আমাদের নিজের ঘরের কায যদি না করিতে পারি, তবে আমরা কোন্ কাযে লাগিব ? যদি তাঁহারা বলেন, আমরা এ কার্য্যের উপযুক্ত নই—তবে আমার উত্তর এই যে, তোমাদের অধীনে দেড়শ' বছর থাকিয়া, আমাদের এ ক্ষমতা যদি না জাগিয়া থাকে, তবে কি কোন কালে এই ক্ষমতা জাগিবার কোন সম্ভাবনা আছে ? আমি ত কোন নূতন ক্ষমতার কথা বলিতেছি না, যে ক্ষমতা আমাদের চিরকাল ছিল, তাহাকে একটু বাড়াইয়া, আমাদের বর্ত্তমান অবস্থার অনুযায়ী করিয়া, সেই ক্ষমতাই আমি বাঙ্গলার মহাসভায় দাবী করিতেছি। ইহা ন্যায্য, ইহা ধর্ম্মসঙ্গত। কোন্ মুখে এখন তোমরা বলিবে যে, আমরা এই ক্ষমতা ব্যবহার করিবার নিতান্ত অনুপযুক্ত ? আমি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক-সভার পরিবর্ত্তন বা পরিসর এই ক্ষেত্রে চাহিতেছি না। সে দাবী যখন করিতে হইবে, তখন করিব। আমি সমস্ত বঙ্গের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতেছি না। বঙ্গের ব্যবস্থাপক-সভা ও কার্য্যনির্ব্বাহক-সভা তোমরা এখন যে রকমে চালাইতেছ,: সেই রকমেই চালাও। আমি আজ সে সম্বন্ধে কোন কথাই বলিতে চাই না, আমি শুধু এই চাহিতেছি, যাহা আমাদের নিতান্ত ঘরকন্নার কায, সে কায করিবার অধিকার না দিলে আর চলে না। তোমাদের মুখেই শুনি যে, আমাদের ক্রমবিকাশের উপায় তোমরা করিয়া দিবে।

সে কথা যদি সত্য হয়, আজ তাহার প্রমাণ দাও। আমরা Zuluও নয়, Hottentotও নয়, আমরা সভ্য জাতি। যে কায আমরা চিরকাল আপনা-আপনি করিয়া আসিয়াছি, আজ তাহা একটু বাড়াইয়া করিতে পারিব না কেন?

আমার বিশ্বাস হয় না যে, আমাদের যিনি রাজা, এই ক্ষমতাটুকু আমাদের হস্তে দিতে তাঁহার কোন আপত্তি আছে বা হইতে পারে। তিনি আমাদের দেশে আসিয়া যে আশার বাণী বলিয়াছিলেন, তাহাতেই আমরা আশান্বিত হইয়া আছি। আমাদের এই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন না করিলে, আমাদের যে সব দিকে সর্ব্বনাশ হইবে। তাহাই ভাবিয়া চিন্তিয়া, হিসাব করিয়া আমরা আজ এই দাবী করিতেছি। আমি কিছুতেই বিশ্বাস করি না যে, বিলাতের পার্লামেণ্টের মহাসভায় ইহাতে কোন আপত্তি হইবে বা হইতে পারে। রাজার আপত্তি নাই, পার্লামেণ্টের আপত্তি হইবে না, কিন্তু এ দেশে যাঁহারা আমাদের রাজার গোমস্তা, যাঁহারা এ দেশের রাজকার্য্য পরিচালনা করেন, তাঁহাদের আপত্তি হইতে পারে। যেটুকু ক্ষমতা আমরা চাহিতেছি, সেটুকু ক্ষমতা এখন যে তাঁহাদের হাতে। মানুষের স্বভাবই এই যে, নিজের ক্ষমতা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। কি আপত্তি তাঁহারা তুলিবেন, আমি ঠিক বলিতে পারি না, কিন্তু সব বিষয়েই ওজর-আপত্তি তোলা সহজ, এবং তর্কে সেই ওজর-আপত্তির প্রতিষ্ঠা করা আরও সহজ। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, এ দেশে এমন কোন ইংরাজ কি আছেন, যিনি বুকে হাত রাখিয়া বলিতে পারিবেন যে, আমরা বাস্তবিকই এইটুকু ক্ষমতারও অধিকারী নহি?

তাঁহারা হয় ত বলিতে পারেন—আমি দুই একখানা ইংরাজী কাগজে এই মর্ম্মের কথা পড়িয়াছি, যে দেশে এনার্কিষ্ট অত্যাচারের এত প্রাদুর্ভাব, সে দেশে জনসাধারণের হাতে এই ক্ষমতা দিলে তাহার অপব্যবহার হইবে। এই কথা শুধু বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে প্রথমে সত্য বা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলেই বুঝা যায় যে, এই কথার বাস্তবিক কোন অর্থ নাই। প্রথমেই আমাকে বলিতে হয় যে, যাহাদের এনার্কিষ্ট বল, তাহারা বস্তুত পক্ষে এনার্কিষ্ট নহে। তাহারা রাজবিদ্রোহী, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। তাহারা আইনের কাছে অপরাধী, সুতরাং দেশের রাজশক্তিকে অটুট অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে ইহাদের শাসন ও দণ্ড অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই শাসনের সঙ্গে সঙ্গে কি কারণে এই যুবকবৃন্দ রাজবিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে, তাহা অনুসন্ধান করিয়া না দেখিলে এই শাসন সম্পূর্ণরূপে সার্থক হইবে না। আমি যত দূর বুঝিতে পারি, আমার বিশ্বাস হয় যে, আমাদের দেশে এমন কোন এনার্কিষ্ট নাই, যে সত্য সত্যই ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট উঠাইয়া দিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন

বিদেশী গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত করিতে চাহে। তবে তাহারা কেন রাজ-বিদ্রোহী হইল? এই প্রশ্নের উত্তর কি ইহাই নহে যে, স্বদেশী আন্দোলনের পরে আমাদের দেশের যুবকবৃন্দের মনে ও প্রাণে দেশের জন্ম কাযে লাগিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে? অর্দ্ধোদয়-যোগের সময় কলিকাতা সহরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে তাহারা যথার্থ কার্য্য করিবার যে ক্ষমতার প্রমাণ দিয়াছে, তাহা আমাদের রাজকর্ম্মচারীরা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন। সেই দিন যখন দামোদরের বন্যায় অনেক গ্রাম, অনেক সহর ভাসিয়া গিয়াছিল, আমাদের দেশের যুবকবৃন্দ দলবদ্ধ হইয়া সেই সব বন্যাপীড়িত নিরাশ্রয় গ্রামবাসীদিগের যে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাতে কি তাহাদের দেশের জন্য কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই? এই যে একটা প্রবল কার্য্য করিবার আকাঙ্ক্ষা ও কার্য্য করিবার ক্ষমতা, ইহা স্থায়িভাবে দেশের কোন্ কাযে লাগিতেছে? আমার মনে হয়, এই কায করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও কাযে লাগিতে না পারায় দেশের যুবকদিগের মধ্যে একটা অসহিষ্ণুতার ভাব—একটা নৈরাশ্যের বেদনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই রাজদ্রোহিতা সেই অসহিষ্ণুতা ও সেই নৈরাশ্যেরই ফল! আমি আগেই বলিয়াছি যে, ইহাদের শাসন আবশ্য কর্ত্তব্য। অপরাধীর দণ্ড না হইলে রাজত্ব রক্ষা করা অসম্ভব। কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই অপরাধের যে মূলীভূত কারণ, তাহাও দূর করিতে হইবে। তাহাদের মনের এই যে বিশ্বাস যে, রাজকর্ম্মচারীরা তাহাদের স্থায়িভাবে দেশের কল্যাণের জন্য কোন কার্য্য করিবার সুযোগ দিবেন না, সেই বিশ্বাস একেবারে দূর করিতে না পারিলে এই যে রাজদ্রোহের সূচনা, তাহাকে নির্ম্মূল করা যাইবে না। তাহাদের গালাগালি দেওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু গালাগালি দিলে ও দণ্ড দিলেই ত ব্যাধির আরোগ্য হয় না।

যদি স্বীকার করিয়া লই যে, আরও কঠিন শাসন না হইলে এই ব্যাধির শান্তি হইবে না, তবে যাহারা এই ব্যাধিগ্রস্ত, তাহাদেরই শাসন কর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দেশের জনসাধারণকে দেশের কাযে লাগাইয়া এই ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা কর। দেশে রাজদ্রোহের সূচনা হইয়াছে বলিয়া দেশের লোককে দেশের কায করিতে না দিলে, সেই রাজদ্রোহেরই পথ প্রশস্ত হইবে। তাহাতে তোমাদেরও অমঙ্গল, আমাদেরও অমঙ্গল। কিন্তু তোমাদের যতটা ক্ষতি না হউক, আমাদের একেবারে সর্ব্বনাশ—এই নবজাগ্রত বাঙ্গালীজাতির যে জীবন, তাহা একেবারে ধ্বংস হইয়া যাইবে। আজি এই সমগ্র বাঙ্গলার মহাসভার সভাপতিস্বরূপ আমি যুক্তকরে তোমাদের নিকট এই নিবেদন করিতেছি যে, আমার কথায় বিশ্বাস না হইলে আমাদের দেশের গণ্যমান্য লোক—যাঁহাদের উপর দেশবাসীদের শ্রদ্ধা-

ভক্তি আছে, এমন কয়েকজনকে লইয়া একটা ছোট কমিটী করিয়া দেও। তাঁহারা দেশের এই রাজদ্রোহ-সূচনার যে যথার্থ কারণ, তাহা অনুসন্ধান করুন এবং এই রাজদ্রোহিতা দূর করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা নির্দ্ধারণ করুন। আমার বিশ্বাস হয় না যে, কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী এমন কেহ আছেন—যিনি একটু তলাইয়া অনুসন্ধান করিলে আমার মত খণ্ডন করিতে পারিবেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটা কথা উঠিতে পারে। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, এই রাজদ্রোহিতার সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের অনেক লোকেরই সহানুভূতি আছে। এ কথাও তাঁহাদের বুঝিবার ভুল। এই রাজদ্রোহী যুবকদের দুইটা দিক্ আছে। আমাদের এই নবজাগ্রত জাতীয় জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য ও দেশের কার্য্য নিজের হাতে করিবার জন্য তাহাদের যে একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা, সেই তাহাদের একটা দিক্। আমাদের বাঙ্গলার জনসাধারণের সেই দিক্ দিয়া ও সেই কারণে তাহাদের সহিত সহানুভূতি আছে। আবার, দেশের কাযে লাগিতে পারিতেছে না বলিয়া পথভ্রান্ত হইয়া যে কার্য্যে তাহারা নিযুক্ত হইতেছে এবং শত প্রকারে রাজার কাছে এবং দেশের কাছে যে সব অপরাধে তাহারা অপরাধী হইতেছে, সেই দিক্ দিয়া তাহাদের সঙ্গে বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণের কোন সহানুভূতি নাই। আমাদের রাজপুরুষদের এই ভুল বুঝিবার যে কারণ নাই, আমি এমন কথা বলিতে পারি না। বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহা মনে হইতে পারে,—একটু অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিলে ইহা আরও বেশী মনে হইতে পারে যে, এই সব রাজদ্রোহী যুবকদের সঙ্গে সমস্ত বাঙ্গলা দেশের একটা যোগ আছে, আমাদের দেশের জনসাধারণের তাহাদের সঙ্গে একটা সহানুভূতি আছে। কিন্তু একটু ধৈর্য্য ধরিয়া তলাইয়া দেখিলেই ভুল ধরা পড়িবে। এই ভুল বিশ্বাসের কারণ কি? ইহার বাস্তবিক কারণ কি ইহা নহে যে, আমাদের দেশের লোকই বিশ্বাস করেন যে, এই সব যুবকদিগের প্রাণ আছে, দেশের প্রতি একটা প্রাণস্পর্শী মমতা আছে এবং দেশের কায করিবার যথেষ্ট ক্ষমতা আছে? এবং সেই কারণেই তাঁহারা মনে করেন যে, তাহাদের একেবারে ধ্বংস না করিয়া, তাহাদের মুখ ফিরাইয়া, মতি-গতি বদলাইয়া যথার্থ দেশের কাযে লাগাইয়া দেওয়া উচিত। আমি যাহা বলিলাম, হয় ত আমাদের অনেকেই তাহা সাহস করিয়া স্বীকার করিবেন না। কিন্তু অযথা তর্ক না করিয়া যদি সত্য কথা বলিতে হয়, তবে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। যাহারা রাজদ্রোহী, তাহাদের মতি-গতি ফিরাইয়া তাহাদের যে দেশবাৎসল্য, তাহা দেশের কাযে লাগাইয়া

দিবার যে বাসনা, আকাঙ্ক্ষা, তাহা রাজদ্রোহিতার সঙ্গে সহানুভূতি নহে,' তাহা রাজদ্রোহকে কোন মতেই সমর্থন করে না, বরং তাহা যথার্থ রাজশক্তির সহায় এবং রাজদ্রোহের স্বভাববিরুদ্ধ। এই কথা তলাইয়া না বোঝাই আমাদের রাজপুরুষদিগের ভুল এবং এই সত্য কথা খুলিয়া বলিয়া আমাদের রাজপুরুষদের সাহায্য না করাই আমাদের ভুল। যাহা সত্য, তাহা স্বীকার করিবার সাহস যদি আমাদের না থাকে, তবে কেমন করিয়া আমরা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের যে ব্রত, তাহা উদ্‌যাপন করিব?

আর একটা তর্ক উঠিতে পারে, তাহারও বিচার আবশ্যক। আমাদের রাজপুরুষেরা ইহাও বলিতে পারেন যে, হিন্দু-মুসলমানে ভাব নাই, হিন্দুদের মধ্যে বর্ণে বর্ণে প্রীতি নাই, এই অবস্থায় সমস্ত হিন্দু ও হিন্দু-মুসলমানে একত্র হইয়া একযোগে কায করা অসম্ভব। হিন্দুদের মধ্যে বর্ণভেদজনিত যে বাদ-বিসংবাদ, তাহা একত্রে কার্য্য না করিতে পারিয়া আরও বাড়িয়া যাইতেছে। যে কায সকলের আবশ্যকীয় ও সকলের মঙ্গলপ্রদ, সেই কায একত্র করাই মিলনের প্রশস্ত উপায়। আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বাস্তবিক কোন অসদ্ভাব নাই। স্বদেশী আন্দোলনের পূর্ব্বে ত একেবারেই ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কয়েক জন স্বার্থপর ব্যক্তির প্ররোচনায় একটা অসদ্ভাব সৃষ্টি করিবার চেষ্টা হইয়াছিল মাত্র; সেই চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। গ্রামের ভিতর গিয়া অনুসন্ধান করিলেই আমার কথা যে সত্য, তাহা প্রমাণীকৃত হইবে। আমি দেখিয়াছি, মুসলমান ও হিন্দু চাষাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ আছে। দাদা, চাচা, মামু বলিয়া তাহারা পরস্পরকে সম্বন্ধসূত্রে বান্ধিয়া লইয়াছে। তাহারা একই রকম কায করে, একই ভাষায় কথা বলে এবং তাহাদের আচার-ব্যবহার অনেকটা একই রকম। নিজ নিজ বিশিষ্ট ধর্ম্মের একটা পার্থক্য আছে, কিন্তু সে পার্থক্য শুধু বাহিরের দিকে—তাহাদের জাতিগত যে ঐক্য, তাহার অন্তরায় হয় নাই। সুতরাং এই যে বর্ণগত ও ধর্ম্মগত পার্থক্য, তাহা আমাদের একত্র হইয়া কায করিবার কোন বাধা জন্মাইবে না। বরং একত্র হইয়া কায করিলেই বাহ্যিক পার্থক্য ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আন্তরিক মিলন আরও সত্য, আরও জীবন্ত হইয়া উঠিবে।

আর একটি আপত্তির কথা আমি শুনিয়াছি। সেটা এই। আমাদের রাজপুরুষদের মধ্যে অনেকে বলেন যে, যে কার্য্যপ্রণালীর কথা আমি বলিয়াছি, তাহাকে সম্পূর্ণরূপে ফলদায়ক করিতে হইলে প্রত্যেক কার্য্যের সঙ্গে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কি সবডিভিসনের হাকিমের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকা উচিত। সে কথা আমি সম্পূর্ণ অস্বীকার করি। হয় ত এই সব রাজকর্ম্মচারীদের আমাদের দেশের কাযের সঙ্গে যোগ থাকিলে,

এই কাযগুলা বর্ত্তমানে—শুধু বাহিরের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—আরও ভাল করিয়া সাধিত হইতে পারে। কিন্তু আমরা যে দাবী করিতেছি, তাহার মূল মর্ম্ম এই যে, আমরা চিরকাল নিজেদের কার্য্য নিজেরাই করিয়াছি এবং সেই একত্র কার্য্য করিবার যে স্বাভাবিক অভ্যাস, তাহা আবার জাগরিত করিতে চাই। এই সব ছোট-খাট কাযে তোমরা যদি আমাদের সঙ্গে আঠার মত লাগিয়া থাক, তবে আমাদের কোন কার্য্যেরই স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি হইবে না এবং নিজের কায নিজে করিবার যে মর্য্যাদা, তাহা হইতে আমরা চিরকালের জন্য বঞ্চিত হইব। কায একটু খারাপ হওয়াও ভাল, কিন্তু নিজের কায পরে করিয়া দিলে সব কাযই বিফল হইবে। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন নিজের উপায় নিজে করিবার, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইবার একটা গৌরব আছে এবং তাহাতে যেমন ব্যক্তির জীবনের পূর্ণ বিকাশ হয়, সেইরূপ জাতীয় জীবনেও নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াইয়া নিজের কার্য্য নিজে করিলে জাতীয় জীবনের স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ বিকাশ না হইলে তাহার সার্থকতা কোথায়? আমাদের মরণ-বাঁচন, শুভাশুভ, আমাদের নব-জাগ্রত জাতির যে জীবন এই কার্য্যপ্রণালীর উপর নির্ভর করিতেছে। আমাদের যে দাবী, তাহা ন্যায়ের উপর; আমাদের ধর্ম্ম তোমাদের ধর্ম্ম, সকলের ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরাই বারে বারে বলিয়াছ যে, আমাদের জাতীয় জীবনকে পুষ্ট করাই তোমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের জাতীয় জীবন পুষ্ট করিবার যে এই একমাত্র উপায়, সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আজি এই সামান্য দাবী পূরণ করিবার সময় আসিয়াছে। এখন যদি তোমরা আমাদের এই দাবী পূরণ না কর, তবে তোমাদের মুখের কথার উপর আর আস্থা রাখিব কি করিয়া? আর তোমাদের কথার উপর যদি আমরা বিশ্বাসস্থাপন করিতেই না পারি, তবে আমরা বাঁচিয়া কি করিব?

এই যে আপনার কায আপনি করিবার অধিকার, তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও দুই একটি বড় বড় কথার আলোচনা করা আবশ্যক। আমরা যে শুধু আমাদের ঘরকন্নার কায করিতে চাই, তাহা নহে। সমস্ত দেশরক্ষার যে ভার, তাহারও অংশ লইতে চাহি। বোম্বাই-কংগ্রেসে সার সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ আমাদের সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করিবার সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই কথা আমাদের দেশের সকলেরই মর্ম্মের কথা। আমাদের চোখ ফুটিয়াছে। তোমরাই চোখ ফুটাইবার সাহায্য করিয়াছ। এখন জগতের যে দিকে চাই, দেখিতে পাই, সকল দেশেই দেশবাসীরা অস্ত্রধারণ করিয়া দেশ-রক্ষা করিতে প্রস্তুত। আমাদের অস্ত্রধারণ করিবার যে অধিকার নাই, ইহাতে কি আমরা মর্ম্মে-মর্ম্মে বেদনা অনুভব করি না? অস্ত্রধারণ করিবার অধিকার আমাদের না দিলে এই যে নবজাগ্রত দেশবাৎসল্য, ইহার কি অপমান করা হয় না? এই অধিকার

হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করার কি কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ থাকিতে পারে? সকল দেশেই অস্ত্রধারণ করিবার অধিকার আছে। আমাদের থাকিবে না কেন? অস্ত্রধারণ সম্বন্ধে আইন রাখিতে হয় রাখ, কিন্তু সেই আইন জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলের প্রতি সমভাবে চালাইয়া দিও। তাহা না হইলে আমরা নিজেদের অপমানিত মনে করিব। সেই অপমানের উপর কোন সত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে পারে না। মেক্‌লে যে আমাদিগকে অপমান করিয়া গিয়াছে, সে কথায় যে একদিন আমরাও বিশ্বাস করিয়াছিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আমরা করিয়াছি, এখনও করিতেছি। তোমরা যে একদিন ঐ কথা বলিতে দিয়াছিলে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক। বাঙ্গালী যে কাপুরুষ, সে ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের নাই, তোমাদেরও নাই। এম্বুলেন্স-কোর সম্বন্ধে বাঙ্গালী যে বীরত্ব দেখাইয়াছে, তাহা ভুলিয়া যাইও না। সে দিন যে বাঙ্গালীর ডবল কোম্পানীর সৃষ্টি করিবার মনস্থ করিয়া আমাদিগকে আহ্বান করিলে, ভাবিয়া দেখিও, সে দিন বাঙ্গালীকে কি কঠিন পরীক্ষার ভিতর ফেলিয়াছিলে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর হইতে যাহাদিগকে কোন দিন অস্ত্রধারণ করিতে দেও নাই, যাহাদিগকে কোন প্রকারে সমর-শিক্ষা দেওয়া উচিত বিবেচনা কর নাই, যাহাদের সৈনিকের কার্য্য করিবার অনুপযুক্ত মনে করিয়া সকল সামরিক চেষ্টা হইতে বহুদূরে রাখিয়াছিলে এবং যাহাদের মধ্যে এই অনুপযুক্ততা সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ একই কথা বলিয়া যে একটা ভূতের বিশ্বাস জাগাইয়া দিয়াছিলে, একদিন হঠাৎ সেই বাঙ্গালীকেই সমরক্ষেত্রে আহ্বান করিলে। যদি আমরা সেই আহ্বান শিরোধার্য্য করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিতে না পারিতাম, তবে কি চিরকাল তোমরা বলিতে না যে, বাঙ্গালী অনুপযুক্ত? তাহাদের অস্ত্র ধারণের কোন অধিকার নাই, তাহাদের জন্য সৈনিক-বিভাগে কোন স্থানই হইতে পারে না? আমরা ত তাহাই বুঝিলাম। অশেষ কষ্ট করিয়া, অশেষ যত্ন করিয়া ডবল কোম্পানী গড়িয়া দিলাম। এই যে কঠিন পরীক্ষার ভিতর আমাদিগকে ফেলিয়াছিলে, সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম। বাঙ্গালী প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিবার সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত ও অধিকারী। এখন অস্ত্র-ধারণের অধিকার আমরা দাবী করিতে পারি। এখন জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সম-অধিকারে আমরা সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতে পারি। এই সৈনিকবিভাগে দেশীয় ও বিদেশীয়-দের মধ্যে যে একটা পার্থক্যের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ, তাহা তুলিয়া দেওয়া সর্ব্বতো-ভাবে বাঞ্ছনীয়। ইংরাজ যে কমিশন পাইবে, বাঙ্গালী সে কমিসন পাইবে না কেন? লেফ্‌টানেন্ট, ক্যাপ্‌টেন, করনেল্‌ হইবার ক্ষমতা শুধু ইংরাজের থাকিবে কেন, আমরা চিরকালই জমাদার হাবিলদার থাকিব কেন? মনে রাখিও, যে লালপল্টনেরও সাহায্যে তোমরা একদিন বাঙ্গলার ও ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলে,

সে লালপল্টন বাঙ্গালী। যদি যোগ্যতার কথা বল, আমি ত যোগ্যতারই পরীক্ষা চাই। কিন্তু সেই পরীক্ষা সমভাবে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে করিতে হইবে। আমরা বিচারের প্রার্থী, পরীক্ষার প্রার্থী। আমরা অনুগ্রহের ভিখারী নহি।

এই যে সৈন্য-বিভাগে প্রবেশ করিবার আমাদের এত আগ্রহ কেন, তাহা যদি শুনিতে চাও, তবে খুলিয়া বলি। এই যে জাতিতে জাতিতে মহাসংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, এই সংঘর্ষের মধ্যে যে কে শত্রু,কে মিত্র,বুঝিয়া উঠা কঠিন। আজি যাহারা মিত্র, কালই তাহারা শত্রু হইয়া উঠিতে পারে। আমরা চক্ষের সম্মুখে দেখিতেছি, জাপান তাহার পণ্য-দ্রব্য দিয়া আমাদের দেশ ভরিয়া দিতেছে। দলে দলে জাপানী আসিয়া আমাদের সহরে বাস করিতেছে। এই যুদ্ধের ফলে তাহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিতেছে। কারও সর্ব্বনাশ, কারও পৌষমাস। এই যুদ্ধে অনেকের সর্ব্বনাশ হইলেও কিন্তু জাপানের পৌষমাস। এই ভীষণ সময়ে জাপান যে আমাদের মিত্র, তাহা ত একটা আকস্মিক ঘটনা মাত্র। জাপান ত জার্ম্মাণীর শিষ্য। কে বলিতে পারে যে, এই সমরানল নির্ব্বাপিত হইলে আবার জাতির সংঘর্ষে নূতন করিয়া সমরানল প্রজ্বলিত হইবে না? কে বলিতে পারে যে, সেই সময়ে জাপান আমাদের শত্রু হইবে না? আবার যদি সমরানল প্রজ্বলিত হয়, কে জানে, রুশিয়া কোন্ দিকে থাকিবে? আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি যে, বাঙ্গালী জাপানকে চায় না, জার্ম্মাণীকেও চায় না, রুশিয়াকেও চায় না। বাঙ্গালী তোমাদের সঙ্গে মিলিয়া তাহার দেশরক্ষার যে ভার, সেই বোঝার ভারের অংশ মাথায় তুলিয়া লইতে চায়। তাই বাঙ্গালী অস্ত্রধারণের অধিকার চায়,—তাই বাঙ্গালী সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করিবার দাবী করিতেছে। এই যে বাঙ্গালীর নবজাগ্রত আকাঙ্ক্ষা, ইহাকে তাচ্ছিল্য করিও না, এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না করিয়া ইহাকে অপমানিত করিও না।

বাঙ্গালীর এই আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধে আর একটা কথা বলি। কলিকাতাতে আজিকালি বাঙ্গালী বালকদের ভবিষ্যতে সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা হইতেছে, তাহাকে পোষণ করা আমাদের ও আমাদের রাজপুরুষদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। এই Boy Scout Movement আমাদের স্কুলে স্কুলে সহরে সহরে ছড়াইয়া দিতে হইবে। ইহাতে যে আমাদের বালকদিগকে ভবিষ্যতে সময়োপযোগী করিয়া তুলিবে, কষ্ট-সহিষ্ণু, শ্রম-সহিষ্ণু করিবে, দয়া-দাক্ষিণ্য ও পরোপকার-ব্রত শিক্ষা দিবে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রকৃত পক্ষে মানুষ করিয়া তুলিবে।

আমরা যে শুধু অধিকার চাহিতেছি, তাহা ত নহে। সেই অধিকারের জন্য যে স্বার্থ-ত্যাগ আবশ্যক, আমরা ত তাহাতে কুণ্ঠিত নহি। বাঙ্গালীকে সমর-শিক্ষা দিবার জন্য এবং সৈনিক-বিভাগে প্রবেশ করাইবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তাহা বাঙ্গালী দরিদ্র

হইলেও যোগাইতে প্রস্তুত। স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে আমরা কেমন করিয়া অধিকারের দাবী করিব?

এই যে প্রস্তাবিত সমর-ঋণ, ইহা কি আমাদের স্বার্থত্যাগের সত্য প্রমাণ নহে? যে যাহা পারে সংগ্রহ করিয়া আনিতেছে। যে যত পারে, আরও সংগ্রহ করিয়া আনিবে। তোমরা ভাবিয়া দেখিও যে, শুধু অর্থের হিসাবে ইহাতে বাঙ্গালীর যথেষ্ট ক্ষতি। যে টাকা উঠিতেছে, তাহার অধিকাংশই ইংলণ্ডে কিংবা অন্য অন্য দেশে ব্যয়িত হইবে। ইহার খুব অল্প অংশই এ দেশের জনসাধারণের হাতে ফিরিয়া আসিবে। এই টাকার যে সুদ, তাহা আমাদের রাজস্ব হইতেই দিতে হইবে। সুতরাং শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখিলে ইহাতে বাঙ্গালীর বিশেষ ক্ষতি। কিন্তু বাঙ্গালী ত কোন দিন কোন জিনিষ শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখে নাই এবং দেখাও ধর্ম্মসঙ্গত বিবেচনা করে না। শুধু অর্থের দিক্ দিয়া দেখিলে যে সব দিক্ দেখা হয় না। এই যে ইউরোপে ঘোর সমর চলিতেছে, ইহার সঙ্গে কি বাঙ্গালীর সুখদুঃখ জড়িত নাই? এই সমরে ইংলণ্ডের জয়লাভের উপর কি বাঙ্গালীর আশা-ভরসা নির্ভর করিতেছে না? এই সমর-ঋণে বাঙ্গালীর যাহা দেয়, তাহা যদি বাঙ্গালী সংগ্রহ করিয়া না দিতে পারে, তাহা হইলে আমরা কেমন করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিব? যেমন করিয়াই হউক, এই সমর-ঋণ প্রস্তাবকে সম্পূর্ণভাবে সার্থক করিতেই হইবে। ইহাতে যে স্বার্থত্যাগের আবশ্যক, তাহাই আমাদের জাতীয় জীবনের ভিত্তি।

শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, ইংরাজ আমাদের অনেক উপকার করিয়াছে এবং তাহার জন্য আমাদের চিরকালই কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকা উচিত। এ কথা অনেকবার বাঙ্গালীর কাছেও শুনিয়াছি, ইংরাজের কাছেও শুনিয়াছি। ইংরাজ আমাদের দেশে আসিয়া যে একটি বিপরীত সভ্যতা ও সাধনার আদর্শ আমাদের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দিয়াছে এবং সেই বাহিরের আঘাতেই যে আমাদের জাতীয় জীবনের নব-প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিয়াছে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি এবং চিরকাল স্বীকার করিব। এ দেশে ইংরাজের আগমন যে বিধির বিধান, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, এবং চিরদিনই করিব। ইংরাজের আগমন হইতে যে আমাদের দেশের অনেক মঙ্গল সাধিত হইতেছে ও হইবে, তাহা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি ও চিরকাল স্বীকার করিব। এই কারণে আমার যে স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা, তাহা আমার চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে। কিন্তু এই কৃতজ্ঞতার আর একটা দিক্ আছে, তাহা যেন ইংরাজ ভুলিয়া যায় না। এ দেশে আসিয়া রাজত্ব বিস্তার করিয়া কি ইংরাজের কোন লাভ হয় নাই? জগতের ইতিহাসে বাঙ্গলা দেশে আসিবার আগে ইংরাজের যে স্থান ছিল, এখনও কি ঠিক সেই স্থান? এই দেশের ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে

সঙ্গে কি ইংরাজের অবস্থার শত সহস্র গুণ উন্নতি হয় নাই? সমগ্র মানবসমাজে ইংরাজ যে আজ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহাতে কি বাঙ্গলার, সমস্ত ভারতবর্ষের কোন হাতই ছিল না? এই যে কৃতজ্ঞতা, ইহা কি শুধু আমাদেরই? ইংরাজের কৃতজ্ঞ হইবার কি কোন কারণ নাই? সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হয় না কেন? এই যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলন, ইহাতে আমাদের ও তোমাদের পরস্পরের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। আমরা চিরকালই আমাদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া আসিতেছি ও কার্য্যক্ষেত্রে সহস্র প্রকারের সেবা দ্বারা তাহার প্রমাণ দিয়াছি। তোমাদের যে কৃতজ্ঞতা, তাহার প্রমাণ আজি চাই। শুধু মুখের কথায় আর আমরা ভুলিব না। আমাদের যে নিজের হাতে নিজের কাজ করিবার নিতান্ত ন্যায়সঙ্গত আকাঙ্ক্ষা, সে আকাঙ্ক্ষা যদি পূর্ণ না কর—এই সামান্য অধিকার যদি আমাদের না দাও, তবে তোমাদের কৃতজ্ঞতার কোন অর্থ নাই।

তাই আজ তোমাদের কাছে আমার প্রাণের নিবেদন জানাইতেছি। যে কার্য্য করিবার অধিকার চাহিতেছি, তোমরা প্রাণে প্রাণে জান, সেই অধিকার প্রাপ্ত হইবার জন্য আমরা সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত। মনকে চোখ-ঠার দিও না। ভাবের ঘরে চুরি করিও না। বৃথা তর্ক করিয়া সত্যকে ঢাকিবার চেষ্টা করিও না। আজি আমাদের জীবন-চাঞ্চল্যকে শান্ত কর। আমাদের এই নব-জাগ্রত জীবনকে সমস্ত প্রাণ দিয়া মর্ম্মে-মর্ম্মে পোষণ কর। ঐ যে ইউরোপের সমর-ক্ষেত্রে চিতার আগুন জ্বলিতেছে, ঐ শ্মশান-ভস্মের উপর মিলন-মন্দির স্থাপন কর! হাত বাড়াইয়া আমাদের হাত ধর! তোমাদের ও আমাদের মিলন সত্য যথার্থ হইয়া উঠুক! তোমরাও ধন্য হও, আমরাও ধন্য হই এবং এই মিলনের যে যথার্থ বাণী, তাহা আপনাকে সার্থক করুক।

আমার স্বদেশবাসীদের নিকট আমার প্রাণের নিবেদন এই যে, বাঙ্গলার কথা যেন অচিরে বাঙ্গালীর কার্য্যে পরিণত হয়। সমবেত চেষ্টা চাই, সকলের উদ্যম চাই, বাঙ্গালীর স্বার্থত্যাগ চাই। এই যে জীবন-যজ্ঞ, ইহা শুদ্ধ-চিত্তে পবিত্র-প্রাণে আরম্ভ করিতে হইবে। সকল বিদ্বেষ, সকল স্বার্থ ইহাতে আহুতি দিতে হইবে। ইহাতে বর্ণধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকলকে আহ্বান করিতে হইবে। কর্ম্মক্ষেত্রে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন। অসহিষ্ণু হইলে চলিবে না, নিরাশ হইলে চলিবে না। যে অধিকার আজি আমরা দাবী করিতেছি, তাহা যুক্তি-সঙ্গত, ন্যায়-সঙ্গত, আমাদের স্বভাবধর্ম্ম-সঙ্গত, মানুষের স্বাভাবিক অধিকার-সঙ্গত, আমাদের ধর্ম্ম-সঙ্গত, জগতের ধর্ম্ম-সঙ্গত। এই অধিকার হইতে আমাদের কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না। একবার এস, আমরা সকলে সমস্বরে বলি—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, আমরা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টিয়ান সমস্বরে বলি—"চাই এই

অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।" একবার এস, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, শূদ্র, চণ্ডাল, সব একত্র হইয়া সমস্বরে বলি,—"চাই এই অধিকার আমাদের, যাহা আমাদের, তাহা চাই।"—সকল প্রজা যখন এক হইয়া আন্তরিক মিলনে মিলিত হইয়া বলে 'চাই', জগতে এমন কোন রাজশক্তি নাই—যাহা সেই সমবেত আকাঙ্ক্ষার অপ্রতিহত বেগ রোধ করিতে পারে! এস ভাই খৃষ্টিয়ান, খৃষ্টের নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই মুসলমান, তুমি আল্লার নামে প্রাণে প্রাণে বল 'চাই!' এস ভাই হিন্দু, তুমি নারায়ণের নামে প্রাণকে সাক্ষী রাখিয়া বল 'চাই!' ঐ যে মা ডাকিতেছে! এস এস, সবাই এস! সম্মুখে বিস্তৃত কার্য্য, এস এস, সবাই এস! বল ঈশ্বর! বল আল্লা', বল নারায়ণ, বল বন্দে মাতরম্।

তিনুর মা

(১)

স্বামী হৃদয় মাজি সাত দিনের জ্বরে বিনা চিকিৎসায় বিনা পথ্যে যখন স্ত্রীপুত্রের মায়া কাটাইয়া লোকান্তরের যাত্রী হইল, তখন ভগী তিন বছরের ছেলে তিনুর হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইল। একমাত্র ভগবান্ ছাড়া তাহাদের দেখিবার লোক কেহ রহিল না।

হৃদয় মাজি দিন-মজুরী করিয়া দিন কাটাইত; রোজ আনিত, রোজ খাইত। যে দিন মজুরী না জুটিত, সে দিন ধার করিত, ধার না মিলিলে উপবাস দিত। সম্পত্তির মধ্যে ছিল জমার জমীর উপর একখানি কুঁড়ে, আর তাহার পিছনে পানাভরা একটি ছোট ডোবা। ডোবার পাড়ে একটি তেঁতুলগাছ ছিল, কিন্তু তাহার ফলভোগ ছাড়া, গাছ বেচিবার বা ডাল কাটিবার অধিকার ছিল না। সুতরাং হৃদয়ের মৃত্যুতে স্ত্রী ভগী নিরুপায় ও নিঃসম্বল হইয়া শুধু ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল, কিন্তু ভগবান্ তাহার ডাক শুনিতে পাইলেন কি না, ভগী তাহা জানিতে পারিল না।

ভগীর তখনও বয়স যায় নাই, সুতরাং পাড়ার কেহ কেহ উপদেশ দিল, "ভগী, তুই সাঙ্গা ক'রে ফেল্।" কেহ বা বলিল, "যখন একটা ছেলে আছে, তখন আর কেন? ছেলেটাকে মানুষ কর্, তোর কষ্ট দূর হবে।" ভগী উভয় পক্ষের পরামর্শেই সায় দিল, কিন্তু কি করিবে, তাহা ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না। ছেলেটাকে মানুষ করিলে কষ্ট দূর হইবার সম্ভাবনা আছে বটে, কিন্তু আপাততঃ ছেলেকে বাঁচাইবার উপায় কি? দুই বেলা তাহার মুখে কি দিবে? সাঙ্গা করিলে হয় তো ইহার একটা উপায় হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে যদি ছেলের কষ্ট হয়, অযত্ন হয়? ভগী ব্যাকুলভাবে তিনুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিত।

এ দিকে যাহারা সাঙ্গার উমেদার ছিল, তাহারা ভগীর নিকট কোনরূপ সন্তোষজনক উত্তর না পাইয়া একে একে সরিয়া পড়িল। ভগী আপনার জীবিকার্জ্জনের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইল।

ভগী সকালে উঠিয়া বামুনপাড়ায় ধান ভানিতে যাইত। ছেলেকে ঢেঁকিশালায় বসাইয়া ধান ভানিত। ক্ষুধা হইলে ছেলে কাঁদিত। যাহাদের ধান ভানিত, তাহারা দয়া করিয়া একমুঠা মুড়ি দিলে ছেলেকে তাহাই খাওয়াইয়া শান্ত করিত।

মধ্যাহ্নে পারিশ্রমিক চাউল লইয়া ঘরে আসিত এবং সে চাউলের কিয়দংশ খোরাকির জন্য রাখিয়া অবশিষ্টাংশ দোকানে দিয়া নুণ-তেল আনিত। তাহার পর স্নান করিতে গিয়া পুকুর হইতে শুষণী-কলমী শাক, গেঁড়ী, শামুক তুলিয়া আনিয়া তরকারির যোগাড় করিত। যে দিন চাউল কম পাইত, সে দিন ভাতে বেশী জল ঢালিয়া ফেন খাইয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিত।

এইরূপে আহারকার্য্য শেষ করিয়া অপরাহ্নে আবার ধান ভানিতে যাইত। যে চাউল পাইত, তাহাতে রাত্রির আহার চলিত।

অসুখ-বিসুখে ধান ভানিতে না পারিলে নিজে উপবাস দিত, আর কাহারও বাড়ী হইতে একমুঠা ভাত বা ফেন মাগিয়া আনিয়া ছেলেকে খাওয়াইত।

বর্ষায় ঘরের চালের পুরাতন তালপাতা পচিয়া ঘরে জল পড়িতে লাগিল। ভগী লোকের পায়ে হাতে ধরিয়া তালপাতার যোগাড় করিল, কিন্তু বারুয়ের অনেক খোসামোদ করিয়া ঘর সারাইল। ভগী কিনুকে কিঞ্চিৎ পারিশ্রমিক দিতে গেল, কিন্তু কেনারাম তাহা লইল না। সেও ভগীর পাণিপ্রার্থীর একজন উমেদার ছিল। কিন্তু ভগীর নিকট কোন আশ্বাস না পাওয়ায় আপাততঃ বিধবার পাণিগ্রহণের আশা ত্যাগ করিয়া ঘর সারিবার কাজে মনোনিবেশ করিয়াছিল। প্রণয়লাভে হতাশ হইলেও কেনারাম ভগীর নিকট পয়সা লওয়া সঙ্গত বিবেচনা করিল না।

(২)

জীবিকার উপায় একরকম হইয়াছিল বটে, কিন্তু ছেলে লইয়া ভগী মহাবিপদে পড়িল। তাহার শত উপদেশেও সে চার বৎসরের ছেলেটা কিছুতেই বুঝিল না যে, সে অস্পৃশ্য চাঁড়ালের ছেলে, শুচিত্বপূর্ণ ব্রাহ্মণগৃহে তাহাকে কত সাবধানে থাকিতে হইবে। সে ঘরে-দোরে বসিলে সে স্থানে গোময়স্পৃষ্ট জলের ছড়া দিতে হইবে, তাহাকে ছুঁইলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে, তাহার উচ্ছিষ্টস্পর্শে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

ভগী ছেলেকে ঢেঁকিশালায় বসাইয়া রাখিয়া ধান ভানিত। চঞ্চল ছেলে কিন্তু সারাদিন এক জায়গায় বসিয়া থাকিতে পারিত না, মা একটু অন্যমনস্ক হইলেই ছেলে উঠিয়া পলাইত। সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর মেয়েদের চীৎকারে ভগী ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িত। "ঐ কাপড়টা ছুঁয়ে দিলে, এই মাথা খেলে গো, মেয়েটাকে ছুঁয়ে ফেলেছে, যা যা, গা ধুয়ে এসে মাথায় গঙ্গাজল দে, ও মা, কল্লে কি গো! গায়ের কাছ দিয়ে ছুটে গেল, এই অবেলায় আবার নেয়ে মরতে হবে? ভালা সর্ব্বনেশে ছেলে বাপু! না ভগী, এমন করলে তোর ধানভানা চলবে না।"

ভগী আস্তেব্যস্তে ঢেঁকি হইতে নামিয়া ছেলেকে ধরিয়া আনিত। বাড়ীর গৃহিণী

তিরস্কার করিয়া বলিতেন, "তুই ছেলেটাকে আঁচলে বেঁধে আনিস্ কেন বল্ তো, ঘরে রেখে আস্তে পারিস্ না?"

ভগী সবিনয়ে উত্তর করিত, "ঘরে কে আছে মাঠাকরুণ, কার কাছে রেখে আস্ব?"

গৃ। নাই বা কেউ রইল, ঘরে থাক্বে, পাড়ায় খেলে বেড়াবে।

ভগী। ভয় হয় মা, পাছে জলে-থলে প'ড়ে যায়।

গৃহিণী চোখ কপালে তুলিয়া বলিতেন, "হাঁ, জলে ডুবে ম'লো আর কি? জলে ডুব্বারই ছেলেটা কি না। আমাদের বামুন-কায়েতের ঘরের ছেলে না কি?"

বামুন-কায়েতের ছেলে ছাড়া অপর-জাতির ছেলে যে জলে ডুবিয়া মরিতে পারে না, এ বিশ্বাস ভগীর ছিল না, সুতরাং সে ছেলেকে ছাড়িয়া যাইতে পারিত না। তবে বাড়ীর গৃহিণীদের তিরস্কার যখন নিতান্ত অসহ্য হইত, তখন সে দড়ি দিয়া ছেলেকে বাঁধিয়া রাখিত। ছেলে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিত, ভগী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া ধান ভানিতে থাকিত।

এই ছোঁয়াছুঁয়ি ছাড়া আরও একটা গোলযোগ ছিল। বামুনদের ছেলেরা খাবার লইয়া খাইত, তিনু তাহা দেখিয়া খাবারের জন্য বায়না ধরিত। ভগী নানা কথায় ছেলেকে শান্ত করিবার প্রয়াস পাইত, নির্ব্বোধ ছেলে কিন্তু শান্ত হইত না, বায়না ছাড়িয়া কান্না ধরিত। বাড়ীর মেয়েরা তিনুর উদ্দেশে কতকগুলা বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিয়া শেষে ডাইন-চোখো হতভাগা ছেলেটার সম্মুখ হইতে সরিয়া যাইবার জন্য আপনাদের ছেলেদিগকে উপদেশ দিত। ছেলেরা কিন্তু সে উপদেশ পালন করিত না, মেয়েরাও তাহাদের অজীর্ণরোগের আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া পড়িত। এ দিকে মেয়েদের বাক্যবাণ, তাহার উপর ছেলের কান্না, ভগী আর সহ্য করিতে পারিত না, ছেলের মুখে পিঠে চড়চাপড় বসাইয়া দিত। ছেলে প্রহারের জ্বালায় আরও হাত-পা আছড়াইয়া আরও জোরে জোরে চীৎকার করিতে থাকিত। তাহার সেই শূকরশাবকবৎ উচ্চ-চীৎকারে বাড়ীর লোকেরা ব্যস্তিব্যস্ত হইয়া উঠিত; তাহারা ভগীকে তিরস্কার করিয়া, তিনুকে গালি দিয়া আপনাদের কর্ণজ্বালার প্রতিশোধ লইত। ভগী চুপ করিয়া সব শুনিত, শুনিতে শুনিতে তাহার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইত। কিন্তু তাহার কাঁদিবারও যো ছিল না। তাহার চোখে জল দেখিলেই বাড়ীর মেয়েরা বাড়ীর অমঙ্গল আশঙ্কায় অস্থির হইয়া উঠিত এবং সে যদি এরূপ সকালে সন্ধ্যায় চোখের জল ফেলে, তবে সে যেন বাড়ীতে না আসে, এরূপ নিষেধাজ্ঞাও প্রচার করিত।

ভগী চোখের জল চোখে চাপিয়া অনেক অনুনয়-বিনয় দ্বারা সে নিষেধ-আজ্ঞার প্রত্যাহার করাইত। ইহা ছাড়া যে তাহার অন্য উপায় ছিল না।

এইরূপে ভগী ছেলেকে মানুষ করিতে লাগিল। কেনারাম মাঝে মাঝে

আসিয়া সাঙ্গা করিবার জন্য উপদেশ দিতে লাগিল, ভগী কিন্তু সে উপদেশে কর্ণপাত করিল না।

সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া এবং গালাগালি ও তিরস্কার শুনিয়া ভগী রাত্রিতে যখন আপনার ভাঙ্গা কুঁড়েটুকুর ভিতর ছেলেকে বুকে লইয়া শুইত, তখন যেন মুহূর্ত্তে তাহার সকল বেদনা, সকল কষ্ট মুছিয়া যাইত, সে যেন উপর হইতে কাহার আশীষপূর্ণ ধন্যবাদ শুনিতে পাইত।

(৩)

"ভগী!"

"কেনে গা বাবাঠাকুর?"

"তিনে কোথায়?"

"তার জর হ'য়েছে, কেঁথা মুড়ি দিয়ে প'ড়ে আছে।"

"প'ড়ে থাক্‌লে হবে না, তাকে একবার উঠ্‌তে হবে।"

"কেনে?"

"তাকে একবার মুণ-হাটে যেতে হবে।"

ভগী ভীত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এই রাতে, জল-ঝড়ে?"

হাতের লাঠিটা মাটীতে ঠুকিয়া কেদার রায় বলিলেন, "জল-ঝড়, তা কি হ'য়েছে? আমার অমূল্যর অসুখ বেড়েছে, ওষুধ আন্‌তে হবে।"

ভগী বলিল, "কাল সকালে গেলে হবে না?"

মাথা নাড়িয়া রায় মহাশয় বলিলেন, "উঁহুঁ, ডাক্তার বল্‌ছে, রাত্রের মধ্যেই ওষুধ চাই।"

ভগী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রায় মহাশয় বলিলেন, "ডেকে দে ভগী, ওষুধ না পেলে অমূল্য বাঁচ্‌বে না।"

"বাঁচ্‌বে না?" ব্যগ্রকণ্ঠে ভগী বলিয়া উঠিল, "বাঁচ্‌বে না?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "হাঁ, ডাক্তার বল্‌ছে, এই রাত্রের মধ্যে ওষুধ না পেলে বাঁচান ভার হবে।"

ভগী। কিন্তু তিমুর যে জর বাবাঠাকুর!

রায়। ও সামান্য জর, কিছুই নয়, তুই ডেকে দে।

ভগী মুখ বাড়াইয়া আকাশপানে চাহিল; দেখিল, সমগ্র আকাশ কালো মেঘে ভরা, ঝম্ ঝম্ বৃষ্টি পড়িতেছে, ঘন ঘন বিদ্যুৎ হানিতেছে, পুবে বাতাস হু হু করিয়া ছুটিয়াছে।

রায় মহাশয় ডাকিলেন, "ভগী !"

ভগী বলিল, "তাই তো বাবাঠাকুর, এই ছুজ্জোগ।"

রায় মহাশয় অস্থির-কণ্ঠে বলিলেন, "দেরী করিস্ না ভগী, এক দণ্ডে রোগ কত বেড়ে যেতে পারে। আমি ব্রাহ্মণ, আজ এই রাত্রে তোর দুয়ারে এসেছি, আমার অমূল্যকে বাঁচা।"

রায় মহাশয়ের গলার স্বরটা ভারী হইয়া আসিল। ভগী ধীরে ধীরে গিয়া ঘরে ঢুকিল; মৃদু-কোমল-কণ্ঠে ডাকিল, "তিনু !"

"মা !"

"একবার উঠ্‌তে পার্‌বি বাপ ?"

"কেনে মা ?"

"রায় ঠাকুর এসেচে। ওনার ছেলের বড্ড ব্যামো, ওষুধ আন্‌তে মুণ-হাটে যেতে হবে।"

তিনু পাশ ফিরিয়া বলিল, "বুকটা বড্ড ভারী মা।"

ভগী বলিল, "কি কর্‌বি বাবা, বামুনের ছেলে বাঁচে না।"

তিনু ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল, বলিল, "বিষ্টি পড়্‌ছে না ?"

ভগী বলিল, "হাঁ, এই কাপড়টা গায়ে জড়িয়ে নে।"

ভগী একখানা ছেঁড়া কাপড় তিনুর হাতে দিল। তিনু সেখানা গায়ে জড়াইয়া উঠিল, এবং ঘরের কোণ হইতে লাঠিটা লইয়া ধীরে ধীরে বাহিরে আসিল। রায় মহাশয় বলিলেন, "আর তিনু, তোকে লণ্ঠন আর একটা ছাতা দেব।"

"আচ্ছা, চল" বলিয়া তিনু উঠানে নামিল। রায় মহাশয় অগ্রসর হইতে হইতে বলিলেন, "ভগী, আমার অমূল্য যদি বাঁচে, সে তোর গুণেই বাঁচ্‌বে। তোর ধার কখন শুধ্‌তে পার্‌ব না।"

ভগী কোন উত্তর করিল না; সে দুই হাত বুকের উপর রাখিয়া নীরব-নিস্পন্দ-ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তিনুকে সঙ্গে লইয়া রায় মহাশয় চলিয়া গেলেন।

তিনু এখন আর ছেলেমানুষটি নাই, ষোল বছরের যুবা হইয়াছে। সে এখন খাটিয়া পয়সা আনে, আনিয়া মায়ের হাতে দেয়। ভগী সেই পয়সায় ছেলেকে খাওয়ায়, আপনি খায়। আর নিজে ধান ভানিয়া, গোবর কুড়াইয়া যাহা পায়, তাহা জমাইয়া রাখে। ভগীর কষ্ট সার্থক হইয়াছে, ছেলেকে মানুষ করিয়াছে, তাহার দুঃখ ঘুচিয়াছে।

লোকে বলে, "তিনুর মা, এবার তিনুর বিয়ে দে।"

ভগী আহ্লাদের হাসি হাসিয়া বলে, "পাঁচজনে আশীর্ব্বাদ কর মা, বিয়ে দেব বৈকি।"

ভগী সেই আশাতেই কিছু কিছু জমায়। দুই পাঁচ টাকা জমিয়াছে, আর কিছু জমিলেই ছেলের বিয়ের চেষ্টা দেখিবে; বৌ ঘরে আনিয়া জীবনের সাধ-আহ্লাদ পূর্ণ করিবে।

(৪)

ভোরের সময় তিমু আসিয়া ডাকিল, "মা!"

ভগী সারারাত জাগিয়াই বসিয়াছিল। ছেলের সাড়া পাইয়া সে তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিল; ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "কে রে, তিমু এলি?"

তিমু বলিল, "হাঁ, বিছানা ক'রে দে।"

ভগী দেখিল, বৃষ্টিতে তিমুর কাপড়-চোপড় সব ভিজিয়া গিয়াছে, শীতে সর্ব্বশরীর ঠক্ ঠক্ কাঁপিতেছে, গা দিয়া যেন আগুন ছুটিতেছে, বুকের ব্যথায় সে দাঁড়াইতে পারিতেছে না। বিছানা পাতাই ছিল; ভগী ছেলেকে কাপড় ছাড়াইয়া বিছানায় শোয়াইয়া দিল।

তিমু সেই যে শুইল, আর উঠিতে পারিল না, কথা কহিবারও শক্তি রহিল না। ভগী ভয় পাইয়া রঘু ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। রঘু ডাক্তার পড়া-শোনা না করিয়াই কেবল স্বীয় তীক্ষ্ণবুদ্ধির প্রভাবে ডাক্তারি করিয়া বেড়াইত। সে আসিয়া তিমুর নাড়ী টিপিল, জিভ দেখিল, বুকে চোঙ্গ বসাইয়া বুক পরীক্ষা করিল। তার পর মাথা নাড়িয়া বলিল, "ব্যারামটা কঠিন, বাতশ্লেষ্মা জ্বর, একুশ দিন ভোগ। তবে ভয় নাই, শীগ্‌গীর দু'টো টাকা দে।"

টাকা পকেটে পূরিয়া ডাক্তার ঔষধ দিয়া গেল। তিমু ঔষধ খাইতে লাগিল, কিন্তু রোগ কমিল না। তিন দিনের দিন বুকের ভিতর হইতে জাঁতার মত শব্দ বাহির হইতে লাগিল, গলার স্বর বন্ধ হইয়া আসিল, দুই হাত দিয়া বিছানা আঁচড়াইতে লাগিল। কেনারাম আসিয়া বলিল, "ক'রেছিস্ কি রে মাগী, এ যে পুপ্পা বিকার।"

ভগী কাঁদিতে লাগিল, কেনারাম তাহাকে টাকার যোগাড় করিতে বলিয়া নুণ-হাটের বড় ডাক্তার রাসবিহারী বাবুকে ডাকিতে গেল।

ভগীর হাতে যে দুই চারি টাকা জমিয়াছিল, তাহা তখন রঘু ডাক্তারের পকেটে গিয়াছে। সুতরাং ভগী টাকার জন্য রায় মহাশয়ের নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল।

রায় মহাশয় কিন্তু টাকা দিতে পারিলেন না। তাঁহার নিজের ছেলের ব্যারামে বিস্তর টাকা খরচ হইয়াছে, গহনা বাঁধা দিয়া আজকাল এক পয়সার কম সুদে টাকা পাওয়া যায় না, আর সেরূপে টাকা দিলেও ভগীর নিকট হইতে তাহার আর পুনঃ-প্রাপ্তির আশা নাই; ইত্যাদি অনেক কথাই বলিলেন। ভগী তবু ছাড়ে না, কাঁদাকাটা করে। শেষে রায় মহাশয় বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "মর্ মাগী,

কেন টাকা নষ্ট কর্‌বি? তিনে কি বাঁচ্‌বে? আমি রঘু ডাক্তারের মুখে শুনেছি, হাতী আড় কর্‌লেও ও ফির্‌বে না।”

ভগী ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া রায় মহাশয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রায় মহাশয় তখন সে দিনের রাত্রির পারিশ্রমিকস্বরূপ একটা সিকি ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া গেলেন। ভগী সিকিটা লইল না, কিছুক্ষণ নীরব-নিস্পন্দ-ভাবে বসিয়া থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে উঠিয়া গেল। যাইবার সময় সে দেখিয়া গেল, রায় মহাশয়ের পুত্র অনেকটা সারিয়া উঠিয়াছে, সে বালিশ ঠেস দিয়া বসিয়া বেদানা খাইতেছে।

পথে যাইতে যাইতে ভগী সিংহবাহিনীর মন্দিরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। ভিতরে পুরোহিত তখন পূজা করিতেছিলেন। ভগী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মন্দির-প্রাঙ্গণে লুটাইয়া পড়িল; আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিল, “মা গো, আমার তিনেকে বাঁচিয়ে দে মা, তোকে বুক চিরে রক্ত দেব।”

তাহার আকুল কণ্ঠের প্রতিধ্বনি মন্দিরমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। পুরোহিত তখন উদাত্তস্বরে পড়িতেছিলেন—

“শরণাগতদীনার্ত্ত-পরিত্রাণপরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥”

(৫)

বড ডাক্তার আসিয়া রোগী দেখিয়া বলিলেন, “ডবল নিমোনিয়া, জীবনের আশা খুব কম।” ভগী কাঁদিতে লাগিল, ডাক্তার প্রেস্‌ক্রুপ্সন লিখিয়া দিয়া, তদ্বিরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ভিজিট লইয়া চলিয়া গেলেন। ভিজিটের টাকা কেনারাম নিজের ঘর হইতে আনিয়া দিল। ডাক্তার যেরূপ তদ্বিরের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন, বড় লোকের ঘরেই তাহা সম্ভব, চাঁড়ালের ছেলে তিনুর সেরূপ তদ্বির হইল না। রোগও উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ভগী কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুধু ভগবান্‌কে ডাকিতে লাগিল।

ভগবান্ কিন্তু তাহার ডাকে সাড়া দিলেন না। সাত দিনের দিন মধ্যাহ্নকালে তিনু মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। ভগীর বুকফাটা চীৎকারে চাঁড়ালপাড়া কাঁপিয়া উঠিল। কেনারাম আসিয়া ভগীর বুক হইতে তিনুর শবদেহ ছিনাইয়া লইয়া দাহ করিতে গেল। ভগী হৃতশাবকা কপোতীর মত রাস্তায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় রায় মহাশয় পুত্রের আরোগ্য জন্য সিংহবাহিনীর পূজা দিয়া ঢাক বাজাইয়া সেই পথে ফিরিতেছিলেন। ভগী “বাবাঠাকুর গো!” বলিয়া চীৎকার

করিয়া তাঁহার পায়ের কাছে আছড়াইয়া পড়িল। রায় মহাশয় ত্রস্তভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া হাত নাড়িয়া নিষেধ করিতে করিতে বলিলেন, "ছুঁস্‌নে, ছুঁস্‌নে, এখনি মায়ের প্রসাদ সব নষ্ট হ'য়েছিল আর কি!"

ভগী শূন্যদৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিতভাবে বসিয়া রহিল। রায় মহাশয় পাশ কাটাইয়া পুত্রের হাত ধরিয়া চলিয়া গেলেন এবং যাইতে যাইতে আনন্দোৎসবসময়ে পথে অশুভ-সন্দর্শন জন্য মনে মনে সিংহবাহিনীর নিকট পুনরায় পাঁঠা মানসিক করিতে লাগিলেন।

প্রতিবেশিনী বিমলা আসিয়া ভগীর কাছে দাঁড়াইল এবং সহানুভূতির স্বরে বলিল, "আহা, তিহুর মা, পরের ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ছেলেটা হারালি!"

ভগী উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চোখ মুছিয়া দূরগত রায় মহাশয়ের ছেলের দিকে চাহিতে চাহিতে বলিল, "আমার ছেলে আমার কপালে গেছে; পরের দোষ কি মা? মা কালী করুক, পরের ছেলে বেঁচে থাক্।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

সাহিত্যে স্বাতন্ত্র্য

La nature est pleine de varietes et de moules divers : il y a une infinite de formes de talents. Critique, pourquoi n'avoir qu'un seul patron ?

Sainte-Beuve.

আর সব জিনিষের ন্যায় সাহিত্যও তখনই সজীব সচল, তখনই প্রাণে প্রাণে ভরিয়া উঠে—যখন সে বন্ধনহীন, যখন সে যদৃচ্ছভাবে খেলিতে পারে, যখন স্বাধীনতার মুক্তির প্রেরণা তাহার মধ্যে তরঙ্গায়িত দূরপ্রসারিত। আপনাকে যথা অভিরুচি ছড়াইয়া দিয়া যত দিক্ হইতে পারে, জীবনের খাদ্য আহরণ করে, তাহাকে পুষ্ট সমৃদ্ধ মহনীয় করিয়া তোলে, নানা ভাবের নানা ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়াই আত্মপ্রতিভাকে বিকশিত করিতে থাকে। জীবনের লক্ষণ বৈচিত্র্য, তাই জীবন্ত সাহিত্যেরও প্রকাশ বহুভঙ্গিম সৃষ্টির মধ্য দিয়া। কিন্তু যখনই আমাদের প্রধান চেষ্টা হয়, বিধিনিষেধের দ্বারা সাহিত্যকে গড়িয়া তুলিতে, কোন বিশেষ ধারা বিশেষ রীতির মধ্যেই তাহাকে আবদ্ধ রাখিতে, তখনই আমরা সাহিত্যের মরণসজ্জা প্রস্তুত করিতে থাকি। এ কথা সত্য, সাহিত্যে চাই অকৃত্রিম, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, মহত্তম সৃষ্টি, আবর্জ্জনার বাহুল্য কাটিয়া ছাঁটিয়া, একটা সত্যধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই তাহাকে গড়িয়া তোলা। সে জন্য প্রয়োজন এক প্রকার আদর্শ, স্বেচ্ছাচারের পরিবর্ত্তে একটা সংযম, গ্রহণ-বর্জ্জনের একটা নিয়ম। কিন্তু সেই আদর্শকে সূত্র-নিবদ্ধ না করাই শ্রেয়ঃ। সৌন্দর্য্যের প্রতি— রসের প্রতি অকুণ্ঠিত অনুরাগ, উদার গুণগ্রাহিতা জাগাইয়া তোলা এবং প্রত্যেককে আপন আপন অন্তরের কবি-অনুভূতির পথে মুক্তভাবে চলিতে দেওয়া, জীবন্ত স্থায়ী সাহিত্যসৃষ্টির পক্ষে ইহাই আবশ্যক। সাহিত্যের ধর্ম্মকে যখন সঙ্কুচিত করিয়া ফেলি, আদর্শের মধ্যে যখন এইরূপ এক উদার প্রসার পাই নাই, মানব-আত্মাকে কবি-প্রতিভাকে আপন বিসারের জন্য বহু ও বিচিত্র প্রণালী কাটিয়া লইতে দিই না, মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ সত্যধর্ম্মসমন্বিত করিতে যাইয়া সাহিত্যকে যদি কোন অদ্বৈতভাবের মধ্যে ধরিয়া লইতে চাই, তবে দুই এক জন অমানুষী প্রতিভার মধ্যে সে কৈবল্যমুক্তির আবির্ভাব দেখিলেও দেখিতে পারি ; কিন্তু নীচে সাধারণের মধ্যে সাহিত্যের জীবনমূলটি শুকাইয়া উঠিতেই দেখিব।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিক্টর হিউগো যখন ফরাসী সাহিত্যে ভাবের ভঙ্গিমায় বিপ্লব ঘটাইতেছিলেন, পুরাতনের সঙ্কীর্ণ আভিজাত্যটি ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার স্বাতন্ত্র্যের মুক্ত জীবনের স্রোত বহাইতে চাহিতেছিলেন, তখন পুরাতনের দল তারস্বরে বলিতেছিলেন, হিউগোর ভাষা ফরাসীভাষা নয়, তাঁহার কবিতায় ফরাসী কবিতার প্রাণধর্ম্ম নাই, তিনি ক্লাসিক নহেন। ইঁহাদের মুখপাত্র হইয়া ফরাসী কবি-প্রতিভার তথাকথিত কোটটি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য দাঁড়ান নিসার (Nisard)। এই নিসারকে লক্ষ্য করিয়া উদারদৃষ্টি সমালোচক সেন্তব্যভ বলিতেছেন, "প্রকৃতি বৈচিত্র্যে ভরা, সেখানে কত রকমারী ছাঁচ। প্রতিভারও অনন্ত রূপ। তবে সমালোচক, তুমি কেন এক মনিবেরই দাসত্ব করিতে থাকিবে?"

বাস্তবিক পক্ষে ইতিহাস ইহার সাক্ষ্য দেয়, সাহিত্য যেখানে উদার প্রতিষ্ঠা পায় নাই, যেখানেই সাহিত্যসৃষ্টির একটা বিশেষ মানদণ্ড খণ্ডিত-আদর্শ স্থাপন করিয়াছি, একটি কৌলীন্য গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছি, সেখানে তদনুযায়ী এক মহনীয় মহত্মন্য সৃষ্টি করিতে পারিলেও তাহারই মধ্যে আবার পতনের বীজ বপন করিয়াছি। ইংলণ্ডে মিল্‌টন, ফরাসীতে কর্ণেই, রাসীন, লাতিনে ভর্জ্জিল হোরাস এইরূপ আভিজাত্যাভিমানী কবি, এবং ইঁহাদের সহিত আমাদের কালিদাস-ভবভূতিরও নাম করা যাইতে পারে। ইঁহারা সকলেই ছিলেন রাজপরিষদের গুণিজনের কবি—বিদ্যাবান্, মার্জ্জিতবুদ্ধি, পরিশুদ্ধরুচি, শোভনকর্ম্মী শিল্পী। যাহা গড়িয়াছেন, তাহাকে ঘষিয়া মাজিয়া, সুন্দর করিয়া, ঐশ্বর্য্য ভরিয়া তবে গড়িয়াছেন। তাঁহারা রচিয়াছেন রাজজনোচিত হর্ম্ম্যাবলী, মর্ম্মরে বিন্যস্ত, মণিমাণিক্যখচিত—সাধারণের সেখানে যেন সসম্ভ্রমেই পদার্পণ করিতে হয়। ইঁহারা প্রথম পথপ্রদর্শক, যে আদর্শ ইঁহারা স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের প্রাণের অন্তরাত্মার বস্তু। তাঁহারা ছিলেন প্রতিভাবান্, তাই তাঁহাদের সৃষ্টি অনবদ্যাঙ্গ, জীবন্ত, মহনীয়- সকলের পূজার্হ। কিন্তু পরে যাঁহারা আসিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তিগণের আদর্শটি সম্মুখে রাখিয়াছেন; কিন্তু অন্তরে সেই একই জলন্ত অনুভূতি রাখিতে পারেন নাই, তাঁহাদের নিকট সে আদর্শ হইয়া পড়িয়াছে শাস্ত্রবিধান—কষ্টকল্পনামাত্র। সাহিত্যের ধারাটি - শিষ্টাচারটি অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া হারাইয়াছেন স্বাতন্ত্র্য, নিজের প্রাণের উপলব্ধি; হারাইয়াছেন সাহিত্যসৃজনের মূলমন্ত্রটি। তাই দেখি, মিল্‌তনের পরেই পোপ, কর্ণেই'র পরেই বোয়ালো, ভর্জ্জিলের পরেই ওভিদ ষ্টাস, কালিদাসের পরেই ভট্টি বাণভট্ট।

লাতিন ও গ্রীক সাহিত্যের তুলনা এই প্রসঙ্গে খুবই শিক্ষাপ্রদ। গ্রীকের সৌন্দর্য্য-বোধ—রসবোধ ছিল উদার-বিস্তৃত। তাহাদের দৃষ্টির মধ্যে ছিল একটা ব্যাপকতা, নমনীয়তা—উহা চলিত সুবলয়িত তরঙ্গভঙ্গে। তাহাদের কবিত্বপ্রতিভার মুক্তির

দূরপ্রসারিত অবকাশ, স্বচ্ছন্দগতির বিচিত্র ভঙ্গিমা। অন্যপক্ষে বীরকর্ম্মী বস্তুতান্ত্রিক লাতিন জাতির মধ্যে ভাবুকতার, কল্পনাপ্রিয়তার সে লীলায়িত রোখাপাতের নৈপুণ্য ছিল না। তাহারা জিনিষকে দেখিত ঋজুদৃষ্টিতে, জিনিষকে ধরিতে চাহিত জিনিষের যে স্পষ্ট স্ফুট সহজগ্রাহ্য অঙ্গ, তাহার সহায়ে। কাটিয়া ছাঁটিয়া, ঘসিয়া মাজিয়া সব পদার্থকে একই ছাঁচে গড়িতে তাহাদের আনন্দ। বিজয়ী জাতি তাহারা—বহুজাতি, বহুদেশ, বহুধর্ম্মকে পিষিয়া এক মহাজাতি, মহাদেশ, মহাধর্ম্মে পরিণত করিতে চাহিয়াছিল, সব অন্তর্ভুক্ত করিতে চাহিয়াছিল এক নামে—রোম। সাহিত্যেও তেমনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল একটা আদর্শ—বীরের গম্ভীর আরাব, বিজয়ীর দৃপ্ত তেজস্ ওজস্, সেনানীর মুখে সে আদেশ-বাণীর অক্ষরকার্পণ্য, রাজানুশাসনের কঠোর স্পষ্টতা,বাগ্মিতার ধীর প্রসারিত পূর্ণতা। প্রাকৃতজনের (plebs) হাবভাবে কথায় চিন্তায় যে সহজবিগলিত গড্ডালিকা-প্রবাহ, যে সদা-চঞ্চল উচ্ছৃঙ্খলগতি, তাহাকে রোম অবহেলার চক্ষেই দেখিয়াছে। সে চাহিয়াছে আভিজাত্যের (Patricii) গুরুভার গাম্ভীর্য্য। আর রোমনগরী যে আদেশ প্রচার করিয়াছে, যে আদর্শ দেখাইয়াছে, সমস্ত রোমসাম্রাজ্য তাহাকে অবনত-মস্তকে স্বীকার করিয়া লইয়াছে—তাহা হইতে বিচ্যুত হইয়া কেহই রোমক নামের অমর্য্যাদা দেখাইতে সাহস পায় নাই। সাহিত্য হউক অথবা রাজনীতি সমাজনীতি যাহাই হউক, সকল ক্ষেত্রে একমাত্র গুরু রোমনগরী। গ্রীক কিন্তু তাহার প্রতিভাকে এইরূপ একই কেন্দ্রে সম্পুটিত করিয়া রাখে নাই। রোমনগরীর ন্যায় এথেন্স গ্রীক-সভ্যতার তেমন সর্ব্বগ্রাসী কেন্দ্র হইয়া পড়ে নাই—যতটুকু হয়, তাহা বহু পরে। গ্রীসের প্রত্যেক প্রদেশই একটা স্বাতন্ত্র্য—একটা জাগ্রত বিশিষ্টতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। ভাষাকে একই প্রকরণে ঢালে নাই, ভাবকেও কোন একটি ধারায় আবদ্ধ রাখে নাই। প্রত্যেকেরই আপন আপন প্রেরণা ও ভঙ্গিমার স্বতঃস্ফুরণে এমন বিচিত্র মহনীয় গ্রীক-সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছে। এই স্বাধীনতা, এই যদৃচ্ছ অঙ্গসঞ্চালনের অভাবে লাতিন সাহিত্য অল্প দিনেই পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রতিভা দেখাইয়াছে দুই একটি বিষয়ে মাত্র। গ্রীস কিন্তু শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া কত দিকে, কত বিষয়ে, সাহিত্যের কত প্রকরণে আপনাকে বিকশিত করিয়া দিয়াছে।

সাহিত্যে উচ্ছৃঙ্খলতা-দোষও যেমন আছে, ঠিক শুচিদোষও তেমনি আছে। সাহিত্যকে যাঁহারা রমণীয়, মহনীয়, পরিশুদ্ধ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহাদের মধ্যে এক দলের এই শুচিব্যাধি খেলিয়াছে রূপ বা গড়নটি লইয়া। নামে তাঁহাদের লক্ষ্য classic manner, বস্তুতঃ কিন্তু তাঁহারা জড়াইয়া পড়েন আভিজাত্যের ঠাটটি লইয়া। সাহিত্যে আভিজাত্য চাই, কিন্তু প্রধানতঃ তাহা অন্তরাত্মার আভি-

জাত্য। classic soul যাঁহার, classic manner তাঁহারই সহজসিদ্ধি। মহিষ্ঠ গরিষ্ঠ বলিয়া বিশেষ একটি কোন ধারা নাই। কাব্যের আত্মপরিস্ফুরণ, বিশ্বকবির কবিত্বশক্তি বহুরূপী। তাহাকে দুই এক জন কবির বা দুই একটি কবি-সঙ্ঘের ভঙ্গিমায় আবদ্ধ রাখা চলে না। বিষ্ণুর মত কবিত্বপ্রতিভাও "অনবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা।" আমাদের শাস্ত্রে ছত্রচামরাদি কয়েকটি বস্তু রাজার চিহ্নস্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সাহিত্যরাজকেও যে সেইরূপ কোন বিশেষ পরিচ্ছদ বা চিহ্নে মণ্ডিত করিতেই হইবে, এমন কোন কথা নাই। যখন বলি, মহাকাব্যে এতগুলি সর্গ থাকিবে, নাটকে এতগুলি অঙ্ক থাকিবে, নায়কের এই এই গুণ থাকিবে, এই এই উপমা দিতে পারিবে, আরগুলি পারিবে না অথবা আখ্যায়িকায় আখ্যানবস্তুটির প্রথম হইতেই আরম্ভ করিবে, মাঝখান হইতে ("in medias ves") পারিবে না, তখন যে কিরূপ সাহিত্যসৃষ্টি হয়, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্যে আর এক শুচিব্যাধি আছে—ঐটি আধুনিক যুগেই দেখা দিয়াছে, তাহা হইতেছে সাহিত্যের উপর "নীতিকতা", ধার্ম্মিকতা, শ্লীলতার দাবী। সাহিত্যের মুক্ত বিকাশ যদি চাই, তবে এ বন্ধনটিও কাটিতে হইবে। জীবন্ত কি মৃত, কোন ভাষাতেই এ উদাহরণ পাই না যে, শ্লীলতা, সাধুতা, এমন কি, আধ্যাত্মিকতার পদতলে সাহিত্য আপনাকে নিগড়িত করিয়াছে। ফরাসীর কথা ছাড়িয়াই দিলাম, লাতিন সাহিত্য—যাহার আদর্শে এতখানি শোভনতা, বাহ্যশ্লীলতা, গুরুগম্ভীরতার স্থান, সেখানেও উদ্ভূত হইয়াছেন কাতুল্ল (catullus) ওভিদ। আর সংস্কৃত লৌকিক সাহিত্যের ত কথাই নাই, বৈদিক ঋষিদিগের আধ্যাত্মিকতা ব্যাখ্যানের মধ্যেও এমন কথা পাই—আধুনিকগণ যাহাকে অশ্রাব্য বলিয়াই নির্দ্দেশ করিবেন।

সাহিত্যের আত্মার স্বাধীন উন্মুক্ত গতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ শেক্সপীয়র। শেক্সপীয়র আলঙ্কারিক হউন আর নৈতিক হউন, কোন শৃঙ্খলেই আপনার প্রতিভাকে বাঁধিয়া রাখেন নাই। ক্লাসিকের আত্মস্থ গাম্ভীর্য্য, রোমান্টিকের উচ্ছ্বসিত প্রগল্ভতা, জ্ঞানিগুণিজনসুলভ মার্জ্জিত বাক্যবিন্যাস ও ধীর চিন্তাশীলতা, প্রাকৃত জনের দোলাচলচিত্তবৃত্তি ও তদনুরূপ কথাভঙ্গি—সকলের মধ্য দিয়া তাঁহার সৃষ্টি সকল রসের আধার এক বিরাট্ মহাসাগর-তুল্য। শেক্সপীয়রের কবিপ্রেরণা প্রকৃতির মতনই অবাধে অজস্রগতিতে আপনাকে ছুটাইয়া দিয়াছে, তাই তাহাতে এত বৈচিত্র্য, তাই তাহা এত জীবন্ত। পিউরিটান কবি মিল্‌তনের উপরেও তাই শেক্সপীয়রের স্থান। শেক্সপীয়রের ন্যায় মোলিয়েরও কোন বিশেষ মতবাদ বা শাস্ত্রদায়িকতার মধ্যে আপনাকে ধরা দেন নাই। তাঁহার প্রতিভায় রুচির উদার-

প্রসার লীলায়িত হইয়া উঠিয়াছে। রাসীনের সে পরিপাটী আভিজাত্য, কর্ণেই'র সে গর্ব্বোন্নত মহীয়ত্ব, তাহাদের মধ্যে পাই কেমন একটা সঙ্কীর্ণতা। সেই জন্যই মোলিয়েরকে তাঁহাদেরও উপরে স্থান দিতে ইচ্ছা হয়।

কাব্যসৃষ্টির মূল কথা এইখানে, আখ্যানবস্তুর যে মূল্য থাকুক না, ভঙ্গিমার যে মর্য্যাদা থাকুক না, সকলের উপরে হইতেছে কবির সে নিগূঢ় অনির্ব্বচনীয় শক্তি—আত্মার তপঃ-অভিব্যঞ্জনা। এই মূল শক্তিটির আধার যে কবি, তিনি সহজেই তাঁহার সকল ভাব, সকল ভঙ্গিমাই এক নৈসর্গিক আভিজাত্যে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। ফলতঃ আমরা মনে করি, কবিত্বের এই মৌলিক উৎসটি হইতে যখন আমরা দূরে চলিয়া যাইতেছি, যখন আত্মার সে স্বাধীন বিহার-প্রাঙ্গণ সঙ্কুচিত হইয়া আসিবার উপক্রম হইয়াছে, তখনি কবিত্বের ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত বিশেষ আদর্শ, বিধিনিষেধ স্থাপন করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছি, তখনি কবিত্বশক্তির একটা বিশেষ প্রকরণ স্থিরনির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি। উদারতা প্রসারতা যখন হারাইতে বসিয়াছি, তখন একটি বিশেষ অঙ্গকেই অতিকায় করিয়া তুলিয়াছি। সাগরের অনন্ত বিস্তারের পরিবর্ত্তে চাহিয়াছি শৈলশিখরের উত্তুঙ্গ স্থৈর্য্য, মর্ম্মরের দৃপ্ত শোভনীয়তা। সেই জন্যই বোধ হয়, সফোক্লা হইতেও হোমর গরীয়ান্, কালিদাস হইতেও বাল্মীকি গরীয়ান্। কিন্তু ব্যক্তিগত হিসাবে যাহাই হউক না, সমগ্র একটি জাতির সাহিত্য যদি এইরূপ একমুখী এক আদর্শানুযায়ী হয়, তবে সে সাহিত্য শুকাইয়াই উঠিবে। আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও ইহাই ঘটিয়াছে। যে দিন মানুষের আগে বসাইয়াছি শিল্পীকে, যে দিন কেবল অভিরূপভূয়িষ্ঠ পরিষদের জন্যই কাব্য সৃষ্টি করিয়াছি, সেই দিন হইতেই সংস্কৃত সাহিত্য ক্রমে ক্রমে লোকচক্ষুর অন্তরাল হইতে আরম্ভ করিয়াছে, অবশেষে পাণ্ডিত্যের তর্কের শুষ্ক মরুভূমির মধ্যে পড়িয়া বাষ্প হইয়া উড়িয়া গিয়াছে।

যথার্থ কাব্য, মহনীয় সাহিত্য, প্রকৃত আভিজাত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে কোন বিশেষ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া নয়, কালিদাস, বাল্মীকি বা বৈদিক কবির পন্থাটি দেখাইয়া নয়; কিন্তু সমগ্র জাতির নিগূঢ় সারস্বত প্রতিভাকে জাগাইয়া তুলিয়া। প্রাচীন গ্রীসে আপামর এইরূপ গুণী ছিল, সকলেই মার্জ্জিতরুচি, উচ্চভাবের ভাবুক, সমস্ত জাতিটি—দেশটিই ছিল বাণী দেবীর জীবন্ত বিগ্রহ। সফোক্লার নাটক দেখিতে দলে দলে লোক—সাধারণ লোক সব—এথেন্সের রঙ্গালয়ে ছুটিত। বর্ত্তমান যুগে সুলভ অপেরা দেখিতে আবালবৃদ্ধবনিতার যেমন আগ্রহ, উৎসাহ, পরিতুষ্টি, আস্তিগোণা দেখিয়া গ্রীসের জনসঙ্ঘ তেমনি উদ্বেলিত হইয়া উঠিত,

তদপেক্ষা গভীরভাবেই নাট্যরসের আনন্দ উপভোগ করিত। গ্রীসের Intelligentsia গুণিসমাজ ছিল সমস্ত গ্রীকজাতি। গ্রীসের বহুবলম্বিত সাহিত্য-প্রতিভার ইহাই মূল। প্রকৃত সাহিত্য গড়িয়া তুলিতে হইলে, তাহার বিচিত্র বিপুল বিকাশ দেখিতে হইলে রাজনীতিও যেমন Peuple Roi, সাহিত্যও তেমনি গড়িয়া তুলিতে হইবে Peuple Intelligentsia, ইউরোপে রেনাসেন্সের যুগে আবার রোমাণ্টিকের যুগে এইরূপ একটা বিপুল Intelligentsia'র উদ্ভব হইয়াছিল, ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসৃষ্টি এই দুই স্রোতের মুখে।

শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত।

বিরহে পাগল

রাজা উর্ব্বশীকে পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। ভরতমুনির শাপে উর্ব্বশীরও বর হইয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্র উর্ব্বশীকে রাজার হাতে হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন। পাটরাণী সতীনপনা ভুলিয়া উর্ব্বশীকে ভগিনী বলিয়া মনে করেন। সুতরাং রাজা ও উর্ব্বশী দুইয়ে এখন এক। রাজা যদি মহাদেব হইতেন, হয় ত অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি হইয়া যাইতেন। এ প্রণয়-মিলনে যে সুখ, রাজার তাহার চরম হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু রাজধানী আর ভাল লাগিতেছে না। এখানে লোকজন অনেক, কাজকর্ম্ম অনেক, ব্যাঘাত অনেক; সুতরাং এ জায়গাটা ছাড়িতে হইবে। এমন জায়গায় যাইতে হইবে, যেখানে রাজা দেখিবেন উর্ব্বশী, আর উর্ব্বশী দেখিবেন রাজা। তবেই তো মিলনের চরম হইবে! তবেই তো দ্বৈতভাবে অদ্বৈতজ্ঞান হইবে! জায়গাটাও মনোরম হওয়া চাই; নেহাৎ মরুভূমিতে হইবে না, বনে জঙ্গলে হইবে না, পাহাড়-পর্ব্বতেও হইবে না। যেখানে ক্লেশ, কষ্ট, দুঃখ, শ্রম, ক্লান্তি, ইহার একটিও থাকিবে অথবা একটুও থাকিবে, সেখানেও অদ্বৈতভাবের ব্যাঘাত হইবে। তাই উর্ব্বশী স্থির করিলেন, গন্ধমাদন যাইতে হইবে। বরফের পাহাড়ের নিকটে, অথচ তত শীত নহে, তত বরফ পড়ে না, এমন জায়গায় গন্ধমাদন নামে এক পর্ব্বত আছে। পর্ব্বতের গায়ে, পাশে, মাথায় কেবল ফুল ফুটিয়া আছে। ফুলের গন্ধে যে শুধু চারিদিক্ আমোদ করিয়া আছে, এমন নহে; এ গন্ধে লোকেও পাগল হয়। কেহ কেহ বলে, সেখানে গেলে লোকে কেবল হাসিতে থাকে; এত হাসি হাসে যে, হাসিতে হাসিতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। ফুলের ধূলায় আকাশ ভরিয়া যায়। বদরিকাশ্রমের উত্তরে বরফের পাহাড়ের ঠিক নীচে এইরূপ একটি পাহাড় আছে, উহাকেই গন্ধমাদন বলে। শীতকালে বরফ পড়ে। গরমের সময় বরফ গলিয়া গিয়া নানারূপ সুগন্ধি ফুলের গাছ গজাইয়া উঠে। বর্ষায় যখন ফুল ফুটে, তখন গন্ধমাদন নামটি সার্থক হয়।

উর্ব্বশী রাজাকে বলিলেন, 'চল আমরা দুজনে গন্ধমাদন যাই। সেখানে আমাদের সঙ্গে আর কেহই থাকিবে না। রাজ্যের ভার মন্ত্রীদের উপর দাও; নিশ্চিন্ত হইয়া আমরা দুজনে সেখানে থাকি। চাকর-চাকরাণী, খানসামা, খিদমদগার কিছুরই দরকার নাই। তোমার সঙ্গে কেবল থাকিবে তোমার

অপরূপ রূপ, আর সে রূপ দেখিবার জন্য থাকিবে কেবল আমার দুটি চক্ষু। সে পাহাড়ের উপর দিয়া একটি নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে; ধীরে ধীরে বহিতেছে বলিয়া দেবতারা তাহার নাম রাখিয়াছেন মন্দাকিনী। মন্দাকিনীর দুই দিকে এখন প্রকাণ্ড চড়া, সে চড়ায় কেবল বালি। চল, সেই চড়ায় গিয়া আমরা বেড়াই। প্রণয়ের মিলনের সেই তো স্থান।'

সমস্ত গ্রীষ্মকালটা রাজা ও উর্ব্বশী মন্দাকিনীর তীরে গন্ধমাদন পর্ব্বতে একেবারে জনশূন্য স্থানে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। সমস্ত জগৎ হইতে তফাৎ হইয়া তথায় তাঁহারা দুজনেই—নূতন জগৎই বল, আর নূতন স্বর্গই বল, বা নূতন বৈকুণ্ঠই বল, নূতন সুখাবতীই বা বল, গড়িয়া লইলেন।

তাঁহারা কিরূপে সেখানে কালযাপন করিয়াছিলেন, কবি কালিদাস সে কথা বলেন নাই। কিন্তু সেটা সকলেই মনে মনে আঁচিয়া লইতে পারেন। কিন্তু চিরদিন কখনও সমান যায় না। গ্রীষ্ম যায়—বর্ষা আসে, এমন সময় একটি বিদ্যাধরের মেয়ে দৈবক্রমে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। রাজা একবার তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন, উর্ব্বশীর এটুকুও সহ্য হইল না। যেখানে ভালবাসার মাত্রাটা বড় বেশী, সেখানে রাগের মাত্রাও খুব বেশী। আমি যাহাকে ভালবাসি, সে আর একজনের দিকে চাহিবে! উর্ব্বশী তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। রাজা অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন, উর্ব্বশীর রাগ পড়িল না। তিনি রাগে গর-গর হইয়া মন্দাকিনীর বালির উপর দিয়া চলিলেন; রাজাও সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিলেন; কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে ফিরাইতে পারিলেন না। অনেক দূর গিয়া উর্ব্বশী একটি বাগান দেখিতে পাইলেন। তিনি যেমন বাগানে ঢুকিতে গেলেন, অমনি অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রাজা চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন, কোথাও উর্ব্বশী নাই। রাজা তখন একা—একেবারে একা। একজন সঙ্গী ছিল, তাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। এ যে ভয়ানক একা! তাহার উপর গন্ধমাদনের গন্ধ। সে গন্ধে অন্য লোক তো একেবারেই পাগল হয়। তাহার উপর এই অদ্ভুত বিরহ! মিলনের আশাও নাই। কালিদাস একবার এইরূপ বিরহে ফেলিয়া একটি বেচারা যক্ষকে পাগল করিয়া তুলিয়াছিলেন; তাই সে জড় পদার্থ মেঘকে দূত করিয়া আপন স্ত্রীর নিকট খবর পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু তাহার তো আশা ছিল, বৎসরের পর আবার মিলন হইবার আশা ছিল। সে সেই আশায় বুক বাঁধিয়া বাঁচিয়াছিল, তবে বর্ষা আসায় তাহার মনটা বড়ই খারাপ হইয়া গিয়াছিল; তাই সে একটু পাগলামী করিয়াছিল। কিন্তু এবার তো সে আশা নাই। উর্ব্বশী অপ্সরা, সে অদৃশ্য হইয়া গেল, কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা নাই।

যদি আসে তো কবে আসিবে, তাহার ঠিকানা নাই, তাহাতে স্থানটা গন্ধমাদন, আবার বর্ষা আসিতেছে। সুতরাং রাজা একেবারে পাগল হইয়া গেলেন—উন্মাদ পাগল হইয়া গেলেন। এ দিকে উর্ব্বশী ও দিকে উর্ব্বশী ভাবিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। দিন-রাত্রি নাই, কেবল ছুটাছুটি। এমন সময়ে মেঘ উঠিল। রাজার বা যেটুকু জ্ঞান ছিল, তাহাও লোপ হইল। ভালবাসার সামগ্রী কাছে থাকিলেও মেঘ উঠিলে মনটা কেমন কেমন করে, কি যেন হারাইয়াছি, হারাইয়া যেন সব অন্ধকার দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়; তাহা পাইব কি না ভাবিয়া অধীর হইতে হয়। রাজা যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন, তাহাতে তিনি যে পাগল হইবেন—উন্মাদ হইবেন—হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইবেন—সব উল্টাপাল্টা করিবেন, তাহাতে বিচিত্র কি?

কালিদাস মেঘদূতে যক্ষকে পাগল করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পাগল সাজাইতে পারেন নাই। এখানে রাজাকে পাগল সাজাইয়াছেন। বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কের আরম্ভেই লিখিয়াছেন—"ততঃ প্রবিশতি উন্মত্তবেষো রাজা" রাজা উন্মত্ত অর্থাৎ পাগলের বেশে প্রবেশ করিলেন। কোন কোন পুথিতে রাজা যে আসিতেছেন, সেটা জানাইয়া দিবার জন্য একটি প্রাকৃত গান আছে। গান যে কে গাহিল, তাহার নির্ণয় নাই, বোধ হয় যেন নেপথ্য হইতেই কেহ গাহিয়া দিল, কিন্তু নেপথ্যে বলিয়া যেমন অন্য অন্য জায়গায় লেখা থাকে, তেমন লেখা কিছুই নাই। তাই পণ্ডিতেরা মনে করেন, এ পুথির পাঠ ঠিক নয়। নাই হউক ঠিক; কিন্তু উহাতে রাজার পাগল-বেশের একটা বর্ণনা আছে। গানে বলিতেছে—

"হাতী আপন ভালবাসার বিরহে উন্মাদ হইয়াছে, নানারূপ উল্টা-পাল্টা পাগলামীর লক্ষণ দেখাইতেছে। গাছের পাতা আর ফুল ছিঁড়িয়া দেহের সম্মুখভাগটা সাজাইয়াছে, আর বনের ভিতর ঢুকিতেছে।" গান গাওয়ার পরই রাজা আসিলেন। তাঁহার দৃষ্টি আকাশের দিকে, সেটা একটা পাগলেরই লক্ষণ—সাজগোজও পাগলের মত। আসিয়াই রাগে চীৎকার করিয়া বলিলেন,—"রে দুরাত্মা রাক্ষস, তুই আমার ভালবাসার জিনিস চুরি করিয়া কোথায় যাইতেছিস্?" খানিক এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া আবার আকাশের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"পাহাড়ের আগা থেকে আকাশে উঠিয়া আমার উপর তীর ছুড়িতেছিস্?" খানিক পরে ঠাণ্ডা হইয়া বলিলেন,—"হায় হায়! এ ত দুরাত্মা রাক্ষস নয়, এ যে নূতন মেঘ। এ ত ধনুক নয়, এ যে রামধনু। এ ত বাণ নয়, এ যে বৃষ্টির ধারা। এ ত উর্ব্বশী নয়, এ যে বিদ্যুৎ, যেন কষ্টিপাথরে সোনার দাগ।"

বোধ হয়, বৃষ্টির ধারা পাগলের মাথায় পড়ায় সে একটু সুস্থ হইল। তাহার জ্ঞান কতকটা ফিরিয়া আসিল। সে তখন টের পাইল, যাহা রাক্ষস ভাবিয়াছিল, তাহা

রাক্ষস নয়, যাহাকে উর্ব্বশী ভাবিয়াছিল, সে উর্ব্বশী নয়। যে পুথির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তাহাতে এইখানে রাজা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন লেখা আছে, আপনার ভ্রম বুঝিয়া লজ্জিত হন লেখা আছে, মেঘের কাছে মাপ চাওয়ার কথা লেখা আছে, আরও কত কি কথা আছে; কিন্তু সে সব কথা এখন আর বলিব না। যদি বারান্তরে সে সকল পুথির কথা বলিতে পারি, বলিব। এখন রাজার পাগলামীটি কালিদাস যেমন করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, তাই বলি। তবে যখন অন্য পুথির কথা পাড়িয়া রসভঙ্গ করিয়াছি, তখন একটা কথা বলিয়া রাখি যে, আমরা ঐ বাড়্‌তি কথাগুলি কালিদাসের বলিয়া বিশ্বাস করি না, তাহার কারণ এই, কালিদাস কখন কোন বর্ণনায় বাড়াবাড়ি করেন না। তিনি বেশ জানিতেন, সব অত্যাচার সহ্য যায়—রাজার অত্যাচার সহ্য যায়, ধর্ম্মের অত্যাচার সহ্য যায়, পুলিসের অত্যাচার সহ্য যায়, ভালবাসার অত্যাচার সহ্য যায়; কিন্তু কবির অত্যাচার সহ্য যায় না। কবি যে কথাটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছে, সেইটি ফেনাইয়া ফুলাইয়া বাড়াইয়া লোকের উপর অত্যাচার করিবেন, এটা কেহই সহিবে না। তাই কালিদাস কখনও কোনও জায়গায় বাড়াবাড়ি করেন নাই। আর বাড়াবাড়ি করেন নাই বলিয়াই আজ তাঁহার এত আদর। তিনি "জগতের কালিদাস" হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। রাজা বলিলেন,—"তাই ত, এ যদি মেঘ, রাক্ষস নয়; ওটা যদি বিদ্যুৎ, উর্ব্বশী নয়; তবে উর্ব্বশী গেল কোথায়? সে ত অপ্সরা; বড় রাগ হইয়াছে বলিয়া কি দেবশক্তিতে লুকাইয়া আছে? তা ত হ'তে পারে না। সে ত বেশীক্ষণ রাগ করিয়া থাকে না। তবে কি সে স্বর্গে চলিয়া গেল? সেও ত হ'তে পারে না, আমার উপর তার যে বড় টান। তবে কি তাহাকে কেহ হরিয়া লইয়া গিয়াছে? সেও ত হ'তে পারে না, অসুরেও আমার কাছ থেকে তাকে হরিয়া লইয়া যাইতে পারে না। তবে তাহাকে দেখিতে পাইতেছি না কেন? এ ব্যাপারটা কি?" রাজা একবার এদিক্, একবার ওদিক্, একবার ডাহিনে, একবার বামে দেখিতে লাগিলেন আর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"যাদের ভাগ্য মন্দ, তাদের দুঃখের পর দুঃখই আসে। এই দেখ না—একে ত উর্ব্বশী কাছে নাই, আমি যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছি, তাহার উপর আবার মেঘ দেখা দিতেছে। দিনে আর গরম থাকিবে না, আমায় সমস্ত দিনই বিরহেই কেবল ছট্‌ফট্‌ করিতে হইবে। তাই বা কেন হইবে? কেনই বা কষ্ট পাইব? মুনিরা ত বলেন,'রাজা কালস্য কারণম্।' আমিই যদি কালের কারণ হইলাম, আমি কেন বলি না, বর্ষা, তুমি এখন আসিও না। তাহা হইলেই ত সব চুকিয়া যায়। কিন্তু তাও কি হয়? আমি যে রাজা বনে একলা রহিয়াছি, তবুও ত আমি রাজা। আমার ত রাজার চিহ্ন কিছুই নাই; কিন্তু বর্ষাকাল যে আমার সব রাজচিহ্ন আনিয়া দিতেছে। দেখ না, মেঘ আমার চাঁদোয়া

হইয়াছে। রাজার চাঁদোয়ায় সোনার কাজ করা থাকে; বিদ্যুৎগুলিই সে সোনালির কাজ। রাজার চামর থাকে; হিজল গাছের বড় বড় মঞ্জরীগুলি চামরের কাজ করিতেছে। রাজার ভাট—চারণ থাকে; মেঘের ডাক শুনিয়া ময়ূরেরা ডাকিতেছে, তাহাতেই ভাট-চারণের কাজ হইতেছে। সওদাগরেরা রাজাকে ভেট দেয়; পাহাড়গুলাই সওদাগর হইয়াছে আর পাহাড়ের গা ধুইয়া কত কি আমার নিকটে আসিয়া পড়িতেছে, তাহাই আমার ভেট হইতেছে।

দূর হউক ছাই, ও সব কথা আর ভাবিব না। বেশভূষার গরব ক'রে আর কি হবে? যাই, তাহারই সন্ধানে যাই—যার বিহনে সব অন্ধকার দেখিতেছি। এদিক্ ওদিক্ দেখিতে দেখিতে একটি ভুঁই-চাঁপা ফুল রাজার চোখে পড়িয়া গেল, তাঁহার বোধ হইল যেন, তাঁহার "ভালবাসা"র চোখটি দেখিতে পাইলেন। রাগে যেন উর্ব্বশীর চোখে জল আসিয়াছে, আর চোখের কোণ লাল হইয়া উঠিয়াছে। ভুঁইচাপার পাপড়ীগুলি একটু লাল্‌চে হয়, আর বর্ষায় তাহার ভিতরে জল থাকে। ভুঁইচাঁপা দেখিয়া রাজা অধীর হইয়া উঠিলেন;—বলিলেন, তিনি যে কোন্ পথে গিয়াছেন, কেমন করিয়া টের পাইব? বনের বালিতে বর্ষার জল পড়িয়াছে, তাহার উপর দিয়া যদি তিনি চলিয়া যাইয়া থাকেন, তাহা হইলে ত তাঁহার পায়ের দাগ দেখিয়াই চিনিতে পারি। কারণ, সে দাগটি পিছন দিকে গভীর হইবে, আর সে দাগের পাশে আল্‌তার দাগ থাকিবে।

এদিক্ ওদিক্ দেখিয়া, আনন্দে আটখানা হইয়া রাজা বলিলেন, "বাঃ, বাঃ! পেয়েছি—পেয়েছি। এই যে তাঁহার বুকের কাপড়, সবুজ চেলি, ঠিক যেন শুক পাখীর পেটের রঙ্। রাগে যখন তাঁর চোখের জল পড়িয়াছে, সে জল ঠোঁটের উপর পড়িয়াছে। লাল রঙকরা ঠোঁটে লাল রঙ গলিয়া সে জল লাল হইয়া গিয়াছে, আর বুকের কাপড়ে পড়িয়াছে। বোধ হয়, রাগে চলিয়া যাইবার সময় কাপড়খানি খসিয়া পড়িয়াছে।" বেশ করিয়া কাপড়খানি রাজা ঠাহরাইয়া দেখিলেন আর বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়! এ যে কাপড় নয়, ঘাসের জমীর মাঝে মাঝে ইন্দ্রকীট রহিয়াছে।"

ইন্দ্রকীট নামে রাঙা রাঙা ছোট্ট ছোট্ট এক রকম পোকা আছে। বর্ষার প্রথম ভাগে তাহারা মাঠের অনেক জায়গা ছাইয়া থাকে। ঘাসের জমীর উপর ইন্দ্রকীটের ঝাঁক পড়ায় সবুজ চেলির উপর রঙ গোলা চোখের জলের মত বোধ হইতেছিল।

এ নির্জ্জন বনে কাহার কাছে তাহার সন্ধান পাই বলিয়া পাগল চারিদিকে চাহিতে লাগিল; দেখিল, একটা ময়ূর, বর্ষার জলে যে জায়গায় শিলাজতু ভিজিয়া রহিয়াছে, তাহারই একটা পাথরের উপর আনন্দেতে ঘাড় উচা করিয়া কেকা রব করিবার

চেষ্টায় আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ময়ূর হে, তুমি কি আমার প্রিয়াকে দেখিয়াছ? সে এই বনে কোথায় আছে কি বলিতে পার?"

গেল যা! আমার কথার জবাব না দিয়াই নাচিতে লাগিল। নাচে কেন? কিসে ওর এত আনন্দ হয়েছে? বুঝেছি—বুঝেছি, আমার ভালবাসার ধন নাশ হইয়াছে, ময়ূরের বড় আনন্দ। এত দিনে উহার পেখমের আর কেহ প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তাই এত আনন্দ। উর্বশীর খোঁপা যখন খুলিয়া যাইত, আর তাহার ফুলগুলি দেখা যাইত, তখন যে কেহও ময়ূরের পেখমের দিকে চাহিতও না। আজ সে নাই, তাই এত আনন্দ। যাক্ যাক্, পরের দুঃখে যার সুখ, সে পাষণ্ডকে কোন কথা আর জিজ্ঞাসা করিব না।

বাঃ! এই যে এদিকে একটি কোকিলা জামগাছের ডালে ব'সে আছে। আজ ওর ভারি আনন্দ; গ্রীষ্ম শেষ হইয়াছে, বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়াছে। পাখীর মধ্যে কোকিলই পণ্ডিত, আমি ইহাকে জিজ্ঞাসা করিব।

ওহে কোকিল, তুমি ত মদনের দূত, মান ভাঙাতে তোমার মত এ দুনিয়ায় আর কে আছে? হয় তাকে আমার কাছে এনে দাও, না হয় আমায় তার কাছে নিয়ে চল। কি বল্লে? আমি তাকে এত ভালবাসি, তবে সে কেন চ'লে গেল? শোন তবে, সে চটেছে; কিন্তু কেন, সে কথা আমি বলিতে পারি না। আমি তার কাছে এতটুকুও অপরাধ করি নাই। স্ত্রী ত স্বামীর প্রভু, যা খুসী করিতে পারে, অপরাধের অপেক্ষা তার নাই।

এ কি? কথা কইতে কইতে আপনার কাজে মন দিলে? পরের দুঃখ যতই বড় হউক, সেটা ঠাণ্ডা। নহিলে আমি এই এত দুঃখ জানাইতেছি, আমার কথায় কান না দিয়া কোকিলটা জামের ডাঁশা ফল চুষিতে লাগিল—মনে করিয়াছে বুঝি ওর প্রিয়ার অধর।

যা হোক, ওর স্বরটি বেশ মিষ্ট—যেন উর্বশীর কণ্ঠস্বর। ওর উপর রাগ করিয়া আব কি করিব? যাই, অন্য দিকে দেখি গে।

ডান দিকে যে নূপুরের শব্দ শুনিতেছি। প্রিয়া কি এই দিকে আসিয়াছেন? যাই, দেখি গিয়া। কিছু দূর গিয়া—ছি ছি! হাঁসের শব্দ, চারিদিক্ মেঘে কাল হইয়া গিয়াছে, হাঁসগুলা মানস-সরোবরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে, এ তাদেরই শব্দ, নূপুরের শব্দ নয়। যতক্ষণ ইহারা মানসে না চলিয়া যায়, তারি মধ্যে গিয়া জিজ্ঞাসা করি, তাঁর কোন খবর পাই কি না।

ওহে পক্ষিরাজ, মানস-সরোবরে এর পর যেয়ো। মুখে পথখরচের জন্য যে মৃণালখণ্ড লইয়াছ, তাহা একবার রাখ, অমায় উদ্ধার কর, আমায় তাঁর খবর দাও,

তার পর যেয়ো। সাধুলোক আপনার কাজের চেয়ে পরের উপকারকে গুরুতর বলিয়া মনে করেন।

যখন মুখ উচা করিয়া চারিদিকে চাহিতেছে, তখন বোধ হয় বলিতেছে—আমরা বড় ব্যস্ত, দেখিতে পাই নাই।

যদি তুমি পুকুরের পাড়ে তাহাকে নাই দেখিতে পাইয়াছ, তবে তুমি তাহার গতিটা সমস্তই চুরি করিলে কিরূপে ? তা হবে না, তুমি আমার কান্তাকে ফিরাইয়া দাও, তুমি তাহার ঠমকটা ত চুরি করিয়াছ, তখন তাহাকেও চুরি করিয়াছ। কোনও অংশ পাওয়া গেলে, চোরকে সমস্ত চোরাইমাল দিতে হয়, তা বুঝি জান না ? বাঃ! পাছে আমি রাজা—চোরের শাসন করি, তাই ভয়ে উড়িয়া গেল।

আবার খানিক ঘুরিয়া ফিরিয়া রাজা দেখিলেন, চক্রবাক ও চক্রবাকী বেড়াইতেছে। ভাবিলেন, এইবার ঠিক হইয়াছে, ইহার কাছে ঠিক খবর পাইব। ওহে চক্রবাক্, আমার ভালবাসার যে সামগ্রী ছিল, তাহার নিতম্বও চক্রের মত। সে আমায় ছাড়িয়া গিয়াছে। আমি বড় আশা করিয়া তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কোথায় গেল, বলিতে পার কি ?

এমন সময় চক্রবাক কক্ কক্ করিয়া উঠিল। রাজা ভাবিলেন, ও বোধ হয় আমায় চিনে না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছে 'কঃ কঃ' ? সূর্য্য ও চন্দ্র আমার মাতামহ আর পিতামহ; দুই স্ত্রী আমায় আপনি বরণ করিয়াছিল;—এক পৃথিবী, আর এক উর্ব্বশী।

বাঃ! এ যে চুপ করিয়া রহিল। তুমি ত ভারি মজার লোক হে! যদি চকী পদ্মের পাতার আড়ালে থাকে, তা হলেও তুমি সে কোথায় গেল, ভাবিয়া চীৎকার করিয়া দেশ মাতাইয়া তোল। গৃহিণীর উপর তোমার এতই টান যে, তুমি কিছুতেই তফাৎ থাকিতে পার না। আর আমি আমার ভালবাসার সামগ্রী হারাইয়া কাতর হইয়াছি, তুমি আমায় তাহার খবরটাও দিতে পারিলে না, এতে আর কি বলিব, আমার ভাগ্যই মন্দ।

যাই, এখানে ত হ'ল না, অন্য দিকে যাই। রাজা দু এক পা গিয়াই থম্‌কিয়া দাঁড়াইলেন। এই পদ্মফুলটা দেখিয়া আমি আর যাইতে পারিতেছি না। এটার ভিতর একটা ভ্রমর বন্ধ আছে, আর সেটা গুণ্ গুণ্ করিতেছে। আমি অধর দশংন করিলে সে যখন ফোঁস ফোঁস করিত, তখন তাহার মুখখানি ঠিক এই রকমই দেখাইত। আমি ঐ ভোমরাটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি। এখান থেকে চলে গেলে, এর পর হয় ত দুঃখ হবে, কেন তাকে জিজ্ঞাসা করি নাই ?

মধুকর! আমার গৃহিণীর চোখ দুটি মত্ত চকোরের মত, তুমি আমায় তাঁর খবর দাও!

অথবা সে সুন্দরীকে তুমি একেবারেই দেখ নাই। তার মুখের সুন্দর গন্ধ যদি পাইতে, তাহা হইলে কি আর এই পদ্মফুলটার উপর তোমার আস্থা থাকিত?

যা হোক, অন্য জায়গায় যাই। এই যে একটি হাতীর সঙ্গে হাতিনী কেলিকদম্ব-গাছের কাঁধে শুঁড় লাগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাড়াতাড়ি করিব না। হাতিনী শুঁড় দিয়া একটি টাট্‌কা কচি শল্লকীর ডাল ভাঙ্গিয়া উহাকে দিতেছে। আটায় মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। ও ডালটা বেচারা খাইয়া লউক, তাহার পর উহাকে বিরক্ত করিব। খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিলেন, হাতীর আহার শেষ হইল। তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওহে হাতী, তুমি আমার স্থির-যৌবনা প্রিয়তমাকে দূর হইতেও দেখিয়াছ কি?" এমন সময় হাতী গর্জ্জন করিয়া উঠিল। রাজা বড় খুসী; মনে করিলেন, বুঝি খবর দিবে। না হবে কেন? ও হ'ল হাতীর রাজা, আমি হলেম মানুষের রাজা, পরস্পর একটা টান ত আছেই। দেখ ভাই, আমি হলেম রাজাদের রাজা, তুমি হাতীর রাজা; তোমার দান অনবরত মোটাধারে ঝরিতেছে, আমার দানেরও বিরাম নাই; উর্ব্বশী আমার স্ত্রীলোকের মধ্যে রত্ন, তোমার হাতিনীও তোমার যূথের মধ্যে রত্ন। তোমায় আমায় তফাতের মধ্যে এই যে, আমি বিরহে কাতর, আর এ দুঃখটা তোমায় কখন সহিতে হয় নাই। তা ভাই, তোমরা সুখে থাক, আমি আমার কাজে যাই।

এই যে সুরভিকন্দর নামক একটি পাহাড় দেখা যাইতেছে, এটি বড় রমণীয় স্থান, অপ্সরারা ইহাকে বড় ভালবাসে। সেও ত অপ্সরা, সে কি ইহার কাছে কোথাও আছে? বলিয়া রাজা চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। কি কষ্ট! মেঘে যে সব ছাইয়া আছে, কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে যদি এক একটা বিদ্যুৎ ঝলপায়, তবুও কিছু দেখা যায়; তাও ত হয় না। যা হোক, পাহাড়টাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া যাইব না। ওহে গিরিরাজ! তোমার নিতম্ব ত বড় প্রকাণ্ড; তাহারও ত তাই। তাহার বুকে জায়গা নাই; দেহের যেখানে পাপ, তাহার সেইখানটাই নীচু। সে কি তোমার কোন বনে আশ্রয় লইয়াছে?

বাঃ! চুপ করিয়া রহিল যে? দূরে আছে বলিয়া বোধ হয় শুনিতে পায় নাই। কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করি।

গিরিরাজ, একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বামা এই বনান্তে কি তোমার চোখে পড়েছে? খানিক কান খাড়া করিয়া রাজা বলিলেন, বাঃ, কি বল্‌ছে! চোখে পড়েছে। বেশ, তবে হয় ত আরও ভাল খবর শুনিতে পাইব। তবে বল ত ভাই, সে কোথায়? কান খাড়া করিয়া শুনিলেন, সে কোথায়? ও সর্ব্বনাশ! এ ত প্রতিধ্বনিমাত্র, গুহামুখ হইতে প্রতিধ্বনি হইতেছে। রাজা হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িলেন;—বলিলেন, বড় ক্লান্ত হইয়াছি, এই ঝরণার ধারে ব'সে একটু তরঙ্গের বাতাস খাই।

এই নদীটি দেখিয়া আমার মন বড় প্রসন্ন হইতেছে। উর্ব্বশীই বুঝি আমার অপরাধের কথা মনে করিয়া মনের ঝাল ঝাড়িবার জন্য নদী হইয়া গিয়াছে; তাঁহার ভ্রূভঙ্গই নদীর তরঙ্গ হইয়াছে। হাঁসগুলা পার হইতে যাইতেছে, আর নদীর টানে তাহাদের সারিগুলি বাঁকিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝুলিতেছে, পাখীগুলা ভয় পাইয়া শব্দ করিতেছে, বোধ হইতেছে যেন চন্দ্রহার ঝন্‌ঝন্ করিতেছে। ফেনা হইয়াছে আর নদীর বেগে সরিয়া সরিয়া যাইতেছে; বোধ হইতেছে যেন শাদা কাপড় রাগের চোটে খসিয়া খসিয়া পড়িতেছে। পাথরের উপর জল আছড়াইয়া পড়িতেছে ও বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যাইতেছে, বোধ হইতেছে যেন রাগে চলিয়া যাইতে যাইতে উছট খাইয়া পড়িতেছে।

যাহা হউক, আমি উহার নিকট আমার প্রার্থনা জানাই। দেখ, আমি তোমার একান্ত অনুরক্ত। কখনও মিষ্ট ছাড়া কড়া কথা কই না। তুমি যা চাও, কখনও না বলি না, না বলিতে চাইও না; আমার কি অপরাধ দেখিলে যে, আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছ? আমি ত তোমার দাস।

হায় হায়! এটা দেখিতেছি সত্য সত্য নদী, নহিলে আমায় ছাড়িয়া দিয়া সমুদ্রের দিকে যাইবে কেন? সমুদ্রের নিকট অভিসার করিবে কেন? যাই হউক, কষ্ট না করিলে মঙ্গললাভ হয় না। যাই, সেইখানেই যাই—যেখানে উর্ব্বশী অদৃশ্য হইয়াছিলেন। যাইতে যাইতে রাজা বলিলেন, ভালই হইয়াছে, তিনি যে পথে গিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এই সেই লাল কদম-ফুলের গাছ, গ্রীষ্মের শেষে যাহার একটি ফুল তিনি আপনার মস্তকের ভূষণ করিয়াছিলেন, তখনও সব কেসর ফুটে নাই, উচু-নীচু হইয়াছিল। বাঃ! এই যে একটা হরিণ বসিয়া আছে, উহাকে একবার খবরের জন্য জিজ্ঞাসা করিয়া দেখি:—

উহার রঙ গাঢ় কাল। বনশোভা দেখিবার জন্য কাননশ্রী যেন আপনার কটাক্ষ ফেলিয়া রাখিয়াছেন। [কবিরা কটাক্ষকে কাল বলিয়া বর্ণনা করেন। মৃগের রঙ কাল, যেন কাননশ্রীর কটাক্ষ।]

কি, আমায় অবজ্ঞা করিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লইল! না না, মৃগী উহার নিকটে আসিতেছিল, মৃগশিশু স্তনপানের ইচ্ছায় উহাকে আসিতে দিতেছে না। তাই একদৃষ্টে গলা বাঁকাইয়া সেই দিকেই চাহিয়া আছে। অহে যূথপতি, আমার তাঁহাকে কি বনে দেখিয়াছ? তাঁহার লক্ষণ বলিয়া দিই, শোন। তোমার প্রিয়ার যেমন বড় বড় চোখ, তাঁহারও তেমনি। ইহাকেও দেখিতে যেমন সুন্দর, তিনিও তেমনি সুন্দর।

এ কি, আমার কথা শুনিল না, স্ত্রীর দিকেই চাহিয়া রহিল। হ'বেই ত—অবস্থা

খারাপ হইলে সকলেই অবজ্ঞা করে। আমি এখান থেকে—আগ্রহ সহকারে দেখিয়া ··· পাথরের ফাটালের মধ্যে এ কি দেখা যাইতেছে ? প্রভায় চারিদিক্‌ লেপিয়া ফেলিয়াছে। অথচ সিংহের মারা হরিণের মাংস ত নয়। আগুনের ফুল্‌কি হইবে কি ? তাহাও ত হইতে পারে না। কারণ, আকাশ হইতে এইমাত্র বেশ এক পসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। (ভাল করিয়া দেখিয়া) লাল অশোক-থোলোর মত একটি মণি। সূর্য্য যেন ইহাকে তুলিয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইতেছেন।

মণি আমার মন হরণ করিতেছে। তুলিয়া লই। অথবা তুলিয়া লইয়াই বা কি করিব ? কাহার মাথায় এ মণি দিব ? মন্দারফুলে সুগন্ধি যাহার মাথায় এই মণি দিব, তাহাকেই পাইতেছি না। কেন শুধু চোখের জলে এই এমন মণিটি মলিন করিব ?

রাজা এই কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় কে নেপথ্য হইতে বলিয়া দিল,—'বৎস, এই মণি তোমাদের মিলন করাইয়া দিবে। পার্ব্বতীর পায়ের আল্‌তায় এই মণির উদ্ভব; কাছে রাখিলে শীঘ্রই তোমার বাঞ্ছিতকে পাইবে।'

রাজা কান খাড়া করিয়া এই সকল কথা শুনিলেন ও বলিলেন, "আমায় এ উপদেশ কে দিতেছেন, বোধ হয়, কোনও মুনি এ কথা বলিলেন। ভগবান্‌, আপনি উপদেশ দিয়া আমার যথেষ্ট উপকার করিলেন।" মণিটি তুলিয়া লইয়া রাজা বলিলেন,— "হে মণি, তোমার কল্যাণে যদি আমি তাহাকে পাই, তাহা হইলে, শিব যেমন চন্দ্র-কলাকে আপনার শিরোভূষণ করিয়াছেন, আমিও তেমনই তোমাকে আমার শিরোভূষণ করিব।"

কিছু দূর গিয়া রাজা একটি লতা দেখিলেন, তাহাতে একটিও ফুল নাই, তথাপি দেখিয়াই তাহার প্রতি তাঁহার বড়ই ভালবাসা হইল। বলিলেন, "লতাটি যেন উর্ব্বশী। মধুকরের শব্দ নাই, লতাটি নিঃশব্দ হইয়া রহিয়াছে। আমি পায়ে ধরিলেও আমায় ত্যাগ করিয়া গেছেন বলিয়া যেন উর্ব্বশী পস্তাইতেছেন ও চিন্তায় চুপ করিয়া আছেন। ফুলের সময় চলিয়া গিয়াছে বলিয়া ইহার একটিও ফুল নাই। মানিনী উর্ব্বশী যেন সমস্ত আভরণ ত্যাগ করিয়া শূন্য হইয়া বসিয়া আছেন। মেঘের জলে লতার সব কচি পাতাগুলি ধুইয়া গিয়াছে। চোখের জলে প্রিয়ার যেন ঠোঁট দুটির লাল রঙ ধুইয়া গিয়াছে। এটি ত ঠিক আমার প্রিয়ারই মত, আমি উহাকে আলিঙ্গন করিব।" বলিয়া লতাকে আলিঙ্গন করিলেন। তখনই লতাটি উর্ব্বশী হইয়া গেল। রাজা তাঁহার স্পর্শসুখ লাভ করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। বলিলেন, "এ ঠিক যেন উর্ব্বশীরই স্পর্শ। আমার শরীর জুড়াইয়া গেল। কিন্তু বিশ্বাস নাই। কতবার 'এই উর্ব্বশী' 'এই উর্ব্বশী' বলিয়া মনে করিয়াছি, আবার তখনই

তাহা অসম্ভব হইয়া গিয়াছে ; অতএব সহসা চক্ষু খুলিব না।" অনেকক্ষণ থাকিয়া চক্ষু খুলিলেন ; দেখিলেন, তাঁহার আলিঙ্গনে উর্ব্বশী।

উর্ব্বশী রাজাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "এটি কার্ত্তিকের বাগান। তিনি চির-কুমার। সুতরাং স্ত্রীলোকের এ বাগানে প্রবেশ নিষেধ। যে প্রবেশ করিবে, তখনই সে বেড়ার লতা হইয়া যাইবে। আমি রাগে এ সব কথা ভুলিয়া বাগানে ঢুকিতে গিয়া লতা হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার সকল ইন্দ্রিয়ই ঠিক ছিল ; আপনি যাহা যাহা করিয়াছিলেন, সবই দেখিয়াছি। গৌরীর আল্‌তায় যে মণি হইয়াছে, সেই মণি আপনার সঙ্গে ছিল, তাহারই স্পর্শে আমি আবার যা ছিলাম, তাই হইয়াছি। নিয়ম এই যে, ঐ মণিই লতাকে ফের মানুষ করিতে পারে।" রাজা এই সকল কথা শুনিয়া মণির যথেষ্ট আদর করিলেন। উর্ব্বশী মণিটি লইয়া মাথায় রাখিলেন। উর্ব্বশীর মুখখানি প্রভাত-সূর্য্যের আলোর নূতন ফোটা পদ্মের মত শোভা পাইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রাজা ও উর্ব্বশী মেঘে চড়িয়া রাজধানী প্রয়াগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বিক্রমোর্ব্বশীর চতুর্থ অঙ্কটা বোধ হয় মেঘদূতের উপর টেক্কা। কালিদাস আপনারই উপর আপনি টেক্কা দিয়াছেন। যক্ষদের প্রণয়ই প্রাণ। যক্ষদের বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস কুমারসম্ভবে বলিয়াছেন :—তাহাদের বয়স যৌবনেই শেষ হয় অর্থাৎ তাহাদের প্রৌঢ়-বৃদ্ধাবস্থা নাই ; কুসুমায়ুধ ছাড়া তাহাদের অন্তক নাই অর্থাৎ তাহারা যে জীবনে কষ্টটুকু পায়, সেটুকু বিরহেরই কষ্ট ; তাহাদের চেতনা যায় কখন্‌—যখন তাহারা স্ত্রীসম্ভোগে ক্লান্ত হইয়া পড়ে। মেঘদূতেও কালিদাস বলিয়াছেন :—আনন্দ ভিন্ন অন্য কোনও কারণে তাহাদের চক্ষে জল পড়ে না ; কুসুমশরের তাপ ভিন্ন তাহাদের আর তাপ নাই—সে তাপও ভালবাসার জিনিস পেলেই মিটিয়া যায় ; তাহাদের বিচ্ছেদও প্রণয়-কলহ ভিন্ন অন্য কোনও কারণেই জন্মায় না ; যৌবন ভিন্ন তাহাদের অন্য বয়সও নাই। কালিদাসের মেঘদূতের এই কবিতাটি কেহ কেহ প্রক্ষিপ্ত বলেন বলিয়াই কুমার সম্ভবের শ্লোকটিও উদ্ধার করিতে হইল। যক্ষ অপরাধ করিয়াছিল, রাজকাজে অবহেলা করিয়াছিল, তাই রাজা তাহাকে বিরহ-সাজা দিয়াছিলেন। যে হেতু, বিরহ ভিন্ন তাহাদের অন্য সাজাই নাই। বিরহের মেয়াদ এক বৎসর। সেই মেয়াদের মধ্যে মেঘ দেখিয়া যক্ষ পাগলপারা হইয়া যায় ; মেঘকে মানুষ বলিয়া মনে করে ও তাহাকে দিয়া আপনার স্ত্রীর কাছে "আমি বাঁচিয়া আছি" এই খবর দিবার চেষ্টা করে। মেঘদূতে এই পর্য্যন্ত।

বিক্রমোর্ব্বশীতে কালিদাস অতি প্রাচীন কালে গিয়াছেন, সৃষ্টির এক রকম গোড়ায়। ব্রহ্মা প্রথম মন হইতেই সৃষ্টি করিতেন। প্রজাপতিরা তাঁহার মনের সৃষ্টি। দুই তিন পুরুষ এইরূপ গেলে স্ত্রীপুরুষ-সংযোগে সৃষ্টি আরম্ভ হয়। পুরূরবা সেই সময়ের লোক, তাঁহার পিতামহ চন্দ্র ও মাতামহ সূর্য্য। বলিতে গেলে সৃষ্টির প্রথম মানুষই তিনি। কারণ, তাঁহার পিতা বুধ দেবতা। কালিদাসের বড় বুকের পাটা, তাই তিনি প্রথম মানুষের প্রণয় ও বিরহ দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অন্য কবি হইলে ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়িতেন। এ প্রণয়ের পাত্র পৃথিবীতে মিলিল না। স্বর্গ হইতে অপ্সরা ধরিয়া আনিতে হইল। সেও বোধ হয়, প্রথম অপ্সরা-সৃষ্টির প্রধান অপ্সরা। এই দুই জনের প্রণয় ও বিরহ বর্ণনা করিতে গিয়া কালিদাস অদ্ভুত গুণপনা দেখাইয়াছেন। প্রণয়ের কথা এবার বলিব না; বিরহের কথাই বলিব। অদ্ভুত উপায়ে বিচ্ছেদ। এই দুটিতে এক হইয়া আছে—হঠাৎ একজন অদৃশ্য হইয়া গেল। যে রহিল, সে একেবারে পাগল হইয়া গেল। স্বভাবের অনুপম শোভার মধ্যে সে তাহার ভালবাসার সামগ্রী খুঁজিতে লাগিল। প্রথম মেঘের কোলে সৌদামিনী দেখিয়া মনে করিল, এই উর্ব্বশী, কাল প্রকাণ্ড রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। মেঘ পাহাড়ের ডগা ছাড়াইয়া উঠিল, সে মনে করিল, রাক্ষস পলাইতেছে। মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, সে ভাবিল, রাক্ষস শত শত বাণ বর্ষণ করিতেছে। ক্রমে মোহ ভাঙ্গিয়া গেল, দেখিল, মেঘ, বিদ্যুৎ, পাহাড়, আর জলের ধারা।

তাহার পর একটি ভুইচাঁপা ফুল দেখিল। পাঁপড়িগুলি একটু লাল, উপর হইতে জল পড়িয়া ফুলটি ভরিয়া রহিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন উর্ব্বশীর চোখ, রাগে চোখের কোণ একটু লাল হইয়াছে, আর জলে চোখ ভরিয়া গিয়াছে। আবার একটা নদী দেখিল; মনে হইল, তাহার শরীর। ছোট ছোট তরঙ্গ উঠিতেছে। মনে হইল, যেন রাগে তাহার ভ্রূ ভাঙিয়া গিয়াছে। হাঁসগুলা সারি বাঁধিয়া নদী পার হইতেছে, নদীর তোড়ে সে সারি বাঁকিয়া যাইতেছে, আর হাঁসগুলা প্যাঁক্ প্যাঁক্ করিয়া শব্দ করিতেছে। বোধ হইল যে, তাহার চন্দ্রহার মাঝখানে বাঁকিয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে, আর তাহাতে ঝুন্ ঝুন্ করিয়া শব্দ হইতেছে। ফেনা উঠিতেছে, বোধ হইতেছে যেন, কাপড় টানিয়া লইয়া যাইতেছে। পাথরে পথের জল আছড়াইয়া পড়িতেছে, বোধ হইতেছে যেন, রাগে চলিতে চলিতে পদস্খলন হইতেছে। কিন্তু শেষ জানা গেল, সেটা স্ত্রী-লোক নহে—নদী।

আবার একটা লতার কাছে গেল। বৃষ্টির জলে তাহার সব কচি কচি পাতাগুলি ধুইয়া গিয়াছে; বোধ হইল যেন, ঠোঁটের উপর যে লাল রঙ করা ছিল, চোখের জলে

তাহা ধুইয়া গিয়াছে। এ ফুল ফুটিবার সময় নহে, সুতরাং একটি ফুল নাই। রাজা মনে করিলেন, যেন রাগ করিয়া সে গহনা ফেলিয়া দিয়াছে। ফুল নাই, ভোমরা আর শব্দ করে না; মনে হইল যেন, মানিনী মানভরে চুপ করিয়া আছে; যেন ভাবিতেছে, কেন মান করিলাম, এত সাধিল, কেন তারে ফেলিয়া আসিলাম?

এই ত এক রকম পাগ্‌লামী, আর এক রকম পাগ্‌লামী যাকে তাকে জিজ্ঞাসা করা—"ওগো, আমার তাকে তুমি দেখেছ কি?" একবার ময়ূরকে জিজ্ঞাসা করিল,—কোন জবাব নাই। একবার হাঁসকে জিজ্ঞাসা করিল;—জবাব নাই। একবার হাতীকে জিজ্ঞাসা করিল;—জবাব নাই। পাহাড়কে জিজ্ঞাসা করিল;—জবাব নাই। জবাব না পাইলে রাগ হইতেছে, ক্ষোভ হইতেছে, আপনাকে ধিক্কার দিতেছে, অদৃষ্টের নিন্দা করিতেছে। একবার কোকিলাকে জিজ্ঞাসা করিল, সে মন দিয়া রাঙা রাঙা জাম চুষিয়া খাইতে লাগিল। এবার তাহার উপর রাগ নাই—"আহা, তোমার গলার স্বর আমার তাঁর মত, তোমার উপর রাগ করিব না।" একবার চক্রবাককে জিজ্ঞাসা করিল, সে "কঃ কঃ" করিয়া উঠিল। অমনি পাগল বলিল,—"কি, আমি কে, জান না তাহা? 'তুমি কে, তুমি কে' জিজ্ঞাসা করিলে? আমার ঠাকুরদাদা চাঁদ, আর সূর্য্য আমার দাদামহাশয়।" এইরূপে কত যায়গায় কত রকম পাগ্‌লামী করিল। হাঁসকে বলিল, "তুমি চোর, তুমি তাহার ঠমক চুরি করিয়াছ। চোরাই মালের কোন অংশ পাওয়া গেলে সবটাই চুরি করিয়াছ বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। তুমি আমার তাঁকে আনিয়া দাও।" আবার পাগ্‌লামী—বলিল, "আমি রাজা, আমার হুকুম, বর্ষাকালে তুমি আসিও না।" আবার কি মন গেল, বলিল, "আহা, তুমি এস, এস, আমি রাজা, আমি এই বনে একা, তোমা হ'তে আমার রাজচিহ্ন সব পাওয়া যাইবে—চাঁদোয়া, ছাতা, চামর তুমিই দিতেছ।"

এই সমস্ত পাগ্‌লামীটি—এটা একটা সৌন্দর্য্যের খনি। পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে যে সুন্দর জায়গা, কালিদাস রাজাকে আর উর্ব্বশীকে সেইখানে লইয়া গিয়াছেন। দুটিতে এক হইয়া থাকিলে ত পরস্পরের সৌন্দর্য্যে দুজনেই ডুবিয়া থাকে, তাই কিছু-কালের জন্য একটিকে সরাইয়া আর একটিকে দিয়া সেই সৌন্দর্য্যটুকু প্রকাশ করিয়া দিলেন। সমস্ত সৌন্দর্য্যের পিছনে একটা উৎকট দুঃখের ছায়া।

যক্ষ বিরহে পড়িয়া মেঘকে দূত করিয়াছিল। রাজা বিরহে পড়িয়া মেঘকে রাক্ষস করিলেন। আবার যখন মিলন হইল, তখন দুজনে সেই মেঘে চড়িয়া প্রয়াগে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে আপনাদের রাজধানীতে গেলেন। কালিদাসের হাতে মেঘবেচারার নানা অবস্থা হইল।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

আষাঢ়, ১৩২৪ সাল

সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	ধর্ম্ম-প্রচারে রবীন্দ্রনাথ	...	শ্রীঃ — ...	৫৬৫
২।	নিঝুম-রাতে (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত জ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ বি, এ,	৫৬৯
৩।	আদি-রস	...	শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ...	৫৭০
৪।	উত্তরাধিকারী	...	শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	৫৭৮
৫।	শ্রীমঙ্গল-রসকারিকা	...	শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	৫৮৮
৬।	মানস-বৃন্দাবন (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত জ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়	৫৯৫
৭।	কমলের-দুঃখ	...	শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত ...	৫৯৬
৮।	শ্যাম না এল (কবিতা)	...	শ্রীন— ...	৬০৮
৯।	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	৬১০
১০।	অচেনা দূতী (কবিতা)	...	শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায় চৌধুরী	৬২১
১১।	কোমলে কঠোর	...	শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৬২৩
১২।	একটি মোকর্দ্দমার রায়	...	শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ	৬২৯
১৩।	দুনিয়ার দুদিন	...	শ্রীজগদম্বা দেবী	৬৩৮
১৪।	রূপান্তর	...	শ্রীচিররঞ্জন দাশ	৬৪২
১৫।	মাইকেল মধুসূদন দত্ত	...	শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়	৬৪৪

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"বসুমতী" প্রেসে,—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা] [আষাঢ়, ১৩২৪

ধর্ম্ম-প্রচারে রবীন্দ্রনাথ

কিছুদিন পূর্ব্বে জাপানের একটি মত উদ্ধৃত করিয়া আমরা দেখাই যে, পাশ্চাত্যে অথবা পাশ্চাত্যভাবে প্রভাবান্বিত প্রাচ্যে কবি রবীন্দ্রনাথ যে সর্ব্ববাদিসম্মত প্রশংসা পাইয়াছেন, প্রচারক রবীন্দ্রনাথ কিন্তু তেমনটি পাইতেছেন না। কর্ম্মজগতের জন্য তিনি যে তন্ত্র ব্যবস্থা করিতেছেন, অনেক মনীষীই তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না কেন, এই কথাটিই এবার আমরা একটু তলাইয়া দেখিতে চেষ্টা করিব। প্রথমেই আমাদের মনে রাখা উচিত যে, রবীন্দ্রনাথ হইতেছেন কবি। আর কবির যাহা সাধারণ দোষ, তাহা যে রবীন্দ্রনাথে পাইব, ইহা কিছু আশ্চর্য্যের নয়। কবির দোষ কল্পনাপ্রিয়তা। কিন্তু যে কবি শুধু কল্পনাপ্রিয় নহেন, কল্পনাকে সত্যের মধ্যে—ভবিষ্য-দৃষ্টির মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছেন, সে কবিও দোষমুক্ত নহেন। কবির প্রকৃতিই হইতেছে একটি দিক্—একটি ভঙ্গিমার সত্যটি উপলব্ধি করা। তাঁহার দৃষ্টি যতই গভীর হউক না, প্রধানতঃ তাহা খণ্ড অনুভূতি, তাহা চলিয়াছে ঋজুরেখায়। যে জিনিসটিকে তিনি ধরেন, তাহাকে আবেগভরে আলিঙ্গন করেন, তাহার মধ্যে জগতের যতটুকু, সেইটুকুকেই স্ফুট, বিরাট্, জাজ্বল্যমান করিয়া তুলেন। কিন্তু অবশিষ্ট যাহা কিছু, সে সব তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত, অথবা একেবারে বহির্ভূত না হইলেও গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে প্রতিবিম্বিত মাত্র। রবীন্দ্রনাথেরও ভুল এইখানেই যে, তাঁহার কবি-অনুভূতিটিকে কর্ম্ম-জগতে সর্ব্বস্ব করিয়া লইয়াছেন, জগতের সমস্তখানিকে আলিঙ্গন করিবার পক্ষে তাহাকেই পর্য্যাপ্ত বলিয়া মনে করিয়াছেন।

জগৎকে কিন্তু কখনও একটি সংজ্ঞার মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না, সৃষ্টিরহস্য একটিমাত্র কোন মন্ত্রের দ্বারাই ব্যাখ্যাত হয় না, মানুষকেও একটি মানদণ্ড অনুসারে কাটিয়া ছাঁটিয়া খাড়া করা চলে না। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হইতেছেন মিত্রদেব, তাহার মন্ত্র প্রেম—করুণা, মৈত্রী, সামঞ্জস্য, সম্মেলন, সুষমা, সৌন্দর্য্য, আলো, আকাশ, মলয়বাতাস। কিন্তু সৃষ্টির জীবনের মানুষের এ একটা দিক্ মাত্র—যতই আবশ্যকীয় মহনীয় হউক না কেন, তবুও একটা দিক্ মাত্র। রবীন্দ্রনাথ যে দিক্‌টি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই, তাহা হইতেছে শক্তি—বীর্য্য, তেজ, যুদ্ধ, সংঘর্ষ, ধূলি, ঘনঘটা, ঝঞ্ঝা, রুদ্রের বিভূতি। সৃষ্টির মানুষের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা কেবল প্রেমের মধ্যেই নয়, শক্তির মধ্যেও। আধুনিক যুগে শক্তিকে কেন্দ্র করিয়া তাহারই অভিব্যঞ্জনায় জগতের ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন নীট্‌স। নীট্‌সও একটি অঙ্গেরই উপর, একটি তত্ত্বেরই উপর সমস্ত জোর দিয়াছেন, তাই সেই ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ। শুধু অসম্পূর্ণই নয়, দোষযুক্ত। তিনি শক্তিকে ধরিতে গিয়া শক্তির যে সকল আনুসঙ্গিক বিকৃতি, তাহাকেও নিত্যবস্তু করিয়া লইয়াছেন। মানুষকে বীর শক্তিমান্ হইতে উপদেশ দিয়াছেন; কিন্তু সেই সঙ্গে মদ, মাৎসর্য্য, ক্রূরতা, অত্যাচারপ্রিয়তা এ সকল বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই। ঠিক সেই-রূপই রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন প্রেমের সুষুমাটি দিয়া মানুষকে গড়িতে। কিন্তু প্রেমের সাথে আসিয়া পড়িয়াছে প্রেমের বিকার—অতিমাত্র নমনীয়তা কমনীয়তা, কেমন একটি সামর্থ্যের অভাব। সামঞ্জস্য প্রীতির উপর লোভের সঙ্গে আসিয়াছে দ্বন্দ্বমাত্রেরই প্রতি অবজ্ঞা, পৃথিবীর কণ্টকাকীর্ণ ধূলি-ধূসরিত পথে চলিতে কেমন এক অস্বস্তি। রাজসিক নীট্‌স অশুদ্ধতার ফলে যেমন পশু-জগতের প্রতি হেলিয়া পড়িয়াছেন, সাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথও তেমনি পরীর দেবতা এঞ্জেলের জগতের প্রতি অতিমাত্র পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। কেহই—নীট্‌সও নয়, রবীন্দ্রনাথও নয়—মানুষকে, মানুষের প্রয়োজন প্রেরণাকে অখণ্ড উদার দৃষ্টিতে দেখিতে পারেন নাই।

নবযুগের মূলমন্ত্র হইতেছে "জীবন"—রবীন্দ্রনাথ এই জীবনেরই উপাসক, তাঁহার নিকট হইতে এই শিক্ষাটিই আমরা লাভ করিয়াছি। পুরাতন সন্ন্যাসের—বৈরাগ্যের—সমাধির মন্ত্র ছাড়িয়া তিনি আমাদিগকে "অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মুক্তির স্বাদ" পাইতে উদ্‌যুক্ত করিয়াছেন। পার্থিব জগতের মধ্যে, সকল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে জীবনরস গ্রহণ করা, কর্ম্মজীবনের শত বৈচিত্র্যের মধ্যেই আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করা—রবীন্দ্রনাথের ইহাই লক্ষ্য। নব্যভারত, বিশেষতঃ নব্যবাঙ্গলা এই জন্যই তাঁহাকে একজন নেতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু জীবনের ব্যাখ্যা দিতে যাইয়া তিনি যে সঙ্কীর্ণতাটুকু আনিয়া ফেলিয়াছেন, জীবনের সাধনায়ই অতি প্রয়োজনীয়

অঙ্গগুলির উপর তিনি যে তাচ্ছিল্য বা বিরক্তি দেখাইয়াছেন, সেইটুকু আবার বিশেষ-রূপে নির্দ্দেশ করা আমরা আবশ্যক মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ চাহিয়াছেন সেই জীবন—যাহা আনন্দপূর্ণ, স্বস্তিপূর্ণ, শান্তিপূর্ণ, যেখানে দ্বন্দ্ব নাই, বৈপরীত্য নাই। বিশ্বমানব অন্তরে অনুভব করিয়াছে প্রেমময় ভগবান্, সকলে সকলের সহিত নিরবচ্ছিন্ন মিলনসূত্রে সংগ্রথিত, ভুলিয়া গিয়াছে ধর্ম্মগত জাতিগত দেশগত বিরোধ-বৈষম্য, সকলে চলিয়াছে সৌন্দর্য্যের সৌরভের পূজা করিয়া, এক অপূর্ব্ব ভাবাবেশে মুগ্ধ হইয়া। আদর্শ-জীবনে এ সকলেরই স্থান আছে। কিন্তু কেবল ঐটুকু বলিলেই তাঁহার সব কথাখানি বলা হইল না। আমরা যেন অনুভব করি, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ চাহেন, বৈচিত্র্য চাহেন, কিন্তু যতদূর পারেন, সে সকলকে সন্ন্যাসীর শান্ত নিশ্চল দ্বন্দ্বাতীত ব্রহ্মেরই নিকটে লইয়া গিয়াছেন। তপঃশক্তির বীর্য্যের বিক্রমের রেশ মানুষ যে অনুভব করিতেছে, রবীন্দ্রনাথ তাহার একটা যথার্থ স্থান দিতে পারিতেছেন না। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সঙ্ঘে সঙ্ঘে যে সংঘর্ষ, যে বৈরি-ভাব, তাহা কি কেবলই হেয়, কেবলই মোহের খেলা, তাহার অন্তরে কি কোন সত্য বস্তুই নাই? ব্যক্তির সঙ্ঘের দেশের জাতির যে স্বাতন্ত্র্য, যে ভাগবত একটা প্রাণ আছে, আমরা তাহা বিশ্বাস করি। আদর্শ-জীবনের মহা সম্মেলন আর বর্ত্তমানের সংঘর্ষ-বিসংবাদ এই দুয়ে একটা নিগূঢ় যোগ আছে; শুধু যোগ নয়, একটা ঐক্যই আছে। আমরা বলি, বর্ত্তমানের দ্বন্দ্বকে চাপা দিয়া বা পিষিয়া দূর করা উচিত নয়। তাহাকে ফুটিয়া উঠিতে দিয়া, সকল ব্যষ্টিরই আত্ম-স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ প্রসারে মহাসামঞ্জস্যটিকে বৈচিত্র্যময় করিয়া তুলিতে হইবে। নতুবা জীবন পাইতে পারি, কিন্তু জীবনকে সমরসের এক শান্ত ক্লীব ভাবুকতা দিয়াই ভরিয়া তুলিব। তার পর বর্ত্তমান জগতের যে অতিমাত্র কর্ম্মবহুল জীবন—তাহার স্থূল দৃষ্টি, তাহার বৈশ্য-ধর্ম্ম, তাহার উদ্‌ভ্রান্ততা, ত্রস্ততা, মত্ততা লইয়া যতই কুৎসিত হউক না কেন, কিন্তু তাহারই মধ্যে রহিয়াছে সজীবতা, জীবনকে—জগৎকে তীব্রতরভাবে স্পষ্টতরভাবে আলিঙ্গন করিবার প্রয়াস, শক্তির খেলাকেই মূর্ত্তিমান্ করিয়া তুলিবার ইঙ্গিত, জাগতিক প্রতিষ্ঠানকে নিত্য নব নব সৃষ্টি দিয়া ফলপ্রসূ করিবার মহান্ আয়াস। রবীন্দ্রনাথ যে জীবনের ছবি আঁকিতেছেন, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে পড়ে, শান্তরসাস্পদ, বিঘ্নবিরহিত লোকালয়ের মলিনতাহীন আশ্রম কুটীরখানি।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথকে ঠিক এই ভাবে লইতে অনেকে স্বীকার পাইবেন না। তাঁহারা দেখাইয়া দিবেন, রবীন্দ্রনাথ সমাজের, ধর্ম্মের ভণ্ডামীর সহিত কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহার বিদ্রূপবাণী, তাঁহার অট্টহাস কত ক্ষেত্রে কত ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, স্বদেশীর যুগে তাহার অগ্নিময় বাক্যেই না বাঙ্গালী বালক নাচিয়া উঠি-

য়াছে? আর আজ যে ইউরোপে তিনি প্রচারকার্য্যে লিপ্ত—তাহা কি সমস্ত ইউ-রোপীয় শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা নয়? আমরা বলি, এ সকলে এইটুকু প্রমাণ হয়, যুদ্ধ করিবার একটা সহজ প্রেরণা—ক্ষাত্রশক্তি, মানুষের মধ্যে কি সত্যকার বস্তু। কথায় অস্বীকার করিতে যাইয়া ভঙ্গিমায় রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রকটিত করিয়া ফেলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন শঙ্করের কথা--ইহবিমুখ সন্ন্যাসী—যিনি আ-হিমালয় কুমারিকা বিধ্বস্ত করিয়া প্রচার করিতেছেন, তিনি নৈষ্কর্ম্য; কিন্তু প্রকৃত কথা হইতেছে, রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বে সংঘর্ষের ব্যাখ্যা নাই, দ্বন্দ্বের যে কি প্রয়োজনীয়তা, কি অব্যর্থতা, তাহার যথাযথ নির্দ্দেশ নাই। এমন কি, আমরা বলিতে পারি, কর্ম্মেরও স্থান নাই। কর্ম্ম হইতেছে তপঃশক্তির জাগ্রত প্রয়োগ—রবীন্দ্রনাথ মনে করিবেন, তাহার অব্যর্থ ফল দ্বেষ, হিংসা, ক্রূরতা পাশবিকতা। তিনি চাহেন রসভোগাত্মক কর্ম্ম। তিনি জীবনের যে কিছু বৈচিত্র্য চাহেন, তাহা মিলনেরই নানা ভাবের রসাস্বাদন। আমরা এ সকলই স্বীকার করি। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠা মাত্র, ইহা অন্তরের একটা ভাব বা অবস্থা। কিন্তু ইহাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া, এমন কি, ইহাকে অটুট স্ফুট স্থিরপ্রতিষ্ঠ রাখিবার জন্যই—আমরা সকল দ্বন্দ্ব, সকল সংঘর্ষ, সকল পার্থিব ধূলিমলিনতায় লিপ্ত হইতে শঙ্কান্বিত হইব না বা দ্বিধা-বোধ করিব না। কারণ, দ্বন্দ্ব তখন শুধু দ্বন্দ্ব নয়, সংঘর্ষ তখন শুধু সংঘর্ষ নয়, পৃথিবী শুধুই পৃথিবী নয়। এ সকলের মধ্যে একটা উচ্চতর ক্ষেত্রেরই পরিপূর্ণ প্রেরণা খেলিতেছে দেখিব।

এ কথা সত্য, স্বদেশীর যুগে রবীন্দ্রনাথে আমরা দেখিয়াছিলাম কিছু অগ্নির খেলা, কিন্তু বাতাসের প্রথম প্রকোপেই তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। সে একদিন ছিল—মূকও যে দিন বাচাল হইয়া উঠিয়াছিল, পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘিতে চেষ্টা করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও রুদ্রদেবতার আবির্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, রবীন্দ্র-নাথ অতিমাত্র কবি। সৌন্দর্য্য সুষমা নমনীয়তা কমনীয়তার আস্বাদ তিনি অতিমাত্র পাইয়াছেন। কৃষ্ণের বংশী তাঁহাকে মোহিত করিয়াছে। কিন্তু কালী যে কৃষ্ণেরই আর এক ভঙ্গিমা—সে করাল মূর্ত্তিতে যে কি সৌন্দর্য্য, কি মহিমা, কি নিত্য-সত্য, তাহা তিনি সম্যক্ দেখিতে চাহেন নাই। হইতে পারে, ইউরোপে তাঁহার শান্তিপ্লুত বাণীর প্রয়োজন আছে। কেবল ইহপরায়ণ ভোগমত্ত দন্তনখর-রক্তাক্ত সে রাক্ষসের দেহে অতি-জগতের সৌরভ-প্রলেপ প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ কথা-টুকুও মনে রাখা আবশ্যক, পশু হউক, পিশাচ হউক, রাক্ষস হউক, অসুর হউক, পূর্ণজীবনে, সিদ্ধের জীবনে এ সকল রকম প্রকৃতিরই স্থান আছে, সকলেরই একটা অব্যর্থ সামঞ্জস্য আছে। জীবনের কোন বিভূতি—অহঙ্কারবশে আমাদের কাছে তাহা যতই অপ্রিয়, যতই কদাকার বোধ হউক না কেন—মায়া নহে, মতিভ্রম নহে।

প্রকৃত কর্ম্মী যিনি, তিনি জীবনের যে নয়ন-মনোবিভ্রান্তকারী চঞ্চলতা, তাহাতে পরিশ্রান্ত বোধ করিবেন না, সকল অবাঞ্ছনীয় জিনিসের মধ্যে থাকিতেও অস্বস্তি বোধ করিবেন না। সেখান হইতে ছুটিয়া জনতা হইতে দূরে প্রকৃতির কোলে মুক্ত স্নিগ্ধ আকাশতলে ভগবানের সৌম্যমূর্ত্তিটিরই ধ্যানে তৃপ্ত থাকিবেন না। দ্বন্দ্ব বাঞ্ছনীয় জিনিস না হইতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্ব দেখিয়াই যে শিহরিয়া উঠা, তাহাও কিছু বাঞ্ছনীয় নহে। অহঙ্কার, ক্রূরতা, ব্যসন আদর্শ-জিনিস না হইতে পারে, কিন্তু প্রীতি পরার্থপরতা সাত্ত্বিকতার আবরণে একটি জিনিস আমাদিগকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করে—গীতাকার তাহার নাম দিয়াছেন ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য, কার্পণ্যদোষ—সে জিনিসটির বিরুদ্ধে আমাদিগের সাবধান থাকা উচিত। অর্জ্জুনের মত মহাকর্ম্মীর মধ্যেও এ ভাব স্থান পাইয়াছিল—সেটুকু দূর করিতে শ্রীভগবানের কতখানি আয়াস করিতে হইয়াছিল! আমরা ত মনে করি, আদর্শ-মানুষ যিনি, আদর্শ-মনুষ্যত্বের সাধক যিনি, তিনি জগতের সমস্ত দ্বন্দ্বে গা ঢালিয়া দিয়া, জীবনের শত অসুন্দর ব্যাপারের কাদা-মাটীতে লিপ্ত হইয়া তাহারই মধ্য হইতে নিজের অন্তরে বাহিরের জগতে একটা উচ্চতর মহত্তর সুন্দর সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন সৃষ্টি করিয়া চলিবেন।

শ্রী :—

নিঝুম-রাতে

নিঝুম রাতে আমার হাতে কাঁপে পরশ তার,
আমার, নিঘুম চোখের আলোক বেয়ে তাহার অভিসার।
দিনে আমার দৈন্য-মাখা, মুখটি থাকে ঘোমটা ঢাকা,
রাতে সিঁথে তারা আঁকা জ্বলে মাণিক-হার।

ঝিমি-ঝিমি কাঁকন বাজি ভরে আমার প্রাণ
অসাড় আঁধার-হৃদয়-তারে অনাহত গান।
বুকে আমার মুখটি ঢাকি, শ্বাসিয়া উঠে থাকি থাকি,
নিবিড় তাহার কালো আঁখি ঘেরে চারি ধার।

শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ বি, এ।

আদি-রস

ভয় বস্তুটা অধিকাংশ স্থলেই অজ্ঞতামূলক। যে সকল জানে, তার কোনও ভয় থাকে না। প্রাচীনেরা বিশ্বের সাকল্যকে আনন্দ বলিতেন। অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান—এ সকল খণ্ড-তত্ত্ব। পরিপূর্ণ তত্ত্ব, পরম তত্ত্ব, আনন্দ-বস্তু। এই বস্তুকে আনন্দ-ব্রহ্মও বলা হয়। এই বস্তু ব্রহ্মের আনন্দ।

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আনন্দ হইতে ভূতগ্রাম উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া আনন্দের দ্বারা জীবিত রহে, অন্তিমে আনন্দেতে প্রবেশ করে। এই আনন্দই সৃষ্টিমূল। এই আনন্দই বিশ্বের আদি, মধ্য এবং অন্ত। এই আনন্দই বিশ্বের সাকল্য। এই জন্য এই আনন্দকে বা সাকল্যকে যে জানে, সে কখনও কাহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় না।

এই আনন্দ-বস্তুকে বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না। অন্তরিন্দ্রিয় মনও ইহাকে মনন করিয়া শেষ করিতে পারে না। এ বস্তু ইন্দ্রিয়াতীত, শুদ্ধ অপরোক্ষ অনুভূতি-গ্রাহ্য।

এই **আনন্দই** আদি-রসের প্রাণ। উপনিষদ এই জন্যই নরদম্পতীর যৌন-সম্বন্ধের আনন্দের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে ব্রহ্মানন্দের সজাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

এই তত্ত্বটি যাঁহারা বুঝেন, তাঁহারা আদিরসাশ্রিত বলিয়া মহাজন-পদাবলীর নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন না। আদি-রসের নিন্দা নাস্তিক্য-বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করে। অথবা, এ সকল নিন্দুকেরা আদিরস বস্তুটি যে কি, ইহা বুঝেন না ও জানেন না, এই কথাই বলিতে হয়।

স্ত্রী-পুরুষের যৌন-সম্বন্ধ হইতে যে রস উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আদি-রস কহে। আমাদের রসতত্ত্বে ও বৈষ্ণব মহাজন-পদে ইহাকেই মাধুর্য্য কহিয়াছেন।

সংসারে সন্তানোৎপাদনের জন্যই স্বামি-স্ত্রী-রূপে নরনারীর যৌন-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয়। সন্তানোৎপন্ন না হইলে বংশধারা ও সমাজস্থিতি রক্ষা পায় না। প্রজনন ব্যতীত জীবস্থিতি রক্ষা পায় না। এই জন্যই প্রজনন সাধারণ জীবধর্ম্ম। মনুষ্য-সমাজে এই প্রজাসৃষ্টিই দাম্পত্য-সম্বন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিন্তু বিধাতার রাজ্যে সকল প্রয়াসের ও সকল কর্ম্মের সঙ্গেই আনন্দ-রস মিশিয়া থাকে। আনন্দ হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি, আনন্দের উপরেই সৃষ্টির স্থিতি, আনন্দেতেই সৃষ্টির গতি বলিয়া, সৃষ্টির সকল ব্যাপারই আনন্দাশ্রিত। আনন্দের প্রেরণাতেই জীব জীবনধারণ করে ও জীবনের নানাবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়।

"কো হেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ ?"

কেই বা শরীর-চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণধারণ করিত, যদি এই আকাশে আনন্দ-বস্তু না থাকিতেন ?

"এষো হেবানন্দয়াতি"

ইনিই লোকসকলকে আনন্দদান করেন।

এই সার্ব্বজনীন আনন্দধর্ম্মপ্রভাবে জীবের প্রজনন-প্রয়াসেও আনন্দ আছে। এই আনন্দ-বস্তুকেই আলঙ্কারিকেরা **আদি-রস** কহিয়াছেন।

ইতরজন্তুরাও এই রস আস্বাদন করে; কিন্তু অবশে—প্রকৃতের্বশাৎ—প্রকৃতির বশে। সজ্ঞানে আত্মস্থ হইয়া নহে। এইরূপ প্রকৃতি-বশে, অর্থাৎ কেবলমাত্র রক্তমাংসের টানে, ইন্দ্রিয়সুখের লালসায়, যেখানে নরনারী পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সেখানে এই আকর্ষণকে কাম কহে।

এই কামও হেয় বস্তু নহে। এই কামই সৃষ্টিধারা রক্ষা করিতেছে। প্রজা উৎপাদন করে বলিয়া এই কাম ভগবদ্বিভূতির মধ্যে গণ্য হইয়াছে। "প্রজননশ্চাস্মি কন্দর্পঃ"—প্রজনন হেতু আমিই কন্দর্প বা কাম। এই কাম সংসারধর্ম্মের মেরুদণ্ড-স্বরূপ। ইংরাজিতে ইহাকে sex-attraction বলে। এই যৌন-আকর্ষণের বা sex-attraction এর উপরেই য়ুরোপীয়েরা আধুনিক Eugenics'এর বা সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করিতেছেন। আমাদের প্রাচীনেরা ইহাকেই পবিত্র দাম্পত্য-সম্বন্ধের ভিত্তি করিতে চাহিয়াছিলেন। এই জন্যই, সে আদর্শভ্রষ্ট হইয়াও, আমরা বিবাহ-কালে, কন্যাসম্প্রদানের পরে, তাঁহাদের রচিত অপূর্ব্ব কামস্তুতিটি পড়িয়া থাকি।

সম্প্রদানকর্ম্ম শেষ হইলে, সম্প্রদত্তা কন্যাকে গ্রহণ করিয়া, জামাতা প্রথমেই এই কন্যার উপরে আপনার অধিকার ত্যাগ করিয়া বলেন—"ওঁ কন্যেয়ং প্রজাপতি-দেবতাকা"—এই কন্যা আমার নহে, অর্থাৎ আমার যথেচ্ছভোগের জন্য এই কন্যা সম্প্রদত্ত হয় নাই। এই কন্যা প্রজাপতি দেবতার—যিনি প্রজাসৃষ্টি ও প্রজারক্ষা করেন, তাঁহার। এই বলিয়া এই কামস্তুতি পাঠ করেন :—

"ওঁ ক-ইদং কস্মা আদাৎ কামঃ কামায়াদাৎ
কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা কামঃ সমুদ্রমাবিশৎ।'

এই সম্প্রদত্তা কন্যাকে কে সম্প্রদান করিল? কাহাকে সম্প্রদান করিল? কাম সম্প্রদান করিয়াছেন। কামকেই সম্প্রদান করিয়াছেন। কামই দাতা, কামই প্রতিগ্রহীতা, এই কাম পরমাত্মাতে প্রবেশ করিয়াছে।

এমন যে কাম, তাহাকে হেয় বলিব কেমনে?—তবে যে-যৌন-সম্বন্ধের উদ্দেশ্য কেবল ক্ষণিক ইন্দ্রিয়রসভোগ মাত্র, কিন্তু প্রজোৎপাদন নহে, যে কাম কেবলমাত্র উপভোগপরায়ণ, তাহা অতি হেয় বস্তু, সন্দেহ নাই।

এ সংসারে যাহা আপনার সার্থকতালাভ করে না, তাহাই হেয় হইয়া পড়ে। যৌন-আকর্ষণ সাধারণতঃ প্রজা-সৃষ্টি করিয়া সার্থক হয়—জীবতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইহাই, এই sex-attraction'এর বা যৌন-আকর্ষণের চরম সার্থকতা। জীবতত্ত্ব বা বায়লজি Biology ইহার উপরে যায় না। প্রজনন-ব্যাপারে জীবকে নিয়োজিত করিবার জন্যই প্রকৃতি জীবের যৌন-সম্বন্ধের বা sex relationএর মধ্যে একটা আনন্দের উৎস সৃষ্টি করিয়াছেন। জীবতত্ত্ব বা বায়লজি এ-ছাড়া আর কোনও কথা জানে না, কহিতেও পারে না। কিন্তু রসতত্ত্ব বলে—এহ বাহ্য, ইহাও বাহিরের কথা।

গাছে ফুল ফোটে ফল ধরিবার জন্য, সত্য কথা। কিন্তু কেবল ফোটারই কি নিজের একটা সার্থকতা নাই? ময়ূরের পুচ্ছ, কুক্কুটের মুকুট, প্যারেডাইজ পাখীর অপূর্ব্ব পর্ণ-গৌরব, সিংহের কেশর,—এ সকল কি কেবল প্রজোৎপাদনেরই ছলাকলা। ময়ূর দেখিয়া ময়ূরী, কুক্কুট দেখিয়া কুক্কুটী, সিংহ দেখিয়া সিংহিনী যে আকুল হইয়া ছুটিয়া যায়, এই আকুলতার কি আপনার কোনও সার্থকতা নাই? নাই বা যদি সঙ্গম ঘটে, নাই বা যদি প্রজাসৃষ্টি হয়, নাই বা যদি ফল ধরে, নাই বা যদি ছানা জন্মে,—তাহা হইলেই কি অমন সৌন্দর্য্য, অমন সাধ একেবারে নিষ্ফল হইয়া যায়? প্রজাসৃষ্টি ছাড়া এই অপূর্ব্ব যৌন-লীলাতে বা sex-romance'এ কি আর কোনও কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না? জীবতত্ত্ব বা বায়লজি এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।

মনস্তত্ত্ব বা Psychology এই বিশ্বব্যাপী যৌন-লীলার মধ্যে প্রজাসৃষ্টি ছাড়াও আর একটা বস্তু দেখিতে পায়। সেই বস্তুটিই এই যৌন-আকর্ষণের বা sex-attractionএর অব্যবহিত বা immediate লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যটি আপনাকে অবাধে, নিঃশেষে, বিলাইয়া দেওয়া—আত্মদান বা আত্মবলি। কীটপতঙ্গের পালকে চড়িয়া ও পায়ে জড়াইয়া আপনার নিগূঢ় প্রাণবস্তুকে বনস্থলীময় ছড়াইয়া দিবার জন্যই অচল বৃক্ষলতাদি অমন রূপরসগন্ধের পসরা সাজাইয়া দাঁড়াইয়া

রহে। ময়ূর-ময়ূরী, কুক্কুট-কুক্কুটী, সিংহ-সিংহিনী সকলেই আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার জন্যই পরস্পরকে দেখিয়া অমন পাগল হইয়া পরস্পরের কাছে ছুটিয়া যায়। এই বিশ্বব্যাপী যৌন-লীলার মধ্য হইতে আত্মদান ও আত্মসাৎ করিবার একটা অতি বলবতী বাসনা উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। পরস্পরকে পরস্পরের মধ্যে ছড়াইয়া দিবার জন্য, পরস্পরকে পরস্পরের নিকটে নিঃশেষে বিলাইয়া দিবার জন্য, একে অন্যের মধ্যে একে অন্যকে হারাইয়া ফেলিবার জন্যই ত এই যৌন-সঙ্গম-চেষ্টা প্রকাশিত হয়। প্রজাসৃষ্টি ত একটা আনুষঙ্গিক ঘটনা মাত্র। এই আত্মদান ও আত্মসাৎ, এই আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিস্মৃতিই ত এখানে মুখ্য কথা। এটি হইলেই ত এই সঙ্গম-চেষ্টা সফল হইল। ইহার সঙ্গে সঙ্গে যদি প্রজা-সৃষ্টি হয়, ভাল। কিন্তু তাহা ত মূল লভ্য বা মূল্য নহে, কেবল ফাউ মাত্র। জীবতত্ত্বের বা বায়লজির দিক্ দিয়া দেখিলে, যাহা মূল লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয়, রসতত্ত্বের দিক্ দিয়া দেখিলে তাহা একটা উপলক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়।

ফলতঃ তলাইয়া দেখিলে, এখানে রসতত্ত্বের আর জীবতত্ত্বের ব্যাখ্যার মধ্যে যে কোনও বিশেষ বিরোধ আছে, এমনও মনে হয় না। যে একাত্মতা-লাভের জন্য যুগ-দম্পতি পরস্পরের অঙ্গসঙ্গলোভে একে অন্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়, প্রজোৎপাদন করিয়া, কিয়ৎপরিমাণে সেই একাত্মতাই লাভ করিয়া থাকে। পিতামাতার শুক্র-শোণিত-মিশ্রণে সন্তানের দেহ উৎপন্ন হয়। তাহাদের প্রাণের যোগে যে সন্তানের প্রাণ ফুটিয়া উঠে না, তাহাদের মনের মিলনে যে সন্তানের মানস-জীবন গড়ে না, তাহাদের উভয়ের বুদ্ধি মিলিয়া যে সন্তানের বুদ্ধির প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা করে না,—এ কথাই কি বলিতে পারি? বরঞ্চ সন্তান প্রায়ই যে পিতামাতার রূপগুণ লাভ করে, ইহাই ত দেখিতে পাই। ইহাই ত আধুনিক ইউরোপের Eugenics বা সুপ্রজনন-বিজ্ঞানের ভিত্তি। সুতরাং দম্পতি-যুগল আপন আপন যৌন-আকর্ষণ বা sex-attraction'এর প্রেরণায় যে একাত্মতালাভ, যে আত্মদান ও আত্মসাৎ করিবার জন্য আকুলি-বিকুলি করেন, প্রজাসৃষ্টির দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে যে তাহারই সফলতালাভ হয়, ইহা অস্বীকার করা যায় না। প্রজাসৃষ্টিতে এই আত্মদান ও আত্মসাৎ করিবার বাসনা যদি পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিত, তবে সন্তানোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে, কিংবা সন্তানোৎপাদনশক্তির লোপে এই বাসনাও পরিতৃপ্ত বা নিঃশেষ হইয়া যাইত।

উদ্ভিদের বা ইতর জীবজন্তুর কথা আমরা সাক্ষাৎভাবে কিছুই জানি না। আমাদের অন্তরের অনুভবের দ্বারা তাহাদের বাহিরের ক্রিয়াকলাপের ব্যাখ্যা করিয়া, উদ্ভিদ ও ইতর জন্তুর জীবনের রহস্য কতকটা ভেদ করিতে চেষ্টা করি মাত্র।

আমাদের আরোপিত অর্থ এ ক্ষেত্রে কতটা সত্য হয়, ইহা বলা অসম্ভব ও অসাধ্য। বাহির হইতে দেখিয়া যতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয় যে, প্রজোৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের যৌন-প্রবৃত্তি বা sex-instinct এবং যৌন-আকর্ষণ বা sex-attraction উভয়ই কিছু কালের জন্ম লোপ পাইয়া যায়; এবং প্রজোৎপাদনের সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইলে এই প্রবৃত্তি এবং আকর্ষণ একান্তভাবে নষ্ট হইয়া যায়। কথাটা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে।

কিন্তু ইতরজন্তু সম্বন্ধে যাহাই হউক না কেন, মানুষের মধ্যে প্রজাসৃষ্টির শক্তি শেষ হইলেও দাম্পত্য-রস নিঃশেষ হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ কথা। অভ্যাসবশতঃই যে এরূপ হয়, তাহা নহে। যেখানে নরদম্পতির মধ্যে কেবল যৌন-সম্বন্ধ বা sex-relation মাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সত্য রসের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠে না, সেখানে দীর্ঘকাল পরস্পরের সহবাস করিয়া, বহু সন্তানোৎপাদন করিলেও, সন্তান-সম্ভাবনা নষ্ট হইলেই দাম্পত্য আকর্ষণও নিঃশেষ হইয়া যায়। ইহারা যে পরস্পরের নিকটে কখনও আত্মদান ও পরস্পরকে একান্তভাবে, সর্বেন্দ্রিয় দিয়া আত্মসাৎ করিতে চাহে নাই। ইহাদের যৌন-সম্বন্ধ বা দাম্পত্য-সম্বন্ধ পশুত্বের বা সাধারণ জীবত্বের ভূমিকে ছাড়াইয়া, রসতত্ত্বের সীমান্তে কখনও পৌঁছে নাই। এই জন্ম প্রজাসৃষ্টিতেই ইহাদের যৌন-সম্বন্ধ আপনার পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে যৌন-আকর্ষণ বা sex attractionকে অবলম্বন করিয়া জীবের নিত্য, নিগূঢ়, আত্মদান ও আত্মসাৎ করিবার বাসনা জাগিয়া উঠে, যৌন-সম্বন্ধের মূলে সেখানে কেবল দেহ-ভোগের লিপ্সাটাই জাগিয়া নাই, কিন্তু—

যথা—

নীরবিন্দুদ্বয়, পুষ্পদলে এক হয়,—

সেইরূপ ছুটি জীবের সম্পূর্ণ সমগ্রতা—তাহাদের দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আত্মা সকলে—একে অন্যকে পাইয়া, একে অন্যের মধ্যে ডুবিয়া, মিশিয়া মিলিয়া যাইবার জন্ম ছটফট করে। কিন্তু দেহাদির একটা স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য আছে বলিয়া, কিছুতেই পরস্পরের দেহাদির মধ্যে একেবারে নিঃশেষে, নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলিয়া মিশিয়া যাইতে পারে না। যত নিকটে যায়, ততই আরও নিকটে যাইতে চাহে; যতই প্রাণপণ করিয়া পরস্পরের মধ্যে শরীর-মনের ব্যবধান কমাইতে চেষ্টা করে, প্রাণের আগ্রহাতিশয় নিবন্ধন ইহার উন্টা উৎপত্তি হইয়া, এই অলক্ষ্য ব্যবধান যেন অন্তরের মধ্যে আরও বেশী বাড়িয়া উঠে,—এ অবস্থা ও অভিজ্ঞতা যে যৌন-সম্বন্ধের মধ্যে প্রকাশিত হইতে থাকে, সেখানে সন্তানের মধ্যে দাম্পত্য-

সম্বন্ধের আংশিক সাফল্য মাত্র লাভ হয়, পরিপূর্ণ সফলতা কিছুতেই লাভ হয় না, কখনই লাভ হইতেও পারে না।

আর এই যে আত্মদান ও আত্মসাৎ করিবার দুরন্ত, জ্বলন্ত, অনন্ত পিপাসা, তাহাই মাধুর্য্য-রসের প্রাণ। আর এই জন্যই পতি-পত্নী, কিংবা স্বামি-স্ত্রী, কিংবা কেবল নর-নারী না বলিয়া, নায়ক-নায়িকাকে এই মাধুর্য্য-রসের আশ্রয় বলা হয়।

নরনারীর সম্বন্ধ কেবল বা মুখ্যতঃ শারীরিক। পতি-পত্নী বা স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধ সামাজিক। নর-নারীর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা জীবতত্ত্বের বা বায়লজির উপরে। পতি-পত্নী বা স্বামি-স্ত্রীর সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা সমাজ-শৃঙ্খলা ও সমাজতত্ত্বের বা Sociology'র উপরে। নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে রসতত্ত্বের বা Art'এর উপরে।

নায়ক-নায়িকা, নর ও নারী বলিয়া, সাধারণ জীবধর্ম্মের অধীন। সমাজে বাস করেন ও পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা-ভগিনী, সখা-সখী প্রভৃতি বিবিধ সামাজিক সম্বন্ধে আবদ্ধ বলিয়া নায়ক-নায়িকা সাধারণ সমাজ-ধর্ম্মেরও অধীন। কিন্তু সমাজ-ধর্ম্ম যেমন জীবধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই আবার তাহাকে অতিক্রম করিয়া যায়, জীবপ্রবৃত্তিকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করে; আপনার সার্থকতালাভের জন্য কখনও বা সাধারণ জীবধর্ম্মকে অঙ্গীকার, কখনও বা অতিক্রম করিয়া যায়; সেইরূপ রস-ধর্ম্ম বা রোমান্সের (romanceএর) বিধিবাঁধনও, আত্মপ্রয়োজন অনুযায়ী, এক দিকে সাধারণ জীবধর্ম্ম ও দেশকালানুগত সমাজধর্ম্মকে কখনও বা অঙ্গীকার এবং অন্য দিকে কখনও বা অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করিয়া চলে। এইটিই নায়ক-নায়িকা সম্বন্ধের বিশেষত্ব। ইহারা সাধারণ নরনারীর শারীর ধর্ম্মের বিধানের ও সাধারণ পতি-পত্নীর সমাজ-ধর্ম্মের বিধানেরও অতীত। এই জন্যই সাধারণ নর-নারী কিংবা পতি-পত্নী মাধুর্য্য-রসের নিত্য আশ্রয় হইতে পারেন না। নায়ক নায়িকাই ইহার একমাত্র সত্য, বিশিষ্ট ও নিত্য অবলম্বন।

বহু ভাগ্যবলে যেখানে সংসারের পতি-পত্নী-সম্বন্ধের মধ্যে সত্য মধুর রস ফুটিয়া উঠে, সেখানে তাঁহাদের পতিত্ব-ও-পত্নীত্ব-ধর্ম্ম নায়ক-নায়িকা-ধর্ম্মের দ্বারা আচ্ছাদিত ও আচ্ছন্ন হয়। তখন তাঁহারা দেহে থাকিয়াই বিদেহী, সমাজাতীত, থাকিয়াও সমাজান্তর্ভুক্ত আশ্রমধর্ম্মাধীন হইয়াও অত্যাশ্রমী এবং বাহিরের শত বন্ধনের মধ্যেই অন্তরে সর্ব্ববন্ধন-মুক্ত হইয়া রহেন। এইরূপ বিরল দম্পতির মাধুর্য্য সম্বন্ধকেও নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধই কহিতে হয়; সামান্য পতিপত্নী-সম্বন্ধ বলিয়া গ্রহণ করিলে ইহার সত্য ও মর্য্যাদা রক্ষা পায় না।

নী ধাতু হইতে নায়ক শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। এই নী ধাতুর অর্থ পাইয়ে দেওয়া—নী প্রাপণে। নায়ক নায়িকাকে কিছু পাইয়ে দেন, নতুবা সত্য নায়ক-

ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। এই জন্য ইতর লোকের হীন কল্পনা যাহাই ভাবুক না কেন, নায়ক আর 'নাগরিক' এক কথা নহে। নায়িকাও নায়ককে কিছু পাইয়ে দেন, নতুবা নায়িকা-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয় না। এই জন্য, এই কথা জানে না বা বুঝে না বলিয়া, ইতর লোকে নায়িকা কথা শুনিলেই 'নাগরিকা' ভাবিয়া বসে।

কিন্তু নায়ক-ধর্ম্মের বিশেষত্ব দেওয়াতে নয়, পাইয়ে দেওয়াতে; দানে নয়, প্রাপণে। যে যাহা দেয়, তাহা তার নিজের বস্তু; যাহা দেয় না বা দিতে পারে না, কিন্তু পাইয়ে দেয়,তাহা তার নিজের নয়। নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে আপনাপন অঙ্গদান করেন, কিন্তু এই দানের দ্বারা তাঁহাদের নায়ক-নায়িকা-ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয় না। নায়ক-নায়িকা-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য এই দান ছাড়া আরও কিছু পাইয়ে দেওয়া প্রয়োজন। পরস্পরের সঙ্গলাভে যত ক্ষণ ইঁহারা এই বস্তুটি না পাইয়াছেন, তত ক্ষণ প্রকৃত নায়ক-নায়িকা-ধর্ম্মের প্রকাশ ও নায়ক-নায়িকা-সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা হয় না।

এই বস্তুটি তাঁহাদের অঙ্গ নহে, কারণ, অঙ্গদানে এ বস্তু দেওয়া যায় না। এই বস্তুটি তাঁহাদের মন নহে, কারণ, প্রাণপণে একে অন্যের মন যুগাইয়াও এ বস্তু দেওয়া যায় না। এই বস্তুটি তাঁহাদের আত্মস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি বা অহঙ্কার বা empircial ego'ও নহে, কারণ, নিতান্ত অনুগত স্ত্রী কিংবা স্ত্রৈণ পুরুষ এই স্বাতন্ত্র্যবলিদান করিয়াও আপনার পতি বা পত্নীকে এই বস্তুটি দিতে পারেন না।

এ দেশে বহুতর স্ত্রীলোক পুরুষের অনুগত দাসী হইয়া থাকেন, ইঁহাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধি আদৌ জাগিবার অবকাশ পর্য্যন্ত পায় না, অথবা জাগিয়া উঠিলেও সমাজধর্ম্মের ও গার্হস্থ্য-আদর্শের চাপে একেবারে নিষ্পিষ্ট হইয়া যায়। সকল দেশেই এমন মেরুদণ্ডহীন পুরুষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাঁহারা আপনাপন পত্নীর অস্তিত্বের মধ্যে নিজেদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবুদ্ধিকে বা individuality'কে একেবারে ডুবাইয়া দেন। কিন্তু এই সকল স্ত্রীপুরুষ আপনাপন পতি বা পত্নীকে এই বস্তুটি পাইয়ে দিতে পারেন না। এই কারণে ইঁহাদের মধ্যে প্রকৃত নায়ক-নায়িকা-ধর্ম্মের প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা হয় না।

এই জন্য, যে বস্তু নায়ক নায়িকাকে বা নায়িকা নায়ককে 'পাইয়ে দেন', তাহা ইন্দ্রিয়-সেবার সুখ নহে। এই বস্তুটি ব্যবহারিক আনুগত্যও নহে। এই বস্তুটিকে আত্ম-চরিতার্থতা কহিতে পারি। পুরুষের সাকুল্য পুরুষত্বের ও নারীর সমগ্র নারীত্বের চরিতার্থতালাভ যাহার দ্বারা হয়, তাহাই এই বস্তু।

নারীর নারীত্ব নারীর নিজস্ব সম্পত্তি, পুরুষের নহে। পুরুষের পুরুষত্ব পুরুষেরই নিজের বস্তু, নারীর নহে। পুরুষ যাহা দিতে পারেন, তাহা তাঁর এই পুরুষত্বেরই অন্তর্ভুক্ত, তাঁর যাহা কিছু সকলই যে এই পুরুষধর্ম্মাধীন। নারীও

যাহা দিতে পারেন, তাহা তাঁর নারীত্বেরই অন্তর্ভুক্ত, তৎসমুদায়ই তাঁর নারী-ধর্ম্মাধীন।' পুরুষ নারীকে তাঁর নারীত্ব দান করিতে পারেন না, নারীও পুরুষকে তাঁর পুরুষত্ব দান করিতে পারেন না। পুরুষত্বের বিকাশেই পুরুষের সার্থকতা। নারীত্বের বিকাশেই নারীর সার্থকতা। এই জন্য পুরুষ নারীকে বা নারী পুরুষকে সার্থকতা দিতে পারেন না,—পাইয়ে দিতে পারেন মাত্র। এই সার্থকতা-প্রাপণেই নায়ক-নায়িকা-ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হয়।

অতএব যে পুরুষ আপনার রূপগুণাদির দ্বারা কোনও রমণীর সাকুল্য ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মজ্ঞানকে জাগাইয়া, নিজের দিকে আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হন, এবং সেই আকর্ষণের যোগেই তাঁহার সমগ্র নারী-প্রকৃতিকে চরম সার্থকতালাভের পথে প্রেরণ করেন, কেবল তাঁহাকেই নায়ক কহিতে পারা যায়। সেইরূপ যে রমণী আপনার রূপগুণাদির দ্বারা কোনও পুরুষের সাকুল্য ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও আত্মজ্ঞানকে জাগাইয়া আপনার দিকে আকর্ষণ করেন, এবং এই আকর্ষণযোগেই তাঁহার সমগ্র পুরুষত্বকে চরম সার্থকতার পথে প্রেরণ করেন, তাঁহাকেই কেবল নায়িকা কহিতে পারা যায়।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

উত্তরাধিকারী

(১)

ময়রার মেয়ে কাদী মুড়ি-মুড়কি বেচিয়া যখন হাতে দু'পয়সার সংস্থান করিল, তখন সে এই দু'পয়সার উত্তরাধিকারীর জন্ত বড়ই ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

ভরা যৌবনে স্বামীর মুখাগ্নি করিয়া কাদী যে দিন কাঁদিতে কাঁদিতে ঘরে ফিরিল, সে দিন সে একবারও মনে করে নাই যে, তাহাকে আবার সংসারে থাকিতে হইবে এবং মুড়ি-মুড়কি বেচিয়া দিন গুজরান করিতে হইবে। কিন্তু সে যাহা মনে করে নাই, কিছু দিন পরে কাজে তাহাই করিতে হইল। শূন্য সংসারে তাহাকে একাই থাকিতে হইল এবং মুড়ি-মুড়কির দোকান করিয়া সেখানে থাকিবার উপায় করিতে হইল।

গাঁয়ের বাজার-পাড়ায় হরিদাস বেজের মেঠায়ের দোকান ছিল। দোকানখানা বেশ চল্‌তি ছিল, কিন্তু হরিদাসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহা অচল হইয়া পড়িল। মহাজন পাঁচ বৎসরের খাতার জের টানিয়া দুই শত তেত্রিশ টাকা সাত আনা তিন পাই বাকী করিল। কাদম্বিনী দোকানের মজুত মালপত্র, হাঁড়ি-কলসী পর্য্যন্ত বেচিয়া স্বামীকে ঋণমুক্ত করিয়া দিল। জ্ঞাতি সম্পর্কে ভাসুর মদন বেজ আসিয়া বলিল, "তুমি কি ক্ষেপেছ বৌমা, ও সব মহাজনের চাতুরী। আমার হাতে দোকানটা দাও, দেখি কোন্ বেটা একটি পয়সা আদায় করে।"

কাদম্বিনী কিন্তু সে কথা কাণে তুলিল না। দোকান বেচিয়া স্বামীকে ঋণ-মুক্ত করিল, তার পর গলার মুড়কি-মাদুলী বেচিয়া তিল-কাঞ্চনে স্বামীর পার-লৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করিল। মদনের মনঃক্ষোভের সীমা রহিল না, কিন্তু এই ক্ষোভ-নিবারণের কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া পাইল না। কেবল দুই বেলা মালা-জপের সময় শ্রীহরির চরণে আত্মদুঃখ নিবেদন করিয়া এই অধর্ম্মের প্রতী-কার প্রার্থনা করিতে লাগিল।

স্বামীর শ্রাদ্ধাদি কার্য্য শেষ করিয়া কাদম্বিনী যখন আপনাকে নিতান্ত অসহায় জ্ঞান করিল এবং জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহের কোন উপায়ই দেখিতে পাইল না, তখন সে ভাসুর মদন বেজের শরণাপন্ন হইল। মদন কিন্তু তাহাকে আমল দিল না; সে বারংবার দীনবন্ধু শ্রীহরিকে স্মরণ করিতে করিতে অপরের প্রতি-

পালনে আপনার সম্পূর্ণ অক্ষমতা জানাইয়া দিল। কাদম্বিনী চলিয়া গেলে মদন গৃহিণীর দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্যসহকারে বলিল, "দেখ্‌লে মাগীর আক্কেলটা। এখন হয়েছে কি? 'আগে না শুনিলে বঁধু যৌবনের ভরে, এখন কাঁদিতে হবে অজ্‌ঝর ঝরে।' মধুসূদন আছেন।"

এ দিকে কাদম্বিনী আরও দুই এক জন স্বজাতির দ্বারস্থ হইয়া যখন প্রত্যাখ্যাত হইল, তখন সে ভজা চাঁড়ালের মার পরামর্শে আপনার উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার সঙ্কল্প করিল। সে মল ও রূপার পৈছে বেচিয়া মুড়ি-মুড়কির দোকান করিল। বাড়ীর পাঁচীলের গায়েই একটু চালা বাড়াইয়া লইয়া দোকান খুলিল। ভজার মা বাজার হইতে চাল, ধান, গুড় প্রভৃতি মালপত্র আনিয়া দিত; কাদী ঘরে বসিয়া মুড়ি-মুড়কি তৈয়ার করিয়া বিক্রয় করিত।

দোকান বেশ চলিল, কাদম্বিনীর জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় হইল। কিন্তু সে আর এক দিকে বড়ই অসুবিধা বোধ করিল।

কাদম্বিনী ভরা যৌবনেই বিধবা হইয়াছিল। দেখিতেও সে মন্দ ছিল না। সুতরাং পাড়ার অনেক নিষ্কর্ম্মা ছোঁড়া সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহার দোকানে আড্ডা জমাইয়া থাকিত। সে আড্ডায় গান-গল্প, হাসি-তামাসা, সব রকমই চলিত। কাদম্বিনী ভয় পাইত, কিন্তু সাহস করিয়া মুখের উপর কাহাকেও কিছু বলিতে পারিত না।

শেষে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল যে, কাদম্বিনী ভজার মাকে আপনার অসুবিধার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিল না। ভজার মা চাঁড়ালের মেয়ে, একরোখা, কাহাকেও ভয় করিয়া চলে না। সে এক দিন ছোঁড়ার দলকে এমন কড়া কড়া কথা শুনাইয়া দিল যে, তাহারা আর দোকানের ত্রিসীমানায় আসিতে সাহস করিল না। কাদম্বিনী হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ছোঁড়ার দল কিন্তু সহজে ছাড়িল না। সেই দিন হইতে প্রতি রাত্রিতে কাদম্বিনীর বাড়ীতে ইট-পাটকেল পড়িত, দরজার শিকল নড়িত, জানালার বাহিরে শীষের শব্দ শুনা যাইত। কাদী ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়া থাকিত, বিপদে মধুসূদনকে স্মরণ করিবার শক্তিও তাহার থাকিত না। লোকে শুনিয়া বলিত, "এ সব উপদেবতার কাজ। হরিদাস যে বারদোষ পেয়েছিল।"

কাদম্বিনী পুরোহিতকে আনাইয়া বারদোষের শান্তি স্বস্ত্যয়ন করাইল, কিন্তু ভূতের উপদ্রব থামিল না। ভজার মা বলিল, "মর্ ছুঁড়ি, এ সব ভূত কি তুক-তুলসীতে যায়? এ ভূতের আলাদা ওষুদ।"

ভজার মা স্বতন্ত্র ঔষধের ব্যবস্থা করিল। সে নিজে ষণ্ড-জোয়ান, ছেলে-পিলে

ফেলিয়া শুইতে আসিতে পারিল না, ভজাকে পাঠাইয়া দিল। যে দিন হইতে ভজা কাদম্বিনীর ঘরের দাবায় চাটাই পাতিয়া, পাকা বাঁশের লাঠি পাশে রাখিয়া শুইতে আরম্ভ করিল, সেই দিন হইতে ভূতের উপদ্রব থামিয়া গেল।

(২)

ভূতের উপদ্রব কমিল, কিন্তু মানুষের জিহ্বার উপদ্রব বাড়িয়া গেল। প্রবীণারা নাক সিট্‌কাইয়া ছি ছি করিতে লাগিল, নবীনারা মুখ মুচ্‌কাইয়া মৃদু হাসিল; মদন বেজ হাতের মালা দ্রুত ঘুরাইতে ঘুরাইতে গৃহিণীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে গিন্নি, ভাগ্যে জায়গা দিই নাই। ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করেন।"

গৃহিণী মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "অমন সোমত্ত ছুঁড়ীকে কি ঘরে ঠাঁই দিতে আছে? ছি ছি, আবাগী কি লোকটাই হাসালে?"

কাদম্বিনীর কাণেও অনেক কথা গেল, কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করিল না। ভাবিল, "লোকে যা বলে বলুক না, আমি তো ঠিক আছি।" কাদম্বিনী জানিত না যে, লৌকিক তুলাদণ্ডে ঠিক-বেঠিকের ওজন সব সময়ে সমানভাবে হয় না।

এ কথাটা কাদম্বিনী সেই দিন কতকটা বুঝিতে পারিল—যে দিন পুরোহিত তাহার ঘরে লক্ষ্মীপূজা করিবে না বলিয়া জবাব দিয়া গেল। কাদম্বিনী পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমার অপরাধ?"

পুরোহিত উত্তর করিলেন, "তোমার অপরাধ গুরুতর; তুমি চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়েছ।"

কাদ। চাঁড়ালের ছেলের সঙ্গে আমার কোন মন্দ সম্বন্ধ নাই; সে আমাকে মায়ের মত দেখে, আমি তাকে ছেলের মত দেখি।

পুরো। কে কাকে কি ভাবে দেখে, কেমন ক'রে জান্‌ব বল? আমরা তো অন্তর্যামী নই?

কাদ। তবে মন্দ দিক্‌টা কি রকমে জান্‌লেন?

পুরো। অনুমানে। ধোঁয়া দেখ্‌লেই বুঝা যায় যে, আগুনও আছে।

কাদম্বিনী একটু রাগত ভাবে বলিল, "তা হ'লে আমার ধর্ম্ম রক্ষা করাও দোষ হয়েছে বলুন?"

পুরোহিত মস্তক সঞ্চালনে দীর্ঘ শিখা কম্পিত করিয়া অবিচলিতভাবে উত্তর করিলেন, "এ ভাবে ধর্ম্ম রক্ষা করার চেয়ে অধর্ম্ম করাও ছিল ভাল।"

কাদম্বিনী রাগে পূজার উপকরণ ছড়াইয়া ফেলিয়া বলিল, "যান আপনি, আমার আর পূজোর দরকার নাই।"

পুরোহিত চলিয়া গেলেন; কাদম্বিনী পূজার জিনিষপত্র সব কুড়াইয়া লইয়া জলে ফেলিয়া দিয়া আসিল।

ভজার মা আসিয়া বলিল, "হাঁ লা ময়রা-বৌ, রায় ঠাকুর না কি তোর পূজো বন্ধ করেচে?"

ঔদাস্তের সহিত কাদম্বিনী বলিল, "করুক্ বোন, আমার তো সাত দিকে সাতটা ছেলে-মেয়ে জ্বল্-জ্বল্ করছে যে, পূজো না হ'লে তাদের অকল্যাণ হবে।"

ভজার মা রাগিয়া বলিল, "তা হোক্ আর নাই হোক, ও বামুন তোর পূজো বন্ধ করে কোন্ লজ্জায়? ভগী তাঁতিনীর কথা কি কেউ জানে না?"

কাদম্বিনী বলিল, "মরুক্ গে, আমরা গরীব-দুঃখী লোক, আমাদের অত কথায় দরকার কি? যে কাঠ খাবে, সে আঙ্গরা হাগ্‌বে।"

ভজার মা মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "ইঃ লো, 'চালুনী বলে ছুঁচ তোর'—তাই আর কি। বামুনের একবার দেখা পেলে হয়, এমন তো শুনিয়ে দেব নি।"

পরদিন বাজারে যাইবার পথে ভজার মা রায় ঠাকুরের সাক্ষাৎ পাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাঁ গা রায় ঠাকুর, ভগী না কি বিন্দাবনে যাবে?"

মস্তক কণ্ডূয়ন করিতে করিতে রায় ঠাকুর বিচলিত-স্বরে বলিলেন, "ভজার মা, ভজার জন্যে একখানা ভাল গামছা বেছে রেখেছি, নিয়ে যাস্।"

ভজার মা মাথা নাড়িতে নাড়িতে সহাস্যে বলিল, "তা আন্‌বো বৈকি বাবা-ঠাকুর, আমরা তো তোমাদের খেয়েই মানুষ।* তবে কি না, ময়রা-বৌ বল্‌ছিল যদি যায়—"

ব্যস্তভাবে রায় ঠাকুর বলিলেন, "আর কিছু বল্‌তে হবে না ভজার মা, কি কর্‌বো, ওর জ্ঞাতি শত্রু। তা এবার দেখা যাবে।"

রায় মহাশয় তাড়াতাড়ি ভজার মার সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন। ভজার মা মৃদু হাসিয়া বাজারের পথ ধরিল।

ইহার পর হইতে কাদম্বিনীর লক্ষ্মীপূজা মনসাপূজা কিছুই বাদ গেল না।

তার পর চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। কাদম্বিনীর হাতে কিছু জমিল। সে বন্ধক জিনিষপত্র রাখিয়া লোককে কিছু কিছু টাকা ধার দিত, সুদে আসলে টাকা বাড়িয়া উঠিত। এইরূপে বছরে বছরে একশত টাকা দুইশতে, দুইশত চারিশতে বাড়িয়া উঠিল। টাকা ধার দিবার বা আদায়ী টাকা তুলিবার সময় কাঠের সিন্দুক খুলিলে, যখন চক্‌চকে টাকাগুলা সম্মুখে হাসিতে থাকিত, তখন আনন্দে গর্ব্বে কাদম্বিনীর বুকটা ফুলিয়া উঠিত। কিন্তু সিন্দুক বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিলেই তাহার এ আনন্দটুকু নিরানন্দে পরিণত হইত। টাকা তো জমিতেছে, কিন্তু এ

টাকা ভোগ করিবে কে? যদি স্বামী থাকিত! স্বামী না থাক্, যদি সেই এক বছরের ছেলেটাও বাঁচিত! যদি একটা কাণা-খোঁড়া মেয়েও থাকিত! একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাদম্বিনী ভাবিত, "দূর হোক্, একা একা আর ভাল লাগে না। যদি একটা পরের ছেলেও পাই, মানুষ-মুনুষ ক'রে মনের সাধ মিটাই।"

রায় ঠাকুর মাঝে মাঝে আসিয়া উপদেশ দিতেন, "কাদু, গাছপ্রতিষ্ঠা কর। পরকালে সন্তানের কাজ করবে।"

রায় মহাশয় দোকানে দেবদারু কাঠের বাক্সের উপর বসিয়া বসিয়া বৃক্ষপ্রতিষ্ঠার অপূর্ব্ব ফলজনকত্ব বিষয়ে কত পৌরাণিক কাহিনী কীর্ত্তন করিতেন; কোন্ বৃক্ষপ্রতিষ্ঠাতা যমালয়ে ডোমের মেয়ের কাছে কুলার দাম না দেওয়ায় ঋণপাপে জড়িত হইয়া পড়িলে অশ্বত্থরূপী নারায়ণ কিরূপে আপনার বক্ষচর্ম্ম কাটিয়া দিয়া প্রতিষ্ঠাতাকে ঋণমুক্ত করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করিতেন। শুনিতে শুনিতে কাদম্বিনী মুগ্ধ হইয়া পড়িত। কিন্তু পরক্ষণেই যখন শূন্যগৃহের উপহাসপূর্ণ অট্টহাসি শুনিতে পাইত, তখন পরলোকের সুখের আশ্বাসে তাহার শূন্য হৃদয়টা কিছুতেই শান্ত হইত না, তাহার আগে ইহলোকেই হৃদয়ের এই শূন্যতা পূর্ণ করিবার জন্য প্রাণটা আকুল হইয়া উঠিত। সে আকুলতার নিকট রায় মহাশয়ের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও ভবিষ্যপুরাণের মধুর উপদেশাবলী কঠোর বিদ্রূপের মতই প্রতীয়মান হইত।

মদন দাসও নিশ্চিন্ত ছিল না; সে মালা হাতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া কাদীর দোকানে বসিত এবং পারলৌকিক পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতিবাদ করিয়া বলিত, "পরকালের কথা পরে, ম'লে জলপিণ্ড দেবার লোক আগে চাই। আর গাছপ্রতিষ্ঠা, দান-ধ্যান না করলেই কি পুণ্য হয় না? তার সোজা পথ প'ড়ে রয়েছে। শাস্ত্রে আছে, এক রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে। হরিনাম কর। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্, নাস্ত্যেব গতিরন্যথা। শুধু নাম, নাম ছাড়া কলিতে আর উপায় নাই।"

এইরূপে গলদশ্রুলোচনে নাম-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরম বৈষ্ণব মদন দাস স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রটিকে পালকপুত্ররূপে যাহাতে কাদম্বিনী গ্রহণ করে, এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিত। কাদম্বিনী কিন্তু কোন উত্তর দিত না। মদন দাস ক্ষুণ্ণচিত্তে গোবিন্দ মধুসূদনকে স্মরণ করিয়া ক্ষিপ্র অঙ্গুলীসঞ্চালনে মালা ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করিত। কাদম্বিনী কি করিবে, তাহাই ভাবিতে থাকিত।

শেষে কাদম্বিনী যখন আপনার মাসতুত ভাই গিরিশ নাগের স্ত্রীবিয়োগের সংবাদ পাইল, তখন সে ভজার মাকে সঙ্গে করিয়া ভায়ের বাড়ীতে গিয়া, গিরিশের আট

বছরের ছেলে নবীনকে লইয়া আসিল। মদন দাসের ক্রোধ ও আক্ষেপের সীমা রহিল না, সে দুই বেলা এই স্বার্থপরায়ণা রমণীকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য হরির চরণে অভিযোগ করিতে লাগিল।

(৩)

"পিসী মা!"

"কেন রে, নবু?"

নবীন কাদম্বিনীকে পিসী মা বলিয়াই ডাকিত। কাদম্বিনীর ইচ্ছা ছিল, শুধু মা বলিয়াই ডাকে। ভজার মাও তাহাকে প্রথম প্রথম মা বলিয়া ডাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, নবীন কিন্তু সে অনুরোধ রাখিল না; উত্তরে বলিত, "দূর্, এ যে পিসি মা। আমার মা তো ম'রে গেছে।"

বুদ্ধিমান্ নবীন পিসীমাকে মা বলিয়া ডাকিতে পারিল না, পিসী-মা বলিয়াই ডাকিতে লাগিল। কাদম্বিনীকে অগত্যা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে হইল। তবু তো সম্বোধনের শেষে মা কথাটা আছে।

নবীন ডাকিল, "পিসী মা!"

কাদম্বিনী বলিল, "কেন রে, নবু?"

নবীন। আমি আর পাঠশালে যাব না।

কাদ। কেন?

নবীন। গুরুমশায় যে মারে।

মৃদু হাসিয়া কাদম্বিনী বলিল, "গুরু মশায়ের মার না খেলে কি লেখাপড়া হয় বাবা?"

জোরে মাথা নাড়িয়া নবীন বলিল, "নাই বা হ'লো। লেখাপড়া শিখে কি হবে?"

কাদ। পয়সা আন্‌তে পার্‌বি।

নবীন। আমার পয়সা আন্‌বার দরকার কি? তোমার তো পয়সা আছে।

কাদ। সে আর কত?

নবীন। পাঁচ সাতশো হবে তো?

কাদ। তা হ'তে পারে, কিন্তু তাতে কি হবে?

নবীন। তাতেই খুব হবে। ঐ পয়সায় আমি একটা দোকান কর্‌বো পিসী মা, খুব মস্ত দোকান হবে, তিন চার জন হালুইকর রেখে দেব। রোজ আট দশ টাকা বিক্রী হবে।

কাদম্বিনী হাসিয়া উঠিল; বলিল, "তা তো কর্‌বি, কিন্তু লেখাপড়া না শিখলে দোকান চালাতে পারবি কেন?"

মস্তক সঞ্চালন করিয়া নবীন বলিল, "খুব পারবো।"

কাদম্বিনী বলিল, "তা পারিস্ পারবি। এখন পাঠশালে যা।"

নবীন মুখ ভার করিয়া সরোদনে বলিল, "না, পাঠশালে গেলে আমি মরে যাব।"

কাদম্বিনী তাহার মাথায় হাত দিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ষাট্ ষাট্, অমন কথা কি বল্‌তে আছে?"

হাত দিয়া চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে নবীন বলিল, "না, বল্‌তে নেই। গুরু-মশায় এত মারে, তবু তুমি বল পাঠশালে যাও। তুমি পিসী কি না, মা হ'লে কি আমায় যেতে দিত?"

কাদম্বিনীর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নবীনের মুখের দিকে চাহিল। নবীন পাতা দোয়াত ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল।

হায় অবোধ শিশু, কি বুঝিবি তুই, কতখানি বুকভরা স্নেহ, প্রাণভরা আশা, হৃদয়ভরা আনন্দ লইয়া তোকে প্রতিপালন করিতেছে। তোর জন্য সে যে কত লোকের বিরাগভাজন হইয়াছে, কত পারলৌকিক সুখের আশা ত্যাগ করিয়াছে, আপনার নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবনে কত চিন্তা, কত উদ্বেগ ডাকিয়া আনিয়াছে; তোর মুখের দিকে চাহিয়া সে শূন্য সংসারে কতখানি পূর্ণতা দেখিতে পাইয়াছে।

একটা ক্ষুদ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাদম্বিনী ভাবিল, "ছেলে মানুষ!"

আর একদিন নবীন বলিল, "ও চাঁড়ালটা কেন আসে পিসী মা?"

"কে?"

"ঐ ভজা বেটা?"

"এলেই বা।"

সক্রোধে নবীন বলিল, "কেন আস্‌বে? ও ছোট লোক, চাঁড়াল।"

কাদম্বিনী বলিল, "ছি বাবা, ওরা অসময়ে আমার কত উপকার করেছে।"

রাগে চীৎকার করিয়া নবীন বলিল, "করেছে করেছে, এখন আসতে পাবে না।"

বিস্মিতভাবে কাদম্বিনী বলিল, "কেন বল্ দেখি।"

নবীন। কেন? ওর জন্য কত লোকে কত কথা বলে।

কাদম্বিনীর মুখ গম্ভীর ভাব ধারণ করিল; ধীরে ধীরে বলিল, "লোকের কথায় কাণ দিতে নাই।"

উত্তেজিত কণ্ঠে নবীন বলিল, "কাণ দিতে নাই তুমি দেবে না, আমি ও সব সইতে পারব না। তা হয় তো আমি বাবার কাছে চ'লে যাব।"

কাদম্বিনী নির্ব্বাক্‌ নিশ্চল। হায়, এ যে পরের ছেলে। এই ছেলেকে লইয়া সে আপনার পুত্রস্নেহের প্রবল তৃষ্ণা নিবারণ করিতে চায়? ইহারই জন্য সে অশ্বত্থ-রূপী নারায়ণকেও পুত্রত্বে বরণ করিতে সম্মত হয় নাই? শুধু স্নেহের শিকলে—ভালবাসার প্রলোভনে সে কতক্ষণ এই বনের পাখীকে ধরিয়া রাখিবে? সে যে কথায় কথায় শিকলী কাটিতে চায়! নিজের ছেলে আর পরের ছেলের এত প্রভেদ!

তা হউক পরের ছেলে, সে যত পারে আঘাত করুক, তথাপি কাদম্বিনী তাহাকে ছাড়িতে পারিবে না। সে যে তাহার শূন্য বুকের অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছে। কাদম্বিনী আপন মনে একটু হাসিল।

(৪)

মদন দাস রায় ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কি গো, রায় ঠাকুর, তোমার মাতব্বর যজমানের ছেলের বিয়ে যে।"

রায় ঠাকুর মুখ-বিকৃতি করিয়া বলিলেন, "রেখে দাও মাতব্বর যজমান। বেটী আগে দু'পয়সা দিচ্ছেল থুচ্ছেল বটে, কিন্তু ঐ ছেলেটাকে নিয়ে অবধি আর কড়া ধুয়ে কড়ার জলটুকুর পর্য্যন্ত প্রত্যাশা নাই। ছেলেটা ওকে স্বর্গে দেবে। পঞ্চমীর ব্রত নিলে, তা আজ পর্য্যন্ত উজ্জাপন কর্‌লে না। বলে সময়টা বড় খারাপ। আরে বেটী, তোর সময় কি আর ভাল হবে? ছেলেটাও জুটেছে তেমনি।"

মাথা নাড়িয়া মৃদু হাসিতে হাসিতে মদন দাস বলিল, "সকলই শ্রীহরির ইচ্ছা। আমি ব'লেছিলাম, আমার ছোট ছেলে কেষ্টধনকে নাও। তা পছন্দ হ'লো না। গোবিন্দ, গোবিন্দ!"

একটু থামিয়া মদন দাস পুনরায় বলিল, "তা বাবাঠাকুর, আমার তাতে কোনই ক্ষতি নাই, আমার সোণার চাঁদ সব বেঁচে থাকুক, কিন্তু তোমার জাতও গেল, পেটও ভর্‌ল না।"

ভ্রূকুটী করিয়া রায় ঠাকুর বলিলেন, "আমার জাত গেল কিসে? তোমরা কি ওকে রহিত কর্‌তে পেরেছ? তোমাদের সে ক্ষমতা আছে কি? থাক্‌তো যদি জগন্নাথ দাদা বেঁচে।"—

বিরলকেশ মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে মদন সহাস্যে বলিল, "তিনি নাই, দর্পহারী মধুসূদন আছেন, তিনিই সব ব্যবস্থা কর্‌বেন। তা তোমরা যাও যাবে বাবা-ঠাকুর, আমি আর এ বয়সে চণ্ডালের অন্ন খেয়ে দেহটা অপবিত্র কর্‌তে পারব না।"

রায় ঠাকুর মুখটা একটু বাড়াইয়া দিয়া নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু গোলযোগ উঠেছে নাকি?"

অপাঙ্গে রায় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া মদন দাস বলিল, "পাপ কখন আগুন চাপা থাকে না বাবাজী, তবে এখন চেপে যাও, দেখ, কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়। 'ভাঁয়োরে সাত তাল বয়' বুঝ্‌লে ?"

যেন বুঝিয়াছে, এইরূপ ভাব প্রকাশ করিয়া রায় ঠাকুর মস্তক সঞ্চালন করিলেন। মদন দাস বারকতক পাপতাপহারী মধুসূদনকে ডাকিয়া লইল।

(৫)

নবীন ষোল বছরে পড়িতেই কাদম্বিনী তাহার বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল। একটি ছোট্ট বৌ ঘরে আসিবে, কাদম্বিনী মনের সাধ-আহ্লাদ মিটাইয়া তাহাকে খাওয়াইবে পরাইবে, ছেলে বৌ লইয়া আমোদ-আহ্লাদ করিবে, নবীনেরও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রশমিত হইয়া আসিবে। কাদম্বিনী মেয়ে খুঁজিতে লাগিল।

অনেক খোঁজাখুজি, অনেক পছন্দ-অপছন্দের পর পৌনে তিন শত টাকা পণে একটি মেয়ে পাওয়া গেল। কাদম্বিনী বিবাহের উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইল। বিবাহের সময় নবীনের বাপ গিরিশ নাগ আসিল, আরও দুই চারি জন আত্মীয় কুটুম্বকে আনা হইল। কাদম্বিনীর সুখ কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া আসিল। হায়, কে জানিত যে, সব হারাইয়া আবার এমন করিয়া সবল সুখই পাওয়া যাইবে ? আনন্দে আত্মহারা হইয়া কাদম্বিনী দিন গণিতে লাগিল।

বিবাহের দিন নিকট হইল। গায়ে হলুদ হইয়া গেল। হলুদমাখা কাপড় পরিয়া জাঁতি হাতে হাসিমুখে নবীনকে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেখিয়া কাদম্বিনী আনন্দে চোখের জল চাপিতে পারিল না।

গাত্রহরিদ্রার আগে গিরিশ নাগ আসিয়া একটু গোল বাধাইয়াছিল। সে বলিল, "কাদু, তোমার যা কিছু, সবই নবীনের। তা হ'লেও তোমার জ্ঞাতিরা তোমার ওয়ারিশ। বিয়ের আগে নবীনের নামে একটা কায়েমী লেখাপড়া ক'রে দাও। শরীরের ভালমন্দর কথা তো বলা যায় না।"

ভাবিয়া চিন্তিয়া কাদম্বিনী ইহাতে সম্মত হইল। দানপত্র দ্বারা কাদম্বিনী আপনার ঘরবাড়ী, টাকা-কড়ি, বন্ধকী গহনা প্রভৃতি সব নবীনের নামে লেখাপড়া করিয়া দিল। কোবালা রেজেষ্টারী হইয়া গেলে গাত্রহরিদ্রা হইল।

বিবাহের দিন সকালে কাদম্বিনী যখন নান্দীমুখের যোগাড় করিতেছিল, তখন মেয়ের বাড়ী হইতে একটি লোক আসিয়া জানাইল যে, মেয়ের বাপ সংবাদ পাইয়াছে, বরের প্রতিপালিকা পিসীর গ্রামে একটা অপবাদ আছে। পরগণার কাছে তাহার মীমাংসা না হইলে এ বাড়ীতে মেয়ে দেওয়া যায় না। নবীনকে মেয়ে দিতে আপত্তি নাই, কিন্তু কাদম্বিনী বাড়ীতে থাকিলে বিবাহ হইবে না।

সংবাদ শুনিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। গিরিশ নাগ মাথায় হাত দিয়া বসিল। মদন দাস আসিয়া সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল। নবীন বলিল, "যদি বিয়ে না হয়, গলায় দড়ি দেব।"

অনেক আন্দোলন তর্কবিতর্ক হইল। শেষে স্থির হইল, বিবাহ বন্ধ হইতে পারে না; কাদম্বিনী দিন কতকের জন্য বাড়ী ছাড়িয়া যাক্। নবীনের শুষ্ক মুখ প্রফুল্ল হইয়া আসিল। সে কাদম্বিনীকে বলিল, "তাই ভাল পিসীমা, তুমি দিন কতক কোথাও গিয়ে থাক।"

রুদ্ধশ্বাসে কাদম্বিনী জিজ্ঞাসা করিল, "আমি কোথায় থাকব?"

গিরিশ বলিল, "থাক্‌বার ভাবনা কি? আমার বাড়ীতে না হয়, ঘোষপুরে আমার ভাগ্‌নে জামায়ের বাড়ীতে গিয়ে থাক।"

নবীন সোৎসাহে বলিল, "তাই যাও পিসীমা, সিন্দুকের চাবীটা দিয়ে যাও।"

কাদম্বিনী নবীনের প্রফুল্ল মুখখানার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আঁচল হইতে চাবীটা খুলিয়া দিল। উঠানে ভজার মা গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়াছিল; কাদম্বিনী গিয়া তাহার হাত ধরিল; বলিল, "আয় ভজার মা।"

কাদম্বিনী ভজার মাকে টানিয়া বাহিরে আনিল। বাহিরে আসিয়া ভজার মা জিজ্ঞাসা করিল, "যাবি কোথায়?" কাদম্বিনী থমকিয়া দাঁড়াইল; উদ্বিগ্নস্বরে বলিল, "তাই তো, কোথায় যাব বল্ দেখি।"

ভজার মা একটু হাসিয়া বলিল, "বিন্দাবনে চল্।"

কাদম্বিনী বলিল, "সেই ভাল, আয়।"

ভজার মাকে টানিয়া লইয়া কাদম্বিনী চলিয়া গেল।

* * *

মদন দাস বলিল, "ছিঃ বৌমা, চাঁড়ালের ঘরে থাকা কি ভাল দেখায়?"

ভজার কুঁড়ের দাবায় কাদম্বিনী বসিয়াছিল। ভাসুরকে দেখিয়া সে একটুও সঙ্কুচিত হইল না, মুখে ঘোমটা দিল না। সে দুই চোখ কপালে তুলিয়া ভ্রূকুটী করিয়া বলিল, "খুব ভাল দেখায়। এ চাঁড়ালের ঘর তোমাদের ঘরের চেয়ে পবিত্র।"

রায় ঠাকুরও মদনের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি আক্ষেপের স্বরে বলিলেন, "মাথা খারাপ হ'য়েছে। নইলে বলে চাঁড়ালের ঘর পবিত্র।"

ক্রোধে চীৎকার করিয়া কাদম্বিনী বলিল, "হাঁ, পবিত্র। আবার তোমাদের চেয়ে ভজা, ভজার মা পবিত্র; আমি ময়রা হ'তে চাই না, তোমাদের মত বামুন হ'তে চাই না, জন্ম জন্ম যেন ভজার মার মত চাঁড়ালের মেয়ে হই।"

শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

শ্রীমঙ্গল-রসকারিকা

প্রাচীন বৈষ্ণব-সাহিত্যের অনেক গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শাখা বলিয়া পরিচিত সহজিয়া সাহিত্যের গ্রন্থাদি এ পর্য্যন্ত আশানুরূপ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই গ্রন্থ যে কেন অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না, তাহার অপরাপর কারণের মধ্যে এই দুইটিও অন্যতম কারণরূপে উল্লিখিত হইতে পারে যে, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজ নিজ গ্রন্থ অতি সংগোপনে রক্ষা করিয়া থাকেন এবং ইহাঁদের সাধন-প্রণালী অতিশয় বীভৎস বলিয়া সাহিত্য সেবিগণ এ বিষয়ে এক প্রকার উপেক্ষাই প্রদর্শন করেন। কিন্তু প্রাচীন বঙ্গভাষার আলোচনায় এই শ্রেণীর গ্রন্থেরও যে আবশ্যকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিলে চলিবে না। সহজিয়া-সাহিত্যের গ্রন্থও আমাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইবে এবং তাহার মধ্যেও আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় পাইতে পারিব।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা যে পুথিখানির পরিচয় প্রদান করিব, তাহা একখানি সহজিয়া-ধর্ম্মের পুথি। নাম—শ্রীমঙ্গলরসকারিকা। এই সহজিয়া-ধর্ম্ম মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য-দেব প্রচার করিয়াছেন, এই সম্প্রদায়ের লোকেরা এইরূপ মত পোষণ করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ধর্ম্ম হইলেই, সেই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ রচনা করিবার জন্য একজন কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর আবশ্যক। সুতরাং এই ধর্ম্মের যে সকল গ্রন্থ দেখিতে, পাওয়া যায়, তাহার অধিকাংশেরই রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী। বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য গ্রন্থখানির রচয়িতাও এইরূপ একজন "কৃষ্ণদাস গোস্বামী।" যথা—

"শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম করি আশ।
শ্রীমঙ্গলরসকারি [কা] কহএ কৃষ্ণদাস॥"

এই গ্রন্থখানি যে কোন্ সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে আমরা ইহার যে প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা ১২১৫ সালে লিখিত; সুতরাং ইহা শতাধিক বৎসরের প্রাচীন। অতএব মূল গ্রন্থ যে ইহারই কিছু পূর্ব্বে বা সম-সময়ে রচিত হইয়াছিল, তাহা বলিতে কোন বাধা নাই। নকল-কারীর নাম শ্রীদেবীচরণ দত্ত, নিবাস সরিষা। তিনি "গোটপাড়ার পুর্ব্বে শ্রীশ্রী৺স্বরি পার মোকাম বেতুয়া দহরির গত্তার কুটীতে" বসিয়া ১২১৫ সাল, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, শনিবার ইহার নকল শেষ করেন।

পুথিখানি পাঁচ পাতায় বা দশ পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। দোভাঁজ-করা কাগজের দুই পৃষ্ঠে লিখিত; এক পৃষ্ঠায় ১৩, অপর দুই পৃষ্ঠায় ৯ ও ১০ এবং অন্য সকল পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তি করিয়া লিখিত। গ্রন্থের অক্ষর সমস্তই আধুনিক আকারের, মাত্র ক-কার প্রাচীন কালের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। এই আকারের ক চণ্ডিদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুথিতে দেখিতে পাওয়া যায়। * পুথির বানান অশুদ্ধ হইলেও ভাষা মন্দ নহে।

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়

আলোচ্য পুথিখানির প্রতিপাদ্য বিষয় সহজিয়া-ধর্ম্ম, কিন্তু পুথির আরম্ভেই শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, অদ্বৈত ও ভক্তবৃন্দের বন্দনা আছে। যথা—

"জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
প্রথমে বন্দিব প্রভু গৌরচন্দ্র রায়।
যাহার কৃপাতে ভক্তের চক্ষুদান পায়॥
রসরাজ মহাভাবে দুইএ এক হয়।
প্রেমরস পিয়াইল বন্ধন ঘুচাইয়া॥"

পুথির আরম্ভে এইরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতির বন্দনা দেখিয়া ইহাকে সাধারণতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের গ্রন্থ বলিয়াই ধারণা হয়। কিন্তু আর একটু অগ্রসর হইলেই পাঠকের এই ভ্রম দূর হইবে, ইহার পরেই গ্রন্থকার বলিতেছেন,—প্রভুর মনের কথা কেহই জানে না, কেবল অরসজ্ঞ মূর্খ লোকেরা প্রভুর কথা হইতে ধর্ম্ম † ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যথা—

"প্রভুর অন্তরকথা কোন্ লোক জানে।
অরসজ্ঞ মূর্খ জন ধরম বাখানে॥"

এইখান হইতেই সহজিয়া ভাবের আরম্ভ। ইহার পরেই ত্যাগিকুলের জলন্ত আদর্শ মহাপ্রভু, তাঁহার সহচর, মূর্ত্তিমান্ বৈরাগ্যের অবতার রঘুনাথ, শ্রীরূপ, স্বরূপ প্রভৃতির নিকট "মনের কথা" প্রকাশ করিলেন এবং তাঁহারা সেই "বারতা" প্রচার করিয়া দিলেন। এই "বারতা" চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, রায় মহাশয় ও জয়দেব গোস্বামীও কিছু কিছু জানিতেন। যথা—

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ২২শ ভাগ, ৩য় সংখ্যা, কৃষ্ণকীর্ত্তনের লিপিকালনির্ণয় প্রবন্ধ ১৬৩পৃঃ দ্রষ্টব্য।

† এখানে বোধ হয়, ধর্ম্ম শব্দে মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে।

"এই তিন জন ভক্ত কহিল বারতা ॥
শ্রীচণ্ডিদাস বিদ্যাপতি রায় মহাশয়।
শ্রীজয়দেব কর্ণামৃত এ সব জানয় ॥"

ইহার পরেই পাঠক শুনুন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কিরূপ "মনের কথা" প্রচার করিতেছেন,—

"তাঁহার অন্তরকথা এবে কহ শুনি ॥
শুন শুন আরে ভাই মানুষ লক্ষণ।
মানুষ সভার পর মানুষ ভজন ॥
মানুষ সভার বড় বেদবিধি পার ॥
অবিকৃত হইয়া যেই করএ আশ্রয়।
সেই তো মানুষ হয় কহি সুনিশ্চয় ॥
শরীর ভিতরে হৈয়াছে মানুষ আকার।
অবিকৃত বস্তু সেই জানিহ সত্বর ॥
* * * *
রসিক ভকত সঙ্গ যদি ভাগ্য হয়।
মানুষ ভজন কথা সেই সে বুঝয় ॥"

ইহার পর মহাপ্রভুর মুখে গ্রন্থকার বলাইতেছেন,—কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণবীজ ও কৃষ্ণমন্ত্র যে আমি শ্রবণ করি, তাহা সকলই বাহ্য। যথা—

"কৃষ্ণবীজ নাম মন্ত্র করি (যে) শ্রবণ।
সেই সব বাহ্য হয় জানিহ কারণ ॥"

বস্তুতঃ ইহাই সার পদার্থ;—

"ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া এক আছে জলনিধি।
তাহার উপরে রজ সত্ত্বগুণ বধি ॥
তাহার উপরে প্রেম সাগর পাথার।
তাহাতে জন্মিল পদ্ম পিরিতি আকার ॥
পিরিতির নাম হয় জান বৃন্দাবন।
সেইখানে বিহরে রতি নবীন মদন ॥
মনরূপ ভৃঙ্গ তাহে করে গতাগতি।
সদা সেবা করে তায় সেইখানে বসতি ॥"

যে এই সার পদার্থ অবগত নহে, তাহার প্রতি আক্ষেপ করিয়া কবি বলিতেছেন,—

"মানুষের দেহ পাইয়া যদি মানুষ না হইল।
নিশ্চয় জানিলু তারে বিধি বিড়ম্বিল ॥"

এই মানুষ কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন,—

"প্রেমের পিরিতি রতি হৃদয়ে জার হয়।
নিশ্চয় জানিহ তারে মানুষ সভে কয় ॥"

এই মানুষ হইলে তাহার কিরূপ অবস্থা হয়, কবি তাহাও বলিতেছেন,—

"মানুষ হৈল সেই সভাকার পর।
বেদবিধি নাহি জানে না মানে আচার ॥
কুল শীল লোকধর্ম্ম সব তেয়াগিল।
আসক করিয়া তার সঙ্গে চলি গেল ॥"

ইহার পর যে কি হইল, তাহা রসজ্ঞ পাঠক আপনারা অনুমান করুন, আমি আর তাহা বিশ্লেষণ করিব না। এই রসের এতই আকর্ষণ যে, স্বয়ং ভগবান্ তাহার হাত এড়াইতে পারেন নাই, তিনিও ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। যথা,—

"সেই রসে আশ্রিত হইল স্বয়ং ভগবান্।
রস হইল শ্রীরাধিকা যার নাম ॥
রসিক সকলে জানে তাহার মরম।
অরসিক জ্ঞানী নাহি জানে এ সব কারণ ॥"

এই রস যে জানে না, তাহার অবস্থা কবি বর্ণন করিতেছেন,—

"রসভাব না জানিল দুঃখ মাত্র সার।
এহো লোকে পরলোকে নাহি পায় পার ॥"

ইহার পর চণ্ডিদাসের সেই পরিচিত সুরের অনুকরণে কবি রসের ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

"রসিক সকলে কয় কেহ তো রসিক নয়।
বিচার করিয়া দেখ কোটিকে গুটিক হয় ॥"

"রস রস কহে সভে রস বলি কারে।
তাহার বিচার এবে শুনহ প্রচারে॥
মধুর রস আস্বাদয়ে জেই সেই ভাগ্যবান্।
মধুর রস আস্বাদয়ে আপনি ভগবান্॥
সেই তো মধুর রস শুন তার কথা।
ব্রজলোকে দীপ্তিমান্ আছে সদা খ্যাতা॥
পরকীয়া রস হয় নাম তার মেওয়া।
কোথায় জনম তার শুন মন দিয়া॥
প্রেম-সাগরমধ্যে পিরিতি-কমল।
তাহার মধ্যেতে রস করে টলমল॥
এমন পিরিতি জেই নাহি জানে।
মনুষ্য আকার সেই ধরে অকারণে॥"

পরকীয়া রস আস্বাদন করিতে ভগবানের অভিলাষ হইল, কিন্তু তাঁহার গোলোকে এ রসের নাম-গন্ধও নাই; তাই তিনি মনুষ্য-দেহ ধারণ করিলেন। যথা,—

"পরকীয়া রস নাই গোলোক-ভিতরে।
তেকারণে ভগবান্ মানুষ-দেহ ধরে॥
মানুষ আকার ধরি মানুষী ক্রিয়া।
পরকীয়া আস্বাদয় আনন্দিত হৈয়া॥"

কিন্তু এ অবতারেও তাঁহার পূর্ণ রসাস্বাদন হইল না। তাই তিনি নবদ্বীপে অবতার গ্রহণ করিলেন,—

"সম্যক্ প্রকার রস আস্বাদন না হৈল।
তে কারণে নবদ্বীপে অবতার কৈল॥"

হে মানব, ভগবানের দেশেও যে জিনিস নাই, যে জিনিসের জন্য ভগবান্ ব্যাকুল, শুধু ব্যাকুল নহে, তিনি দুই দুইবার যাহার জন্য অবতীর্ণ হইলেন, মহাদেব যাহার জন্য পাগল, তোমার কাছে সেই জিনিস থাকিতেও তুমি তাহাকে উপেক্ষা করিতেছ, ইহা কি কম দুঃখের কথা! তাই এখন বলি,—

"অতএব শুন ভাই পরকীয়া যজ।
রসিক হইয়া সভে পরকীয়া ভজ॥"

* * * *

"শুন হে রসিক ভাই ভুলিয়া কেনে গেলা।
চিন্তামণি বস্তু পাইয়া হেলে হারাইলা॥
জার লাগি ভগবান্ হইলা আকুল।
জার লাগি মহাদেব হইলা পাগল॥
সেই পরকীয়া হয় ব্রজলোকসার।
বেদবিধির অগোচর তিন লোকের পর॥"

ইহার পর পরকীয়া রস কাহাকে বলে, তাহার কত রকম প্রকার, প্রকার-ভেদে কি কি নাম, কিরূপ অবস্থায় ইহা বাঞ্ছিতার্থ প্রদান করে, বহু প্রকৃতিতে রস আস্বাদনই উৎকৃষ্ট এবং ইহারই শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি বিষয় বর্ণনা করিয়া গ্রন্থের পরিসমাপ্তি করা হইয়াছে। এই সকল বিষয় আপনাদের বিস্তৃতভাবে শুনিয়া কাজ নাই এবং আমিও তাহা আপনাদের নিকট বর্ণন করিতে অক্ষম। মাত্র গ্রন্থের শেষ হইতে কবির ভণিতা উদ্ধৃত করিয়া ইহার বিবরণ শেষ করিতেছি।—

"মানুষ ভজন আর কত বা কহিব।
অল্পাক্ষরে কহি কিছু নাহি অনুভব॥
রসিক নাগর আর রসিক নাগরী।
দোঁহার নিছনি লইয়া আমি জাই বলিহারি॥
সংক্ষেপে কহিলাম এই শ্রীরসমঙ্গল।
এই রসতত্ত্ব জানিলে সকল কুশল॥
বেদগুপ্ত কথা এই শ্রীরাধা বিনু মরি।
রসতত্ত্বকথা সব কহিব বিবরি॥
অন্তরের কথা এই নহে প্রকটন।
শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণ জাহার ভাবন॥
শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম করি আশ।
শ্রীমঙ্গলরসকারি [কা] কহএ কৃষ্ণদাস॥"

উপরে যে সহজিয়া ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় পুথির পরিচয় দেওয়া হইল, এই ধর্ম্ম প্রথম কে, কোন্ সময়ে প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা নির্দ্দিষ্টরূপে অদ্যাপি জানা যায় নাই। তবে এ সম্বন্ধে যে সকল পুথি-পাঁজি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে অনুমান হয়, খৃষ্টীয় অষ্টম অব্দের কোন' এক সময়ে বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায় হইতে এই সহজযানের উদ্ভব। সহজিয়া ধর্ম্ম আজকাল আমরা যে আকারে দেখিতে পাইতেছি, ইহার প্রথম প্রবর্ত্তয়িতা যে ঠিক এই ভাবেই ইহার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা বলা ঠিক নহে। আমরা দেখিতে পাই, যে কোন মহাপুরুষ নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করেন, তাহা

প্রথমে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধই থাকে। মহাপুরুষ তাঁহার সারা জীবনের কঠোর সাধনায় যে সত্য আবিষ্কার করেন, তাহা তিনি লুকাইয়া রাখিতে চাহেন না,—সংসার-পাশে আবদ্ধ জীবের উদ্ধারের জন্য তিনি তাহা প্রচার করিয়া থাকেন।—কেননা, মহাপুরুষ করুণাময়। কিন্তু সাধারণে মহাপুরুষের এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারে না বলিয়া অনেক অনধিকারী লোক ইহাতে প্রবেশ করে এবং তদ্দ্বারা ক্রমশঃ নির্ম্মল ধর্ম্মে আবর্জ্জনা প্রবেশ করিয়া থাকে; ভারতের তথা পৃথিবীর যে কোন প্রাচীন ধর্ম্ম এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতে সমর্থ। বর্ত্তমান সহজিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। বৌদ্ধ মহাযান-সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমত যেরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, হীনযানের ধর্ম্মমত সেরূপ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সহজিয়া ধর্ম্ম মহাযানসম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত বলিয়া ইহাও যে নানা পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমান আকারে আসিয়া পৌছিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানে এবং মুসলমান আক্রমণে যখন বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায়, তখনই ইহা হিন্দুত্বের আবরণে নিজ অঙ্গ ঢাকিয়া হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। জগদ্দল, বিক্রমশীল, নালন্দ প্রভৃতি বিহারের বৌদ্ধ আচার্য্য ও পুরোহিতগণ যখন মুসলমান আক্রমণে নিহত হইলেন ও হতাবশিষ্টেরা তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে পলায়ন করিলেন, তখন তাঁহাদের গৃহী শিষ্যগণ অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছিলেন। এই সময়ে বাঙ্গালার তান্ত্রিকগণ ইহাঁদিগকে আশ্রয় দিলেন—হিন্দু বলিয়া গ্রহণ করিলেন। মুসলমানেরাও অনেক বৌদ্ধকে মুসলমান করিয়া ফেলিলেন। অনুমান হয়, এই সময়েই সহজিয়া ধর্ম্ম হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়া থাকিবে; সহজিয়াগণ এই সময়েই বুদ্ধকে ছাড়িয়া রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার অনুকরণে নিজেদের মধ্যে পরকীয়া-সাধনা প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকিবেন। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বেই যে সহজিয়া মত হিন্দুধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ চণ্ডিদাস। চণ্ডিদাস যে সহজিয়াধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চণ্ডিদাস যখন রজক-কন্যাকে নায়িকারূপে গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহার সামাজিক লাঞ্ছনার কথা দেখিয়া মনে হয়, হিন্দু-সমাজে এই ধর্ম্ম তখনও সম্পূর্ণরূপে গৃহীত হয় নাই। মহাপ্রভু চণ্ডিদাসের পদাবলীর আলোচনা করিতেন, তাহার প্রশংসা করিতেন, খুব সম্ভব এই সূত্র অবলম্বন করিয়া এবং নিজেদের ধর্ম্মমতের প্রবর্ত্তক একজন হিন্দু মহাপুরুষ হইলে, তাহা হিন্দু-সমাজের শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবে এবং মহাপ্রভুই তাহার উপযুক্ত পাত্র, এই সকল কারণে পরবর্ত্তী কালের সহজিয়া ধর্ম্মের লোকেরা মহাপ্রভুকেই তাঁহাদের ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকিবেন। বস্তুতঃ মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত বিশুদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত ইহার কোন সম্বন্ধই নাই।

শ্রীনলিনীরঞ্জন পণ্ডিত।

মানস-বৃন্দাবন

কে বলে রে বৃন্দাবন দূর-দূরান্তরে
সে যে রাজে আমাদের আপন অন্তরে।
ভক্তির যমুনা হেথা কুলু কুলু ধায়,
কল্পনার কুঞ্জবনে প্রেম-নীপ ছায়।
রসরূপী কৃষ্ণ হেথা বাজায় বাঁশরী
ভাবময়ী রাধা সনে সকল পাসরি।
বাৎসল্যের যশোমতী হেথায় বিরাজে,
ব্রজের দুলাল নাচে স্নেহ-গৃহ-মাঝে।
প্রীতি-শান্তি-রূপে হেথা শ্যামলী-ধবলী,
চরে সদা চরণেতে স্বার্থ-তৃণ দলি'।
হেথা করে কত রঙ্গ লয়ে প্রাণসখা
মান-অভিমানরূপী ললিতা বিশাখা।
জটিলা কুটিলা সম সঙ্কোচ সংশয়
ঘটাতে বিচ্ছেদ হেথা পাছে পাছে রয়।
যৌবন-বসন্তে হেথা নব অনুরাগে,
হয় সে হোলির খেলা প্রণয়ের ফাগে।
হেথা সেই রাসলীলা হয় অভিনয়
মিলন পুলক মাখা শুভ্র জোছনায়।
হেথা সে ঝুলন-দোলা দোলে ওগো দোলে
বাঞ্ছিতের পরশেতে দুরু দুরু তালে।
যায় যবে প্রিয়তম এ গোকুল ছাড়ি'
নিশি-দিন ঝরে হেথা বিরহের বারি।

শ্রীজ্ঞানাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

কমলের দুঃখ

(মায়া—কমল)

প্রাণের সখা!

আজ বর্ষার ধারা আমায় আকুল ক'রে দিলে—মনে পড়ে, সেই একদিন—ঝর্ঝর অবিরাম বারিবর্ষণ—আর আজ এই দিন। সে দিন—সে দিন মেঘে মেঘে, জলের ধারায় বিদ্যুতের চুম্বনে, দাদুরীর প্রমত্ত ডাকে, শিখিনীর পাকে পাকে নাচের সঙ্গে কেকা-রবে, কদম ফুলের শিহরিত কেশরের জাগরণের মাঝে তোমার মিলনের মধুর সুর,—আর আজ এই দিন; আজ আকাশ, সাগর, নিখিল ভুবনে তেমনি মেঘের কলরোল, পাতায় পাতায় সে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে জলের ধারা, মেঘ মেঘের পানে চেয়ে সেই একই সুরে তান-তরঙ্গ তুলেছে, প্রতি পল্লবের মর্ম্মরে—ধ্বনি লুটিয়ে কাঁদ্‌ছে, সবই তোমার বিরহের সুর—সবই যেন তোমার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সারা জগৎ আজ তোমাকে পাবার জন্যে ধেয়ে চলেছে। মেঘ তার দাহনে জ্বলে উঠেছে; ওই গুরু গুরু ডাক্‌ছে, সে শুধু তোমারেই বুঝি চায়—তোমার বিরহে যেমন আমার বুকের মাঝে গুরু গুরু কর্‌ছে, তেমনি গগনে বুঝি জলদও আজ বিরহের বেদনা তার ওই বিপুল আকাশভরা সুরে জগতের কাছে তোমার বিরহ গাইছে,—তরুলতা সে গানে বুকের ভারে চোখের জল ফেল্‌ছে, অবিরাম ঝিঁঝিঁর যে ঝঙ্কার ঝমকে উঠ্‌ছে, সে ঝঞ্ঝনায় আমার সমস্ত পাঁজরা যেন ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে উঠ্‌ছে,—এ বর্ষার রোলে এ বিরহ আরও ঘনিয়ে আসে, পাতা কাঁদে, ফুলের উপর অশ্রু ঝ'রে পড়ে—সমস্ত তরুলতা—বিহগেরা—মর্ম্মর নিশ্বাসের সঙ্গে প্রাণ খুলে আকুল হয়ে উঠ্‌ছে, তবুও তুমি আস্‌বে না! তুমি যদি এখানে থাক্‌তে, না—না, সেখানে থেকে—যেখানে আছ, সেখান থেকেও ত এ মেঘের ডাক শুন্‌তে পাচ্ছ, সেখানেও এমনি বরিষার ঘোর ঘনঘটা গর্জ্জন ক'র্‌ছে, সেখানেও ওমনি ওই বকুলগাছের ঝোপের মধ্যে নীড়ের মাঝে ব'সে মেঘের ডাকে ভয়ে ত্রস্তে ডাহুকী তার ডাহুকের বুকের মধ্যে মিশিয়ে যাচ্ছে, এ দেখ্‌লে কে থাক্‌তে পারে নাথ—এ বিরহ যে অসহ—আর সহনে না যায়, আমি এত ক'রে মেঘকে বল্‌ছি, ওগো পুষ্কর, তুমি একটিবার তার কাছে যাও গো—আমার হৃদয়ের নিভৃত কূজনধ্বনি যেন সে তোমার কাছে বয়ে নিয়ে যায়। সাধ হয়, ঐ ডাহুকীর মত

তোমার বুকের মাঝে এ গর্জ্জন-বর্ষণের ধারা হ'তে নিজেকে একবার রক্ষা করি। দিকে দিকে তিমির ভ'রে উঠ্‌ছে, তার মাঝে বিজলীর ঝলক, সন্ত্রাসে প্রাণ কাঁপ্‌ছে নাথ—আমি কত ক'রে আমার এ বিরহখানিকে লুকোতে চাই—এরা আমার সব কথাই কেঁদে জগতের কাছে ব'লে দেয়, আমিও আত্মহারা—আর যে লুকাতে পারি না যে,—তুমি আমি মানুষ না হয়ে যদি ওই ডাহুক-ডাহুকী হ'তাম। আমার কঠিন প্রাণ—তার উপরে এই বর্ষণের ঘোর ধারা, আমি যে আত্মহারা, প্রাণ জ্বলে যাচ্ছে—তবু ত এ বের হয় না। একে এই মেঘের রোল—তায় বর্ষণের দাপটে—প্রাণ থাকে কি বাহিরায়। হায়, তাই নিখিল বিশ্ব যেন আজ এ বিরহে এক হয়ে গেছে।

আমার কমল, আমি এত দিনেও তোমার রূপের সীমা ঠিক কর্‌তে পার্‌লাম না—জগতের সকল সৌন্দর্য্য থেকে তোমাকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এই প্রাণের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌তে চাই—দেখি অন্তরে বাহিরে তুমি! যে দিকে ফিরে দেখি, সেই দিকে তুমি—যত তিমির ভরে ওঠে, তত সেই আঁধারে তোমার রূপ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়—তিমির যেন কোথায় চ'লে যায়—মনে যদি এ হয়, বাইরে তবে এ হয় না কেন? তুমি এসে, কেন এ তিমির আমার দূর কর না নাথ? ওই শ্রাবণের ঘনঘোর মেঘে অবিরাম ঝর্ঝর ধারা,—তার উপরে ভিজে হাওয়ায়—ভেজা মেঘ ভাসিয়ে হাওয়ার জোর,—প্রাণ যেন মেঘের মতই ধারা বর্ষাতে চায়—বৃষ্টিধারা যেমন সবাইকে চুম্বন করছে, তেমনি জলের ধারার মত চুম্বনে আকুল ক'রে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। মেঘ যেমন বিদ্যুৎকে—বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখেছে, তেমনি তোমাকে লুকায়ে রাখ্‌তে সাধ হয়। পিয়া! পিয়া! এ দারুণ বরিষায় তুমি দূরে, নারীর সোয়াথি কোথায় পিয়া? আমার এ দেহ-মঞ্জরী অজানিত আবেগে ফুটে উঠ্‌তে চায়, নিঃসঙ্গ একাকিনী শুধু ওই মেঘপানে চেয়ে চেয়ে চোখেও ধারা পড়ে, তায় নিদারুণ পাপিয়া কেবলই 'পিউ' 'পিউ' রবে সারা বরষার ধারা ছাপিয়ে ডাক্‌ছে—কত আর সইতে পারি নাথ! প্রাণের সমস্ত আবেগ, মনের সকল কথা, হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য্য এক চুম্বনে নিঃশেষ হয়ে যায়—সকল সুখের আবেশের পারে—ভাষা তাকে প্রকাশ করতে পারে না—তাই চুম্বনে সব শেষ ক'রে—মিলন ক'রে, ব'লে দেয় তুমি, তুমি! এ বর্ষাও ধরণীকে তাই ব'লে শেষ কর্‌ছে, মেঘ মেঘকে তাই ব'লে মিশিয়ে যাচ্ছে—বাতাস পাতার কানে—পুষ্পের প্রাণপুটে সেই চুম্বনে তার সকল হৃদয়ের আবেগ নিঃশেষ কর্‌ছে। বল্‌ছে—তুমি, তুমি! আমিও বল্‌ছি—তুমি, তুমি! তাই মেঘকে ডেকে বল্‌ছি, হে নীলাঞ্জনমাখা পিঙ্গলবরণ সজল জলদ, আমার কথা তারে

বল, তারে বল, ওগো বল, তুমি ত দেশে দেশে সকলের সুখ-দুঃখের কথা ব'য়ে নিয়ে যাও, তুমি ত সকল নদীকে, সকল তৃণশ্যাম শস্যক্ষেত্রকে, সকল শুষ্ক কঠিন বিরলতৃণ প্রান্তরকে ভরণ কর; যে নীরস, তাকে সরস কর, যে শুষ্ক, তাকে নূতন ফুলে মুঞ্জরিত কর, যে কঠিন—তাকে শ্যামল কর, ওবে সেই দেশের, যেখানে আমার প্রাণের পিয়া আছে গো, তার কাছে ঝরঝর্ রবে আমারি কথা বল, হে প্রিয়! হে সখা, হে বন্ধু, হে ভাই! তার কাছে একবার আমার এ দুঃখের কথা বল। বল ভাই! ভাই বল, তুমি ত বিদ্যুৎকে কখন ভুলে যাও না, তুমি ত চিরদিন অনুক্ষণ তাকে বুকের হিয়ার মাঝে লুকায়ে রেখেছ—সে কেন তবে আমায় ফেলে গেল, বল, শুধু তারে এই কথাটি শুধু বল। একবার বল। ইচ্ছা ক'রে কে কবে প্রাণের প্রিয়কে ফেলে চ'লে যায়—শুধু এইটুকু তারে বল। বল, আমার এই চোখের জলে-ভেজা কথা তারে বল,—

মম, দুঃখ-রাতি ঘন ঘোরা
থির বিজুরী পাঁতি চমকই, বরখত
ধারা শ্রাবণ ঝরঝোরা,
নিঠুর নিপট হা হা বঁধুয়া
নাহি তোয়ে কছু দয়া—
আজ্ শমন দিন, তুয়া বিন তুয়া বিন
জীয়ন মরণ একই ধারা।

(ইন্দু—সুধীর)

প্রাণের ওগো!

বলি, না বলে একেবারে যশোরে। তোমার কি রকম আক্কেল বল—মক্কেল পেলেই অম্নি ছুট্। খাবার নিয়ে ব'সে আছি, ও মা, কোথায় কি—একেবারে যশোরে; সহিসটা এসে বল্লে—বাবু যশোরে গেলেন, কি মামলা আছে—বল্লেন বাড়ীতে বলিস্। বেশ যা হোক্। দেখ, তুমি এলে না, আমার এমন কষ্ট হ'ল—এত ক'রে সমস্ত দুপুর বেলাটা ব'সে ব'সে খাবারগুলো তৈরী কর্লুম—আর তোমার খবরই নেই। কি করি, মনটা ভারি খারাপ হয়ে গেল—খাবারগুলো হাপুস্ হাপুস্ ক'রে নিজেই খেয়ে ফেল্লুম—কি করি বল।

হাঁ গা, যশোরে যে মাছ—তোমার হয় ত খাওয়াই হবে না। যাবার সময় কোন্ কিছু নিয়ে গেলে—তোমার যে কি বুদ্ধি, তা আমি জানি নি। কবে আস্বে? খোকা ভাল আছে। ইতি

তোমার
গিন্নী।

(সুধীর—ইন্দু)

প্রাণের হ্যাঁগো !

আমার ফিরতে এখন' চার পাঁচ দিন দেরী হবে। তোমরা সব ভাল আছ ত? দিদির খবরটা নিয়ো। হ্যাঁ, আর ওই নূতন ঘোড়া, কোথাও যাবার যদি দরকার নাও হয়, তা হ'লেও সকালে একবার গাড়ী জুত্‌তে ব'লো—বসিয়ে রাখে না যেন। আর তোমরাও ত একটু বেড়িয়ে আস্‌তে পার। নইলে বড়মানষী রোগ ধ'রে যাবে।

সকালবেলা মামলা—আমি ট্রেণ ফেলে—তোমার মাছ যোগাড় করতে যাব—খুব যা হোক্। লোকে ত 'যশুরে কই' বলে—কিন্তু এখানে দেখি, খুব বড় কই মাছত' মেলে।

এখানে যাদের হ'য়ে মক'দ্দমা করতে এসেছি, এরা সব কি যোগ—যাগ করে—আর তারা ম'রে গেলে কি ক'রে ফিরে আস্‌তে হয়, তার এরা খুব বক্তৃতা করে—আগে জানতুম না। এরাই ঠিক মামলা চালাতে পারবে—সব ভূতগুলো যখন এদের মুটোর মধ্যে। আমি বেশ ভাল আছি। তবে খুনী মকদ্দমা—ভূতে না আবার সাক্ষী দেয়। ইতি

তোমারই

সু—

(হেনা—গোলাপ)

একটা ঝড়্ উঠেছে লো—একটা ঝড় উঠেছে; আমার ভেতরকার সব যেন তোলপাড় ক'রে দিচ্ছে—সব বুঝি উল্‌টে পাল্‌টে যায়। কি করলুম—কি হ'ল—কে এ ঝড় তুল্‌লে—সব যেন এক ক'রে দিচ্ছে। ওই বাইরে ঝড়ে যেমন সব গাছগুলোকে দুলিয়ে ডাল ভেঙে এক করে দিচ্ছে, কোনটা কি গাছ চেনা যাচ্ছে না। তেম্‌নি আমার সব তোলপাড় ক'রে দিলে···সব ভাবগুলো যেন জড়িয়ে তাল পাকিয়ে ধেব্‌ড়ান তুলির কালির মত এক হয়ে গেছে। প্রতিশোধ—প্রতিশোধ নিয়ে ছুটে-ছিলুম—খবর পেলুম, মাষ্টারের কাছে, সুধীর বাবু এখানে নেই—ভাব্‌লুম, এই ঠিক্, যেমন ক'রে হোক্, মাগীর ঝাঁটার শোধ নিয়ে নগেনকে বল্‌তে হবে। নইলে প্রাণ ঠাণ্ডা হয় না। ভাব্‌লুম, যাই বা কেমন ক'রে—দু'পুর বেলা টিপ্ টিপ্ ক'রে বৃষ্টি পড়্‌ছে—কেন যে হঠাৎ এমন খেয়াল হ'ল, রাগে যেন সর্ব্বশরীর নিস্‌পিস্ করতে লাগ্‌ল—ইচ্ছে হ'ল, এখুনি ছুটে গিয়ে তাকে ঝাঁটার শোধ দিয়ে আসি, শেষ কি

খেয়াল চাপ্‌ল—বষ্টুমী সেজে বেরুলুম—মাষ্টার আমার বষ্টুমী সাজা দেখে বলে, "বষ্টোম দিদি, ও বষ্টোম দিদি, এমন রসকলি কাট্‌তে কোথায় শিখ্‌লি ভাই—পথে যে সবাই আছাড় খাবে লো, মাইরি!" ভেবেছিলুম কি জানিস্, গিয়ে খারাপ গান গাইব, যেই তাড়া করবে—খুব দু'কথা শুনিয়ে দেব'—তার ওপর পারি ত ঘা দিয়ে আস্‌ব—একলা সাহস ক'রে—যা থাকে কপালে যাই। গেলুম—দেখি, কেউ আমায় কোন রকম বাধা দিলে না, তখনও একটু একটু বৃষ্টি পড়্‌ছে—বরাবর অন্দরমহলের দরজায় গোড়ায় গিয়ে—'জয় রাধে কৃষ্ণ—ভিক্ষে দেবে গা'—এই কথা ব'লে গান ধরলাম—('ভিক্ষে দেবে গা' কথাটা বল্‌তে যেন গলাটা কে চেপে ধরছিল)—শেষ রঙের সুরে গান ধর্‌লাম—

আমায় ভিক্ষে দিয়ে যাও।
আমি প্রেমের দায়ে ভেক্ নিয়েছি প্রেম বিলায়ে যাও।
চাই নাক' হীরে মাণিক
শুধু তোমায় দেখ্‌ব' খানিক
এসেছি ভাস্‌ব' ব'লে প্রেমের জলে, শেষ উধাও,—
ঘুরে ফিরে রূপের হাটে
এসেছি লো তোমার ঘাটে—
বটে তুমি—সেই ত বটে, দেখি ও মুখ তুলে চাও।

গান গাইতে গাইতে দেখ্‌লাম, বারাণ্ডার ওপর থেকে দাঁড়িয়ে একজন শ্যামবর্ণ মেয়েমানুষ—"বাঃ, তোমার ত বেশ গলা বাছা, তা গেরস্তর বাড়ী অন্য গান গাও না—এসনা—এস, এদিক্ দিয়ে ওপরে এস ত"—আমি ত তাই চাই—তাড়াতাড়ি ওপরে উঠ্‌লুম,—আমাকে দেখেই একটু যেন থম্‌কে গেল; বোধ হয়, রূপ দেখে বল্‌লে—"তোমার এমন রূপ, এই বয়েস, তুমি ভিক্ষে করতে বেরিয়েছ"—আমি বল্লাম, "কি করব—পেটের দায়ে"—এই ব'লে যেমন এগিয়ে যাব—ঘরের দরজার ভেতর দিয়ে যা দেখ্‌লাম গোলাপ—আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌ল—সেই দিকে তাকিয়ে অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলুম—সমস্ত শরীর ঘেমে মাথাটা যেন বোঁ ক'রে ঘুরে গেল—সেইখানে ব'সে পড়্‌লুম—দেখ্‌লাম নগেনের স্ত্রী এক রাশ ফুল নিয়ে ব'সে রয়েছে। আমার প্রতিশোধ লোপ হয়ে গেল—'এও তাই—ওঃ, কি জ্বালা—সব ছেড়ে তাই এ দুর্দ্দশা!' সে মেয়েমানুষটা আমার অবস্থা দেখে—ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বল্‌লে—"ও কি গো, তুমি অমন করছ কেন বাছা?" আমি বল্লাম—"আমার বুকে একটা হঠাৎ ব্যথা ধ'রে ওই রকম হয়েছিল—কমে গেছে—এখন যাই"—ব'লে যেমন আমি নীচের দিকে নামব ব'লে

ফিরেছি, অমনি তার চমক ভেঙে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একেবারে লাফিয়ে উঠেছে—চেঁচিয়ে বললে—"দিদি! দিদি! সেই মাগী"—তখন আর পালালুম না। সামনে দাঁড়িয়ে রইলুম—খানিক পরে—বললুম—"হাঁ, আমি সেই মাগী, রাগের জ্বালায় তোমার ঝাঁটার শোধ দেব মনে ক'রে একলা এই দুঃসাহসের কাজ করেছি—কিন্তু এসে যাকে গাল দেব মনে করেছিলুম,—তার পায়ের ধুলো নিতে ইচ্ছে হ'চ্ছে—কিন্তু তা ত পারব না—বড় দুঃখ গো বড় দুঃখ—তোমাদের ছায়া মাড়াবার, তাতে লোটাবার অধিকার আমাদের দেয় নি"—অবাক্ হয়ে দুজনে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল—বললুম "ভিখিরী হয়ে 'জয় রাধে কৃষ্ণ' ব'লে ভিক্ষে চাইতে এসেছি—ভিক্ষে দাও, ক্ষমা ভিক্ষে দাও—পুণ্যবতী তোমরা—সুখে থাক—আর কি বলব" এই ব'লে তাড়াতাড়ি ছুটে পালিয়ে এলুম,—রাস্তায় তখন জোর হাওয়া উঠেছে। গাছগুলো দুলে দুলে উঠ্ছে, মনে হ'তে লাগ্ল—পায়ের তলা থেকে মাটী স'রে টলে যাচ্ছে—মাথা দিয়ে আগুন ছুটছে। তখন বাড়ীতে এসেছি, খুব ঝড় আরম্ভ হয়েছে। মেঘগুলো যেন এক একটা প্রকাণ্ড কাল পাহাড়ের মত উড়ে যাচ্ছে। ঝড় উঠেছে—সত্যি ভেতরে বাইরে ঝড়। তোলপাড় ক'রে দিলে। কি হ'ল যূঁইফুল! আমি বুঝেছি, এইবার আমায় ভাঙনে ধরেছে।

সন্ধে হয়ে গেছে। দরজা বন্ধ ক'রে অন্ধকার ঘরে চুপ ক'রে বসে আছি—আর কিছু বাইরের দেখ্তে ভাল লাগ্ছে না—যতক্ষণ না তাকে পাই, ততক্ষণই যেন আমার এই আঁধারই ভাল—ওঃ! এ তিমিরে যদি তারে পাই, দুনিয়ায় আমার কিছুরই ভয় নেই—তোরা হয় ত মনে করছিস্—আমি মরিছি; মরিনি লো—তবে তাকে যদি পাই ত' মরি। সন্ধ্যের পর নগেন এল- বললে "এ কি, তুমি এমন বষ্টুমী সেজে? এক পা ধূলো—ময়লা একখানা কাপড়—এ কি, তোমার কি হয়েছে?" মনটা তখন কোন্ রাজ্যে—কথাগুলো যেন ছুঁচের মত বিঁধ্ল; পেছনে ছিল হারু মাষ্টার—সে আবার ঠোকর কাট্লে—"বন্ধু, বুঝ্তে পার্লে না, দশা লেগেছে—চুবন খেয়ে ভুবন ডুবেছে—বুঝি নদে ভেসে যায়! মেঘের রকম দেখে বিরহিণীদের মত অভিসারে—মুখরম্ অধীরম্ ত্যজ মঞ্জীরম্—কি বল"—এমনি বিরক্ত হতে লাগ্লুম—তার পর মুখে কিছু না ব'লে নিজেকে সাম্লে নিলুম; কিন্তু থাক্তে পারলুম না—মাথাটা তখন কেমন করছিল, বল্লুম,—"দেথ আমার শরীর মন ভাল নেই—আমার বিরক্ত কর' না—আমার ভাল লাগে না—আর এস না—যাও।" শুনে নগেন ত তখন রেগে চলে গেল—মাষ্টার বললে, "বন্ধু—কাজটা কি ভাল হ'ল মুখোমুখি"—আমার এমন রাগ হ'ল, ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্লাম—বল্লাম—"শীগ্গির এখান থেকে বেরো—নইলে অপমান হবে!" আমার সে রকম দেখে, তাড়াতাড়ি সেও চলে গেল—যেন হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচ্লুম।

আর এদের সঙ্গ—আর এদের কথা—এদের কিছুই আমার ভাল লাগ্‌ছে না—এখন কেবলই অন্য দিকে ছুটেছি। কতক্ষণ এমন চুপ ক'রে বসেছিলুম,—আর নিজের মনে ঝড় বয়ে যাচ্ছিল—সে যে কি ভাবনা, তা আমি বুঝ্‌তে পারিনি—কেবল কাঁদ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল—অনেক ক্ষণ মাটীতে পড়ে কাঁদ্‌লুম,—সে ফোঁপানি আর কিছুতে যায় না—কিন্তু সে কান্না মুছাবার জন্যে ত কেউ এল না। যাকে ডাকি, সে ত শুন্‌তে পায় না।

তোরই হেনা।"

(নগেন—কমল)

কমল দাদা!

বড় মুস্কিলে পড়ে' তোমায় এই চিঠি লিখ্‌ছি। আমার, মধ্যে অনেক টাকা খরচ হয়েছে—হাতে কিছুই নেই—একটা ধার ছিল, তারা বড়ই গোলযোগ কর্‌ছে। তুমি বোধ হয় জান যে, আমার সমস্ত জমিদারী, এমন কি, এই বাড়ীখানা শুদ্ধ বাঁধা পড়েছে—নূতন ধার কর্‌বার উপায় নেই। লজ্জার মাথা খেয়ে বৌদির কাছে ব'লে পাঠিয়েছিলাম—তিনি তোমায় বল্‌তে বলেছেন। তোমার কাছে বল্‌তে আমার কুণ্ঠিত হ'তে হলেও, আমি বল্লাম—কুড়ি হাজার টাকার আমার দরকার—তুমি কি আমায় এই টাকা যোগাড় ক'রে পাঠাবে, নইলে আমায় হয় ত কাল জেলে দেবে—কি কর্‌ব, ঠিক কর্‌তে না পেরে তোমার কাছে এসে পড়্‌লাম। ইতি।

তোমার স্নেহের
ভাই।

(কমল—নগেন)

প্রাণতুল্যেষু

তোমার কুড়ি হাজার টাকার যে কারণেই দরকার হ'ক—আমি আজ রাত্রেই দাওয়ানজীকে তার করেছি, তোমায় নগদ বিশ হাজার টাকা দেবার জন্য। আশা করি, তোমার এতে দরকার মিট্‌বে। জমিদারি কত টাকায় বাঁধা আছে, তা জান্‌তেও দেওয়ানজীকে ব'লে দিয়েছি—যাতে তার সুব্যবস্থা হয়, তার চেষ্টা কর্‌ব। আমার কাছে তোমার কোন বিষয়ে লজ্জা বা কুণ্ঠিত হবার কারণই নেই—তুমি আমার ভাই—ভায়ের কাছে যদি লজ্জা কর—তবে জগতের কাছে কথা কইবে কি ক'রে? জেন' ভাই, তোমার বিপদে আমার বিপদ, তোমার দুঃখে আমারই দুঃখ, তোমার সম্পদে আমারই সম্পদ্‌।

এক মার পেটে দুজনে না জন্মালেও তবু আমরা ভাই—আমার বড় আপনার—এ জগতে তোমার চেয়ে প্রাণের আপনার আর কে আছে ভাই! সব ফেলে দিয়ে আয় ভাই—আমার বুকে আয়—তোর কিসের ভয়, কিসের ভাবনা, আমি যখন তোর পাশে রয়েছি—এ জগতে শুধু ভাই-ই শক্তিশেল বুকে নিতে পারে, আর কেউ পারে না। আমার স্নেহাশীষ নিয়ো। মনে দুঃখ রেখ না—অকপটে আমার কাছে যখন যা দরকার হবে, তাই চেয়ো—আমি তাতে নিজেকে আরও সুখী মনে করব। ইতি।

তোমার স্নেহের

কমল দাদা।

(ইন্দু—শৈল)

ঠাকুরঝি,

ভাই, তোমার চিঠি পেয়েছি—পেয়ে অবধি মনটা যেন কি রকম হয়ে রয়েছে, কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে মন আমার এত খারাপ হয়ে গেছে, আর থেকে থেকে এমন ভয় করছে, কিছু যেন ঠিক ধরতে পাচ্ছি নি। দেখলাম, আকাশে তারা নেই—নক্ষত্র নেই—সব অন্ধকার মেঘে ঢাকা; যত সেই অন্ধকারটার পানে চাই, মনে হয়, যেন আকাশের মত সব খালি। তল-অতল নেই, কেবলই অন্ধকার। হুহু ক'রে বাতাস বইছে, অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না—তবু যেন মনে হ'তে লাগল, বাতাসে সেই ভয়ানক আঁধার দুলে দুলে উঠছে—আমি যেন একটা প্রকাণ্ড চণ্ডীমণ্ডপের আটচালার ছুটো খোঁটা ধ'রে দাঁড়িয়ে আছি। আটচালাটা সব খোলা দিয়ে ছাওয়া—মাঝে মাঝে অন্ধকার মেঘে বিদ্যুতের আলো, চিরে চিরে উঠতে লাগল, আর সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক ঝড় উঠল। সে ঝড়ের আর দিশপাশ নেই, বড় বড় গাছপালা যেন মড় মড় শব্দে ভেঙ্গে কোথায় উড়ে গেল; মনে হ'ল—যেন কতকগুলো পিশাচ যুদ্ধ করছে, সমস্ত আটচালা যেন দুলতে লাগল। আমি দুহাত দিয়ে তার খুঁটি আঁকড়ে রইলাম; যত জোরে জোরে দোলে, তত আমি চেপে চেপে ধরি; ঝর ঝর ক'রে খোলা ভেঙ্গে গুঁড়ো পড়তে লাগল, তার পর একটা দমকা হাওয়া এল, ভয়ানক শব্দে আটচালাখানা উপড়ে পড়ে গেল। আমি চীৎকার ক'রে উঠলাম, মাথার কাছে জানালা খোলা ছিল—আমার গায়ে বৃষ্টির ঝাপট লাগল—মিহির ঘুমুচ্ছিল বুঝি, সেও কেঁদে উঠল; মায়া আমার কাছেই থাকে, সেও কেমন করে উঠল। বুকের ভেতর যেন টিপ টিপ করতে লাগল—বাবা! সে কি ভয়ানক স্বপন! মিহিরের কাল রাত থেকেই খুব জ্বর, আমার বড় ভয় করছে ঠাকুরঝি! মায়া ত দিন-রাত ছেলেটাকে

বুকে ক'রে রয়েছে, আর ছেলেটাও একবার আমার কাছে আস্‌তে চায় না—নামালেই কেবল মাসি, মাসি। সে এসে অবধি আর আমার কাছে ঘেঁস দিতে চায় না। তার ত আহার-নিদ্রা বন্ধ, এক দণ্ড কাছ থেকে নড়বার যো নেই—উঠ্‌লেই চেঁচিয়ে ওঠে। এমন ত দেখিনি, আমার ত হাত-পা আস্‌ছে না—কি করি ভাই! উনি গেছেন যশোরে, আস্‌তে পাঁচ সাত দিন দেরী হবে, আমার যেন আর কি রকম কর্‌ছে! অমর এসেছিল, তার আবার একজামিন্। এ সময় যদি কমল থাক্‌ত। কি কর্‌ব, বুঝতে পার্‌ছি না, বেলা একটা বেজে গেল, ছুঁড়ীটা রাত থেকে কোলে ক'রে বসে আছে,—সেটাকে দুটো খাওয়াইগে। টেনে নিয়ে না গেলে ত কোন দিন যেতে চায় না। খাওয়া-দাওয়া সব ত্যাগ করেছে। ছেলেটা থেকে থেকে কেবল 'কমল মামা, কমল মামা' কর্‌ছে। ভাব্‌ছি, তাঁকে তার কর্‌ব। তাঁকে খবর দিতে সাহস হয় না—পাছে তাঁর মন খারাপ হয়। শুনেছি, খুনী মকদ্দমায় গেছেন। কি যে কর্‌ব, ভেবে ঠিক কর্‌তে পার্‌ছি নি। আমার প্রণাম নিয়ো। ইতি।

তোমার স্নেহের
সু-বউ।

(নগেন—কমল)

কমল দাদা,

দাওয়ানজী তোমার তারের মর্ম্মে টাকা দেওয়া প্রথম যুক্তিযুক্ত মনে করেনি, তার পর বৌদিকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক'রে তবে দেয়। তোমার ঋণ আমি কি ক'রে শোধ দেব। উপস্থিত বিপদ থেকে তোমার দয়ায় উদ্ধার হলাম।

আশ্চর্য্য! আমায় হারু মাষ্টার বুঝিয়েছিল যে, বিষয় ভাগ না ক'রে নিলে সবই তুমি হাতের মধ্যে নিয়ে নেবে, এখন দেখ্‌ছি, তা নয়, কি ভুলই বুঝেছিলাম।

জমিদারী ইত্যাদি সবই বাঁধা—সে অনেক টাকা—সুদে আসলে সাত লক্ষ টাকা হয়েছে—এ টাকা আর তিন মাসের মধ্যেই প্রায় বেশীর ভাগ শোধ কর্‌তে হবে, নইলে জমিদারী নীলামে উঠ্‌বে। কি যে সব করেছি—কি যে শেষে দাঁড়াল, এখন তা ভেবে কূল-কিনারা ঠিক কর্‌তে পারি নি।

বৌদি সে দিন ডেকেছিলেন, লজ্জায় তাঁর কাছে মুখ দেখাতে পাচ্ছি নি। মনে হচ্ছে, কেনই সব এমন কর্‌লুম—সব গেল, শেষ কি হ'ল, কি হবে, তাই এখন ভাবনা হয়েছে।

দাওয়ানজী আমার সঙ্গে সে দিন আর অন্য কথা কইলে না, শুধু টাকাগুলো আমার সাম্‌নে রেখে গুণে নিতে বল্‌লে। সবাই এখন আমায় ঘৃণা করে। এমনি সব উল্‌টে গেল। ইতি।

তোমার ভাই।

(শৈল—ইন্দু)

চিরায়ুষ্মতীষু,

সু-বউ, তোদের হ'ল কি—আমি বড় আশ্চর্য্য হয়ে গেছি, সেই চিঠি লিখ্‌লি—তার পর শুন্‌লাম, একটু ভাল আছে। আমি এ দিকে হাঁপিয়ে মরি, ঠাকুর করুক—আহা, বাছা আমার নীরোগ হোক, কিন্তু মনটা বড় ধড়্‌ফড়্‌ কর্‌ছে, কি কর্‌ব, কুশীকে পাঠালুম, ব'লে গেল ভাল আছে। কমল এসেছে, তাকে জিজ্ঞাসা করি, সে বলে ভাল আছে। কিন্তু মন যে কেমন করে ভাই! তাই ছট্‌ফট্‌ ক'রে উঠি। এদের মুখের ভাব কেন এমন? বেশী কথা কয় না—বলে না কেন?

কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখে আরও আমার মন যেন কি হয়ে গেছে। এমন আশ্চর্য্য স্বপ্ন কখন দেখিনি। দেখ্‌লাম, খুব আশ্চর্য্য সুন্দরী, ঠিক যেন তোর মার মত—তার কপালে, যেমন সকাল হবার আগে শুকতারাটা জ্বলজ্বল করে, এমনি একটা তারা তার কপালে জ্বলজ্বল কর্‌ছে। মেঘের উপরে ব'সে—সে মেঘে যেন আলোর ঢেউ মেঘের মাথায় মাথায় খেল্‌ছে—নীল আভার কাপড় হাওয়ায় উড়ে লুটিয়ে যাচ্ছে আর ছোট ছোট তারাগুলো সেই আঁচলে যেন ফুটে ফুটে খেলা কর্‌ছে—তার কোলে মিহির ব'সে আছে আর হাস্‌ছে। সে কি মধুর হাসি, আমায় যেন বল্‌লে, 'পিসীমা, কই ধর দিখি।' আমি যেমনি তাকে কোলে ক'রে নিতে গেলাম—মিহির হেসে ফেল্‌লে আর সেই সুন্দরী মেয়েটা তার মুখে চুমু খেলে—আর অমনি মিহির কোথায় মিলিয়ে গেল। আর সেই মেয়েটার একরাশ অন্ধকারের মত কাল চুলের ঢেউয়ের ওপর একটি ছোট তারা ফুটে উঠ্‌ল। শুন্‌তে পেলাম, মিহির যেন বল্‌ছে, 'পিসীমা, এই দেখ, আমি কেমন তারা হয়ে ফুটেছি।' অমনি ছাঁৎ ক'রে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। কি জানি, তার পর থেকে প্রাণটা কেমন কর্‌ছে, আমার মনে হচ্ছে, কার যেন কি হয়েছে, কিন্তু সবাই এরা আমার কাছে লুকোচ্ছে।

খোকা কেমন আছে, তোরা সব কেমন আছিস্‌, ভাল ক'রে খবর দিস্‌ বাপু, আমার ত যাবার সময় হয় না, তা না হ'লে যেতাম। ঠাকুরের সব সার্‌তে, নিজের পূজো-আহ্নিক শেষ কর্‌তে কর্‌তে বেলা পড়ে আসে, তার পর ঠাকুরের শেতলের সব ব্যবস্থা

কর্‌য়া—দেখ্‌তে দেখ্‌তে রাত এসে পড়ে, কখন্‌ যাই ? জানিস্‌ ত আমার রকম। আমার আশীর্ব্বাদ নিস্—আর সু-ভাইকে বলিস্‌, একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে—আমার একটা কথা আছে। সে এসেছে ত ? আর দেখ্‌, ছোট বউকে জিজ্ঞাসা করিস্‌, গয়নার বাক্সের চাবী কি সে নিয়ে গেছে—আমার এত দিন পরে মনে হ'ল। গয়না ত সে প'রে যায়নি।—তাকে বলিস্‌ যে, বাক্স কি তার কাছে পাঠিয়ে দেব ? সে যখন এখানে আর আস্‌বেই না, তবে আমি ও রেখে কি করব ? আর আমার বয়স হ'ল, কবে আছি কবে নেই, এত আর সামলাতে পারি নি। আর কদিনই বা থাক্‌ব। পাথরের কাছে এত বলি, সে কেবল হাসে; যখন কথা না ব'লে হাসে, তখন আর কদিন, দিন হয়ে আস্‌ছে। যে কদিন আছি, মাঝে মাঝে খবর দিস্‌।

সব দিক্‌ তাকাতে আর পারি না। তবে মনটা মাঝে মাঝে কেমন ক'রে ওঠে, তাই আবার ভাব্‌তে বসি; নইলে আমি ত দেখে শুনে পাথর হয়েই রয়েছি। নগেন এই কটা দিনের মধ্যে সমস্ত নষ্ট করলে—সবই তার গেছে, সে ভাবনাও আমার ত—ফেলে দিয়েও ফেল্‌তে পারি নে। সে দিন মুখ শুকিয়ে এসে দাঁড়াল, প্রাণটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল। ঠাকুরের ইচ্ছা—কমল সব বিষয়েই ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। তাতে নিবৃত্তি ত হবে না। সে আবার সমান ভাবেই চলেছে। যাক্‌ গে, তোদের ভাল খবর আমায় দিস্‌। ইতি।

তোমার স্নেহের ঠাকুরঝি।

(নগেন—হেনা)

বাঃ বাঃ বিবি সাহেব, খুব জবর সওদা করালে বাবা! বাঃ বাঃ! সাত লাক যেন খোলামকুচির মত ছিনিমিনি খেলা গেল, এমন অথৈ জল—সে আর ঢেউ তুল্‌তেই দিলে না। এ কি কম কেরামতি! পায়ের নূপুরে রুণুঝুণু—আর পায়ের পাতায় ধিন্‌ ধিনিতা—আর অমনি ছিনি মিনি—আঃ—কেয়াবাৎ তারিফ!!!

দেখ, আমরা বাবা সুখের পায়রা, যেখানে সুখ পাব, সেখানে সুখের খেলা খেল্‌ব। এমনই বা কি চাঁদ—যে, তোমার ফাঁদেই হাঁ ক'রে প'ড়ে থাক্‌ব? মাষ্টার ঠিক বলে "এ গালে ঠোনা, ও গালে ঠোনা, তবে যদি বলে সোনা—বাবু সে হেনা।" সোনার বদলে—ঠোনাই মেলে। তার পর দিনদুপুরে—কার কুঞ্জে নববৃন্দাবনের রাস খেলাতে গিয়েছিলে চাঁদ? আমি কিছু খবর রাখি নি? মাষ্টার সব জেনে এসেছে। একেই বলে "পিরীত কি রীত—দারুণ গ্রীষ্মে বিষম শীত।" তা ভাল—পীরিত গছাতে পার্‌লে ভাল। দেখ, জান্‌তুম, তুমি ভদ্দর্‌, তা নয়, তুমি সেই কি বলে—তাই। কি বাবা, এমন

প্যাজচচ্চড়ি আর কাঁচা লঙ্কা খেয়েছিলে যে, এত ঝাঁঝ! বল্লে কি না, এস না—না হয় নাই যাব। বলি—কারণটা ত টাকা—পাঁচ হাজার এই সে দিন দিয়েছি, কেবল কাপড়-ওয়ালার বারশ টাকা বাকী। ওঃ, টাকায় অমন ঢের মিল্‌বে—ঢের মিল্‌বে! কত রতন অমন পায়রা-লোটন লুটবে—ধিনি কেষ্ট—তিনি তা কর্‌লে—অমন সবাই পায়ের ওপর দে না পা করে, বুঝ্‌লে মাণিক! রস থাক্‌লে সুখের চারায় অনেকে রস যোগাবে। তুমি একা নও।—তাই বল্‌তে ভালবাসি, তাই বল্‌তে তোর পীরিতে উঠে পড়ি, তবু পীরিত ছাড়ি নি—খুব খেল্‌টা খেল্‌লে যা হোক্‌—বেশ বাহবা! কিন্তু আমি সহজে ছাড়্‌ছি নি জেন! কে কত পীরিতবাজ আছে দেখ্‌ব, আমার এমন পোষা পায়রা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়!

দেখ, রঙ্গ-রস রেখে তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ছি—তুমি ওদের বাড়ী দুপুর বেলা কেন গিছলে অমন বোষ্টুমী সেজে? ভেবেছিলে বুঝি সুধীরচন্দ্রের নতুন জুড়ি—একবার সপাঁচ সিকেয় কণ্ঠী বদল ক'রে দেখি না। এততেও ওঠে না মন—তোমায় আর কি বল্‌ব হীরেমন্‌। মনে ক'র না—"সেয়ানা ব্যাটাছেলে দুদিন চেপে রেগে ব'সে রয়েছে।" তা নয় মণি, আমি এবার হীরের কুঞ্জে বাসর জাগাচ্ছি। তুমি তাকিয়ে তাকিয়ে বাসর সাজিয়ো। অমন মুখ-ঝাম্‌টার ধার ধারি নি। তুমি চাঁদ—রসকলি কেটে, কেলিকুঞ্জবনে কার অভিসারে যাবে, আর আমি তোমার নূপুরের মণি যোগাব—তা হয় না মণি, তা হয় না। মাষ্টার ঠিক বলে—ও

সখের তরি বাইব বাচে, টল্‌তে দেব না—
আল্‌গোছে প্রাণ রাখব ধ'রে মচ্‌কে যাবে না।

বুঝ্‌লে তো মণি—নূপুরের রুণে রুণে ঢেউ এসে পায়ের তলে লুটিয়ে পড়্‌বে।

কিন্তু যাক্‌, একটা আমার কেমন খট্‌কা ঠেক্‌ছে, তুমি হেনা বিবি যে অভিসারে গিছ্‌লে, এটা আমার ঠিক মনে নিচ্চে না, এর মধ্যে কিছু তাৎপর্য্য আছে—তুমি যে সুধীরচন্দ্রের জন্যে বোষ্টুমী সাজ্‌বে, এ ত আমার মনে কিছুতেই নেয় না; ও মাষ্টার যাই বলুক—এ সেই—

কার বাঁকা নয়ন, কবে কখন্‌ হেনে গেছে বাণ,
তাই মন-মজানি ছনছনানি—জ্বলে গেল প্রাণ,

এ প্রাণের জ্বালা—নিশ্চয় - দেখ্‌ব বাবা—আমিও এ মর্ম্মভেদ কর্‌বই কর্‌ব। কণ্ঠীবদলে নিলেই হ'ল বটে। "ন"

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

শ্যাম না এল

সজনি ! শ্যাম না এল ;
এত বেশ-ভূষা, এত মালা গাঁথা
সকলি বিফলে গেল ।

নিশা অবসানে তারাদল সবে
বিষাদে মলিন হায় !
হের গো সজনি মলিন চাঁদিনী
গগন কোণেতে ভায় ।

সারা নিশি জাগি অবসাদে হায়
ছিন্ন লতিকা সম ;
আকুল বিকুল অলস এ দেহ
ঢলিয়া পড়িছে মম ।

বিরহ-বিধুরা সোহাগ-কাতরা
অধীরা হেরিয়া মোরে,
পতির আদরে উলসিনী ঊষা
চাহিছে গরবভরে ।

ফেলে দে গো দূরে কুসুমের রাশি
বকুল-মালতী-হার ;
(ওরা) সাপিনীর মতো ফণা তুলে মোরে
দংশিছে বার বার ।

খুলে দে গো মোর স্বর্ণ-বলয়
কাঞ্চী, মোতিম-হার ;
(ওরা) দারুণ আমার ব্যথায় বিঁধিছে
কঠোর ছুরিকা-ধার।

কুঙ্কুম-রাগ চন্দন-লেখা
ফেলে দে লো সব মুছে ;
মান অভিমান, রাগ অনুরাগ
যাক সব আজি ঘুচে।

খুলে দেগো তোব যতনে রচিত
কেশের বাঁধন মোর ;
গুরু গিরিভার বহিব কেমনে
এ কি লো আদর তোর।

রেখে দে রে তোর বচনের রাশি
সুধাস না কিছু মোরে ;
কথা শুনে তোর বাহিরিয়া এসে
ভাসিনু নয়ন-লোরে।

শ্রীন——

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭-১৯০৫)

"বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কি না ?"

দেবেন্দ্রনাথ ধর্ম্ম-সংস্কারে ব্রতী হইয়া, হিন্দুর আদি ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন,—আমরা এক্ষণে তাহাই আলোচনা করিব।

পৃথিবীর প্রত্যেক জাতিরই এমন এক একখানি ধর্ম্মগ্রন্থ আছে—যাহার সহিত ইতিহাসের নানা যুগ-বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়াও ঐ সমস্ত জাতির একটা নিত্যসম্বন্ধ অক্ষুণ্ণ ও অটুট থাকিয়া যাইতেছে। বেদের সহিত হিন্দু-জাতির সম্পর্কও ঐরূপ একটি নিত্যসম্বন্ধ। শুধু আধুনিক কালের দু'একটি শতাব্দীর মধ্যে দৃষ্টিকে আবদ্ধ করিয়া, যাঁহারা এরূপ একটি গুরুতর বিষয়ের বিচার ও মীমাংসায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের অদূরদর্শিতার নিকট আমরা এতাবৎ বিশেষ কিছু পাইও নাই, এবং আশাও করি না।

কবে কোন দিন্ ইতিহাসের প্রথম প্রত্যূষে এই জাতি স্রষ্টার চতুর্ম্মুখ-নিঃসৃত এই চতুষ্টয়ী বাণীকে মস্তকে ধারণ করিয়া পৃথিবীর কোন্ প্রান্ত হইতে যাত্রা আরম্ভ করিয়া আজ কোন্ প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। কত অসংখ্য অগণ্য মনুষ্যসত্ত্ব, এই জাতীয় ধারায় অবিচ্ছিন্ন থাকিয়া মহাকালের গ্রাসে লীন হইয়াছে—এই গ্রন্থ-চতুষ্টয় প্রথম হইতে অদ্যাবধি সেই জাতীয় ধারারই সূত্র যোগাইয়া আসিতেছে। মনুষ্যসৃষ্টি যাঁহার ইচ্ছায়, মনুষ্য-সৃষ্টিতে বিশেষ বিশেষ জাতির উদ্ভব ও অবিচ্ছিন্ন ধারা যাঁহার ইচ্ছায়, সেই সমস্ত জাতীয় ধারার সূত্রস্বরূপ এই সমস্ত আদি ধর্ম্মগ্রন্থ তাঁহারি ইচ্ছায়,—তাঁহারি অভিপ্রায়ে, তাঁহারি প্রত্যাদেশে নয় ভাবিবার যথেষ্ট কারণ কোথায় ? মানবের ইতিহাসে ঈশ্বরের লীলা অথবা অভিপ্রায় খুঁজিয়া পাওয়া গেলে, এই শ্রেণীর গ্রন্থে ঈশ্বরের অনিচ্ছা বা অনভিপ্রায় প্রমাণ করা বড়ই শক্ত, একরূপ অসম্ভব। এই সমস্ত গ্রন্থের পূর্ব্বে মনুষ্য-জাতির ইতিহাস নাই,—আছে ইতিহাসের নীহারিকা। এই সমস্ত গ্রন্থই মানবের ইতিহাসের জন্মদাতা। মনুষ্য-জাতিকে বড় বড় সঙ্ঘে আবদ্ধ করিয়া, বড় বড় কাল ও অ-কালের মধ্য দিয়া চালনা করিয়াছে—এই সমস্ত গ্রন্থ। ইতিহাসের যিনি নিয়ামক, বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রেরও তিনিই প্রেরক। ইতিহাসের যিনি ঈশ্বর, তিনি নিশ্চিতই ইতিহাসের মেরুদণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন নহেন।

সুতরাং যাঁহারা মানবেতিহাসে ঈশ্বরের লীলা দর্শন করেন এবং তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারেন, তাঁহারা এই সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থে যে ঈশ্বরের একটি বিশেষ অভিপ্রায় বা প্রত্যাদেশ উপলব্ধি করিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

কাজেই এই বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন যে ব্রহ্মা, তাঁহারই চতুর্ম্মুখ হইতে নিঃসৃত চতুর্ব্বেদকে হিন্দু-জাতি তাহার ইতিহাসের নিয়ামক বলিয়া, সেই বেদের শাসন মানিয়া অদ্যাবধি পরিচালিত হইতেছে। হিন্দুর বিশ্বাস এই যে, এই জাতি অর্থাৎ এই হিন্দু জাতির বিশিষ্টতা যদি ঈশ্বরের অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে যে শাস্ত্রাদির অনুশাসন দ্বারা পরিচালিত হইয়া—এই জাতির বিশিষ্টতা জন্মলাভ করিয়াছে, এবং পরিপুষ্ট হইয়াছে,—সেই সমস্ত শাস্ত্রাদিও ঈশ্বরেরই অভিপ্রেত। বেদ প্রভৃতি শাস্ত্র, সুতরাং ঈশ্বরের ইচ্ছায়, ঈশ্বরেরই প্রত্যাদেশে।

এইরূপে শাস্ত্রের সহিত জাতীয় বিশিষ্টতাকে এবং জাতীয় বিশিষ্টতার সহিত বিধাতার সৃষ্টি-বৈচিত্র্যকে, মিলাইয়া দেখিতে ও দেখাইতে না পারিলে, কিছুই দেখা যাইবে না, কাজেই কিছুই দেখানও যাইবে না। আবার অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎব্যাপী একটি বড় কালের মধ্যে এই সৃষ্টির বৈচিত্র্যের, মানবেতিহাসের এই জাতীয় বিশিষ্টতার, এবং প্রত্যেক জাতীয় বিশিষ্টতায় তদীয় শাস্ত্রাদি গ্রন্থের অপূর্ব্ব প্রভাব ও পরিণতি সম্যক্ দর্শন করিতে না পারিলে,—শাস্ত্রের সহিত জাতির সম্বন্ধ কি, তাহা নির্ণয় করা সম্ভবপর নহে। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের মধ্যে, শাস্ত্রের সহিত জাতির যে নিত্য সম্বন্ধ, যে অঙ্গাঙ্গী যোগ, তাহা দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হয় তাঁহাদের—যাঁহারা ঋষি। প্রলয়ের মহাপ্লাবনে যেমন সমস্তই ডুবিয়া, ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হয়, তখন শাস্ত্রের সহিত জাতির এই নিত্য সম্বন্ধকে উদ্ধার করিয়া যুগে যুগে রক্ষা করেন তাঁহারা—যাঁহারা অবতার।

বঙ্গদেশে উনবিংশ শতাব্দী, যত ক্ষুদ্র ভাবেই হউক, সত্যই এক প্রলয় ও সৃষ্টির সন্ধিক্ষণ। এই যুগসন্ধিক্ষণে প্রলয়ের প্লাবন হইতে শাস্ত্রকে রক্ষা করিয়াছেন কে ? শাস্ত্রের সহিত জাতির নিত্য সম্বন্ধ দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল কোন্ ঋষির ?

রাজা রামমোহনই আমাদের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেন। ইংরাজের রাজ্য অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জাতীয় বিশিষ্টতার অধিকারও হারাইতে বসিয়াছিলাম। ইংরাজ আমাদিগকে খৃষ্টান করিতে চাহিয়াছিল। আমরাও নাস্তিক হইবার উপক্রম করিতেছিলাম। শ্রীরামপুরের মিশনারী প্লাবন এবং ডিরোজীও তদীয় শিষ্যানুশিষ্যদের প্লাবন,—স্বদেশীয় শাস্ত্র-ব্যবসায়ীদের ভীষণতর অজ্ঞানের প্লাবন ; প্রলয়-ধারার এই ত্রিবেণী-সঙ্গমের কেন্দ্রভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া আমাদের শাস্ত্রকে উদ্ধার করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন রাজা রামমোহন। বাঙ্গালীর সেই ধূমায়-

মান প্রলয়-সন্ধ্যায় যখন সূর্য্য অস্তগত, তখন ফরাসীর অতীত শতাব্দীর নির্ব্বাপিত চিতাভূমি হইতে দু'একটি নিষ্ফল স্ফুলিঙ্গের সহিত রাশি রাশি ধূম্র আসিয়া বাঙ্গালার গাঢ় নীলিমাকে কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি সেই আসন্ন প্রলয়ের মুখে, সংশয়-তিমির-রাশির পরপারে বিদ্যুতের মত বক্ররেখায় মণ্ডিত উজ্জ্বল ও চঞ্চল এক নূতন সৃষ্টি রাজা রামমোহনের দৃষ্টিপথে আবির্ভূত হইয়াছিল। স্বদেশের শতাব্দীব্যাপী অজ্ঞানে আর বিদেশের নূতন কুহকে পড়িয়া যাহা প্রলয়ের মুখে ভাসিয়া যাইতেছিল, স্রষ্টার শ্রীমুখ-নিঃসৃত সেই বাণীর সহিত আমাদের জাতির যে নিত্য সম্বন্ধ, তাহা সেই দিন রাজা রামমোহনের দৃষ্টিপথে প্রত্যক্ষ হইয়াছিল।

বেদের সহিত আমাদের জাতির নিত্য সম্বন্ধের এ যুগে তিনিই প্রথম দ্রষ্টা—তাঁহার এই দর্শন, সম্যক্ দর্শন। রামমোহন জ্ঞানী, ইহা প্রধানতঃ তাঁহার জ্ঞানের দর্শন—বেদকে এ যুগে রামমোহন প্রলয়ের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। এ জন্য এ যুগের তিনিই প্রথম যুগ-প্রবর্ত্তক।

পৃথিবীর জাতি-সমূহের সহিত তদীয় স্ব স্ব ধর্ম্মশাস্ত্রের যে সম্পর্ক, তৎসম্বন্ধে রাজা রামমোহনের যে মীমাংসা আমরা পাই, তাহা এ যুগের উপযোগী এক অতি উন্নত জ্ঞানের পরিচায়ক। এই উন্নত জ্ঞান ও সম্যক্ বুদ্ধিবিচার দ্বারাই তিনি হিন্দু-জাতির সহিত বেদের সম্পর্ক নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের সহিত জাতির এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের জ্ঞান তাঁহার মধ্যে একদিনেই পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। রাজা রামমোহন যখন "তুহফাতুল সোওয়াহহেদীন" গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তখন শাস্ত্রের সহিত জাতির এই অঙ্গাঙ্গী বা নিত্য সম্বন্ধের দিক্‌টা বিকাশলাভ করে নাই। তখন রাজা শুধু জ্ঞানবাদী বা যুক্তিবাদী ছিলেন। শাস্ত্রের অপেক্ষা না রাখিয়া শুধু জ্ঞান বা যুক্তির সাহায্যেই জাতীয় সংস্কার সম্ভব, এইরূপ ধারণা তখন তিনি পোষণ করিতেন। ইহা তাঁহার প্রথম বয়সের ধারণা। ক্রমে পরিণত বয়সে তাঁহার জ্ঞানের পরিপুষ্টি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, শুধু শাস্ত্রহীন যুক্তি দ্বারা জাতীয় সংস্কার বা উন্নতি সম্ভবপর নয়। যুক্তির সহিত শাস্ত্রের সামঞ্জস্য না করিতে পারিলে কোন সংস্কারই জাতীয় ভাবে হইবে না এবং সংস্কার জাতীয় ভাবে না হইতে পারিলে তাহা দ্বারা কোন ফলই পাওয়া যাইবে না। শুষ্ক যুক্তিবাদের সংস্কার নিষ্ফল হইবে। জাতীয় বিশিষ্টতা-রক্ষার জন্য প্রত্যেক জাতিই তাহার শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলিবে। অথচ এমন ভাবে মানিয়া চলিবে—যাহাতে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাধীনতা অব্যাহত থাকে।

রাজা রামমোহনের এই মীমাংসা, শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়,—জ্ঞানের দিক্ হইতে খুব বড় মীমাংসা, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি ইহা একটা প্রখর বুদ্ধির যুক্তি ও

বিচারের সিদ্ধান্ত মাত্র। প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কোন সত্যিকার সংস্কারের ব্যাপারে এই শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করিতে গিয়া, কখন্, কোথায় কতটা যুক্তি এবং কতটা শাস্ত্রকে মানিয়া চলিতে হইবে, তাহার পরিমাণ নির্দ্দেশের জন্য এই সিদ্ধান্তের উপর শুধু নির্ভর করিলে চলিবে না। যুক্তি ও শাস্ত্রের পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবে—প্রত্যেক সংস্কারকের স্বভাব বা প্রকৃতি এবং তাহার সংস্করণীয় ব্যাপারটির পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ঘটনা-সমূহ।

রাজা রামমোহন বেদাদি শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এ যুগের পরিপূর্ণ জ্ঞান ও যুক্তির প্রখর বিদ্যুতের আলোকে সমস্ত শাস্ত্রকে তিনি আলোক-মালায় বিভূষিত করিয়াছেন। শাস্ত্র ও জ্ঞানের মণিকাঞ্চনসংযোগ আমরা দেখিয়াছি। রাজা রামমোহনের শাস্ত্র অজ্ঞানের বা অজ্ঞানীর শাস্ত্র নহে। কিন্তু তথাপি জাতীয় বিশিষ্টতা রক্ষার জন্য এবং লোকস্থিতি ও ধর্ম্ম-স্থিতির জন্য তিনি শাস্ত্রকে যথেষ্ট মান্য করিয়াছেন, শাস্ত্রের প্রমাণ সংস্কারের প্রত্যেক কার্য্যে—এবং প্রতিপদবিক্ষেপে স্বীকার করিয়া তবে অগ্রসর হইয়াছেন। অত বড় জ্ঞানী, পৃথিবীতে যাঁহার সমকালীন তুল্য জ্ঞানী খুব বেশী ছিল না, তিনি শাস্ত্র ছাড়া এক পদ অগ্রসর হইতেন না। রাজার শাস্ত্র ও যুক্তি সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত, তিনি তাঁহার সংস্কারকার্য্যে প্রয়োগ করিয়া স্পষ্ট দেখাইয়া দিয়াছেন।

রাজা রামমোহনের পরে ব্রহ্মসভাকে প্রায় দ্বাদশ বৎসর প্রাণ দিয়া রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন—রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। তিনি ব্রহ্মসভার কার্য্যে রামমোহনের যুক্তির প্রমাণ অপেক্ষা শাস্ত্রের প্রমাণকেই বেশী প্রাধান্য দিয়াছিলেন। শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়-সিদ্ধান্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া যুক্তির ভাগ কমা-ইয়া শাস্ত্রীয় প্রমাণের ভাগকেই বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হস্তে রামমোহনের ব্রহ্মসভা, বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়াই অনেকটা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের হস্ত হইতে বেদের অপৌরুষেয়তায় বিশ্বাসী এবংবিধ ব্রহ্মসভাকে দেবেন্দ্রনাথ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ এই ব্রহ্মসভাকে কালে ব্রাহ্ম-সমাজে পরিবর্ত্তিত করেন। কিন্তু রামমোহন ও রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের পরে, দেবেন্দ্রনাথ বেদাদি শাস্ত্র সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন এবং কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহাই আলোচনার বিষয়।

ব্রহ্মসভার সহিত তত্ত্ববোধিনী সভার যোগস্থাপন হইবার দুই বৎসর পরে—১৮৪৩ খৃঃ আচার্য্য রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নিকটে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই বৎসরেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বাহির হইল। অক্ষয়কুমার

দত্ত ইহার সম্পাদক হইলেন। ১৮৪৩-১৮৫৫, এই ১২ বৎসর অক্ষয়কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকের কার্য্য করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদকের কার্য্য হস্তে লইয়াই দেবেন্দ্রনাথের সহিত, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পক্ষ হইতে বেদকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করা যাইবে,—এই বিষয়ে আলোচনা ও তর্কে প্রবৃত্ত হ'ন এবং সর্ব্বশেষ ১৮৫১ খৃঃ অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম-সমাজের বাৎসরিক উৎসবে ঘোষণা করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মের মূলভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত। বিশ্বগ্রন্থই ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদ।

এখন প্রশ্ন এই—অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে বেদ সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের কি ধারণা ছিল? এবং পরেই বা তাহা কখন্ কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল?

প্রথম প্রশ্নের উত্তর আমাদের এই যে, অক্ষয়কুমারের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে—দেবেন্দ্রনাথের বেদ-সম্বন্ধে ধারণা নিতান্তই গতানুগতিক ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ৪ বৎসর পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। এই তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের প্রভাব দেবেন্দ্রনাথ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কাজেই ১৮৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে কি ব্রহ্মসভা, কি তত্ত্ববোধিনী সভা, এই উভয় প্রতিষ্ঠানই বেদ-সম্বন্ধে আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়ের মত দ্বারাই পরিচালিত হইয়াছে, এবং আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয়, রামমোহনের যুক্তি ও শাস্ত্রের সমন্বয়সিদ্ধান্তের যুক্তির ভাগটাকে নিষ্প্রভ করিয়া শাস্ত্রের উপরেই বেশী নির্ভর করিয়াছিলেন। বেদ তখন অপৌরুষেয় বাণী ও আপ্তবাক্য বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে।

ব্রহ্মসভা ও তত্ত্ববোধিনী সভা মিলিত হইয়া যাইবার পরেও দুই বৎসর কাটিয়া গেল। বেদ-সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠিল না। তার পর অক্ষয়কুমার আসিলেন, বেদ লইয়া প্রশ্ন উঠিল,—তর্ক চলিতে লাগিল। সুতরাং অক্ষয়কুমার আসিয়া যোগদান করিবার পূর্ব্বে, বেদ-সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ কোনরূপ উদ্বেগ অনুভব করেন নাই বা আচার্য্য বিদ্যাবাগীশের নিকট উক্ত বিষয়ে কোনরূপ প্রশ্নও করেন নাই। যেমন চলিয়া আসিতেছিল, তেমনি চলিতেছিল। দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথে বেদসমস্যা তখন প্রত্যক্ষই হয় নাই। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের মতানুযায়ী যেমন ব্রহ্ম-সভার আর দশজনে মানিয়া আসিতেছিলেন, দেবেন্দ্রনাথও সেইরূপ গতানুগতিকভাবে বেদকে মানিয়া আসিতেছিলেন। আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ বা ব্রহ্ম-সভার সাধারণ মত হইতে, বেদ-সম্বন্ধে কোন স্বতন্ত্র মত দেবেন্দ্রনাথের তখন কিছুই ছিল না। ইহা অক্ষয়কুমার দত্তের যোগদান করিবার পূর্ব্বে।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর আমাদের এই যে, অক্ষয়কুমারের সংস্পর্শে আসিয়াই দেবেন্দ্রনাথ বেদ-সমস্যা দ্বারা বিব্রত হইয়া পড়েন এবং অনেক বৎসর ধরিয়া অনেক রকম তর্ক ও আলোচনার পরেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বেদ-সমস্যার কোনরূপ সমীচীন মীমাংসা দিয়া যাইতে পারেন নাই, এবং তিনি নিজের মনের মধ্যেও এই সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। অথচ এই সমস্যা-সম্বন্ধে তাঁহার চিত্তের যে এক অস্থির ও দোলায়মান অবস্থা আমরা দেখিতে পাই, তাহা প্রথমতঃ তাঁহার নিজের দিক্ হইতে এবং দ্বিতীয়তঃ ব্রাহ্ম-সংস্কারের ইতিহাসের দিক্ হইতে উল্লেখযোগ্য।

১৮৪৩-১৮৫১ খৃঃ পর্য্যন্ত অক্ষয়কুমার বেদ-সমস্যা লইয়া দেবেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক করিয়াছেন, এবং ১৮৫১ খৃঃ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম বেদশৃঙ্খল হইতে মুক্ত, ইহা তিনি ব্রাহ্ম-সমাজের সাংবৎসরিক উৎসবের মধ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন। এই দীর্ঘকালের মধ্যে অক্ষয়কুমার তাঁহার স্বীয় মতকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত ধারণ করিয়াছেন ও প্রচার করিয়াছেন। কোন দিন কোন সংশয় বা চাঞ্চল্য তিনি প্রকাশ করেন নাই। মানব-সভ্যতার কোন এক আদিযুগের কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মানুভূতির কোন এক বিশেষ গ্রন্থ—কিছুতেই এই বিজ্ঞানের যুগের উন্নত ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হইতে পারে না,—ইহাই ছিল তাঁহার মত। কোন পুস্তককে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হইতে দিতে তিনি কোন মতেই রাজী ছিলেন না। নিখিল বিশ্বই ব্রাহ্মধর্ম্মের বেদ, ইহাই ছিল—তাঁহার মত ও বিশ্বাস।

প্রকৃতপক্ষে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের শাস্ত্রপন্থী মতবাদের সহিত উত্তরকালে যুক্তিপন্থী অক্ষয়কুমারের মতবাদেরই সংঘর্ষ হয়। কেন না, আচার্য্য বিদ্যাবাগীশের যেমন শাস্ত্রের উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল, অক্ষয়কুমারেরও তেমনি বিশুদ্ধ জ্ঞানের উপর প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত নির্ভর ছিল। পরন্তু দেবেন্দ্রনাথের প্রথমে কি শাস্ত্র, কি যুক্তি, কোন দিকেই কোন স্পষ্ট বিশ্বাস বা দৃঢ় মত ছিল না। কাজেই অক্ষয়কুমার বেদ-সমস্যা লইয়া ব্রাহ্মসমাজে যে ঝড় উঠাইয়াছিলেন, সেই ঝড়ে দেবেন্দ্রনাথ একবার এদিক্ একবার ওদিক্ তাড়িত ও চালিত হইয়াছেন মাত্র। প্রথম হইতে বেদ-সম্বন্ধে সচেতন না থাকার দরুণই দেবেন্দ্রনাথ একবার বিদ্যাবাগীশের মতবাদের দিকে, আবার অক্ষয়কুমারের মতবাদের দিকে তাড়িত হইয়া অতিশয় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অথচ অন্তনিরপেক্ষ হইয়া নিজের একটা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র মতবাদ উদ্ভাবন করিবার মত প্রতিভাও তাঁহার দেখা যায় নাই। কাশী হইতে চারি জন ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সমগ্র বেদ-সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথের জ্ঞানও অত্যন্ত সামান্য ছিল। বলা বাহুল্য, শাস্ত্র ও যুক্তি, বিদ্যা-

বাগীশ ও অক্ষয়কুমার, এই উভয় সঙ্কটের মধ্যে নিপতিত হইয়া দেবেন্দ্রনাথ একটু মাথা উঠাইয়া রামমোহনকেও দেখিতে পায়েন নাই। দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ইহা একটা বড়ই নিঃসহায় ও সঙ্কটের অবস্থা বলিয়া আমাদের মনে হয়। নিজের স্বাধীনভাবে কিছু উদ্ভাবন করিয়া লইবার ক্ষমতা দেবেন্দ্রনাথের খুব অল্পই ছিল। কি চিন্তার জগতে, কি কর্ম্মের জগতে কোন সমস্যা উপস্থিত হইলে কোন দিনই তিনি তাহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। কেবল একবার এদিক্, একবার ওদিক্, করিয়া সমস্যাটি এড়াইতে চাহিয়াছেন মাত্র। এ ক্ষেত্রেও বিদ্যা-বাগীশের নিকট হইতে শাস্ত্র-সম্বন্ধে যে মতবাদ তিনি পাইলেন,—তাহা একরূপ অচেতন ও অন্ধভাবেই গ্রহণ করিলেন। পরে যখন অক্ষয়কুমার যুক্তির প্রখর আলোক আনিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিবার চেষ্টা করিলেন, তখন বস্তুতঃই দেবেন্দ্র-নাথ এক মহা ফাঁপরে পড়িয়া হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিলেন। কি চিন্তায়, কি সংস্কার-ক্ষেত্রে, কি নৈতিক সংগ্রামে সর্ব্বত্রই দেবেন্দ্রনাথ অসহায়—পরমুখাপেক্ষী। সর্ব্বত্রই তাঁহার মীমাংসা এদিক্ ওদিক্ তাকাইয়া দুই নৌকায় পা দিয়া চলার মত নিবুদ্ধিতার ও সৎসাহসের অভাবের পরিচায়ক, এবং ব্রাহ্ম-সংস্কারের ইতিহাসে ইহার পরি-ণামও অতিশয় শোচনীয় দেখা গিয়াছে।

অক্ষয়কুমারের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগী-শের ও তাঁহার ব্রহ্মসভার মতগুলিকে অন্ধভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, বেদ-সমস্যা ছাড়িয়া দিয়া আরও অন্যান্য ঘটনার দ্বারা তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। আচার্য্য বিদ্যাবাগীশ মহাশয় অদ্বৈতবাদী ছিলেন। হয় ত ইহাও রামমোহনকেই অনুসরণ করিতে গিয়া, এবং নিজের প্রকৃতির সহিত মিলাইয়া তিনি এই মতবাদে বিশ্বাসস্থাপন করিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশ-শিষ্য দেবেন্দ্রনাথও এই অদ্বৈতবাদকে তাঁহার গুরুর হস্ত হইতে অন্ধভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অক্ষয়কুমারই এই মতবাদের বিরুদ্ধে দেবেন্দ্রনাথকে সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা বুঝা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথের বুদ্ধির মধ্যে এমন একটা জড়ভাব, অন্ধভাব ছিল—যাহা দ্বারা তিনি প্রথম দৃষ্টিতে কোন বিষয় কিছু ভালরূপ বুঝিতেই পারি-তেন না। অক্ষয়কুমারের প্রতিভা ও জ্ঞান এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা যথেষ্ট প্রখর ও তীক্ষ্ণ ছিল।

কাঁচড়াপাড়ার জগচ্চন্দ্র ও লোকনাথ রায়ের পরিবারে শ্রীধর ন্যায়রত্ন দ্বারা তন্ত্রোক্ত মন্ত্রে যে উপদেশ দেওয়া হইত, এবং স্ত্রীলোকদের পুষ্প, চন্দন ও নৈবেদ্য দ্বারা যে ব্রহ্মোপাসনার বিধি ছিল,—ইহাও দেবেন্দ্রনাথ অন্ধভাবেই অনুমোদন করিয়াছিলেন। পরে অক্ষয়কুমার দ্বারাই ইহার প্রতিবাদ হয়।

এই সমস্ত ঘটনা দ্বারা ইহাই বুঝা যায় যে, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের অব্যবহিত পরে যে সমস্ত সংস্কার ব্রাহ্ম-সমাজে দৃষ্ট হয়, তাহার মূলে জ্ঞানপন্থী অক্ষয়কুমারের প্রেরণাই খুব প্রবলভাবে কার্য্য করিয়াছে। অথচ সংস্কার-যুগের করমাসি ইতিহাস এই সত্যটাকে গোপন করিবার জন্য বরাবর এমন একটা প্রয়াস করিতেছে যে, রাজনারায়ণ বসু হইতে আজও পর্য্যন্ত তাহার জের মিটিতেছে না। এমন কি, রাজনারায়ণ বাবুকেও ছাড়াইয়া যাইবার উপক্রম দেখিতেছি।

রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন যে, দেবেন্দ্র বাবু ও অক্ষয় বাবু—ব্রাহ্ম-সমাজের এই দুই নায়কের মধ্যে তর্ক হইয়া স্থির হইল যে, বেদকে আর ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট বলিয়া গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে, এবং বেদ ঈশ্বরপ্রত্যাদিষ্ট নহে, বিশ্ববেদান্তই প্রকৃত বেদান্ত, এই মত অক্ষয় বাবু ১৮৫১ খৃঃ উৎসবের বক্তৃতাতে প্রথম ঘোষণা করিলেন। রাজনারায়ণ বাবুর আক্ষেপ এই যে, বেদবর্জ্জন-ব্যাপারের গৌরব শুধু অক্ষয় বাবু একা পাইবেন কেন? দেবেন্দ্রনাথও তাঁহার ভাগী বটেন। কেন না, তাঁহার সম্মতি ব্যতীত ব্রাহ্ম-সমাজে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারিত না, যেহেতু, তিনিই ছিলেন সর্ব্বপ্রধান।

প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিকগণই এ বিষয়ে একমত হইয়া বলিতেছেন যে, অক্ষয়কুমারই দেবেন্দ্রনাথকে এ বিষয়ে মত-পরিবর্ত্তন করান। দেবেন্দ্রনাথ পূর্ব্বে বেদসম্বন্ধে যে মত পোষণ করিতেন, অক্ষয়কুমারের যুক্তি দ্বারা চালিত হইয়া সেই মতবাদ তিনি পরিবর্ত্তন করেন। এই ঐতিহাসিক সত্য হইতে গৌরব, ভাগাভাগি লইয়া যে বাগ্‌যুদ্ধ ও মসীযুদ্ধ চলিতে পারে, ইহাই আশ্চর্য্য।

যাহা হউক, রাজনারায়ণ বাবু ত দুই নায়কের মধ্যে 'গৌরব' ভাগাভাগি করিয়া দিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু আধুনিক চেষ্টা ইহাকে ডিঙ্গাইয়া প্রায় সমস্ত গৌরবটাকেই দেবেন্দ্রনাথের হস্তে তুলিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর।

এই আধুনিক চেষ্টার যুক্তির ক্রম দেখাইতেছি।

১৮৫১ খৃঃ অক্ষয়কুমার দত্তের ঘোষণা যে, বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নহে। কিন্তু ইহাকে যে প্রথম ঘোষণা বলা হইয়াছে, তাহা ভুল। এই ঘোষণার অনেক পূর্ব্বকার ব্যাপার হইতেছে ১৮৪৭ খৃঃ ঘোষণা। কি সে ঘোষণা? "বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম্ম"—ইহার পরিবর্ত্তে "ব্রাহ্মধর্ম্ম" এই শব্দ ব্যবহার করা হয়, এবং যখন হইতে 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' শব্দ ব্যবহার করা হয়, তখন হইতেই বেদ যে ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট নয়, তাহা স্বীকার করা হয়। সুতরাং ১৮৫১ খৃঃ অক্ষয়কুমারের ঘোষণার পূর্ব্বেই ১৮৪৭ খৃঃ এই ঘোষণার অন্তরালে বেদকে বর্জ্জন করা হয়। আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, ১৮৪৭ খৃঃ ঘোষণা কাহার ঘোষণা? দেবেন্দ্রনাথ, না অক্ষয়কুমারের? ১৮৪৩ খৃঃ হইতেই ত

বেদবর্জ্জনের জন্ত অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের সহিত তর্ক করিতেছেন। তত্ত্ববোধিনীর সভ্যদের মধ্যেও এই আন্দোলন চলিতেছে। ১৮৪৭ খৃঃ এই 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' শব্দ ব্যবহারে আমরা অক্ষয়কুমারের প্রেরণা ও প্রভাব ছাড়িয়া দিয়া দেবেন্দ্রনাথের হস্ত দেখিব কোন্ প্রমাণে ?

এই আধুনিক চেষ্টা ঐতিহাসিক সমস্ত ঘটনা উদ্ধার করিয়া দেখান না। কোন একটা বিশেষ মতকে দাঁড় করাইবার জন্ত প্রয়োজনমত ঘটনার অবতারণা করেন। ফর্ম্মাসী সাহিত্যের দাসত্বে হাত পাকাইয়া এবংবিধ সত্যগোপন এমন অভ্যাস হইয়া যায় যে, তৎসম্বন্ধে অন্তে কি ভাবিতে পারে বা বলিতে পারে, তাহার কোন খেয়ালই থাকে না। সাহিত্য যে ইহাতে কি পর্য্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সে দায়িত্ববোধ ইহাঁদের কিছু-মাত্র আছে বলিয়া মনে হয় না।

কাজেই আমরা বাধ্য হইয়া ১৮৪৬ খৃঃ একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিতে বাধ্য হইতেছি। ঐ বৎসরে 'জগদ্বন্ধু' পত্রিকায় "বেদ ঈশ্বরপ্রণীত শাস্ত্র নহে" বলিয়া একটা প্রবন্ধ বাহির হয়। দেবেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া তত্ত্ববোধিনীতে লিখিবার জন্ত অক্ষয় বাবুকে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করেন ; কিন্তু অক্ষয় বাবু স্পষ্ট বলেন যে, তাঁহার লেখনী হইতে ঐরূপ লেখা বাহির হওয়া অসম্ভব। তার পর বেদ ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত, এইরূপ মতসূচক এক প্রতিবাদ-প্রবন্ধ ঐ বৎসরের মাঘ ও চৈত্রের তত্ত্ববোধিনীতে রাজনারায়ণ বাবুকে দিয়া দেবেন্দ্রনাথ বাহির করান।

ইহার কয়েক মাস মাত্র পরেই আধুনিক চেষ্টার ১৮৪৭ খৃঃ ঘোষণা। এখন এই ঘোষণায় দেবেন্দ্রনাথের হস্তই আমরা দেখিব, না অক্ষয়কুমারের হস্ত দেখিব ? বুঝিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভা এই ঘোষণায় সায় দিয়াছিলেন।

১৮৪৭ খৃঃ 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' শব্দ-ব্যবহারের ঘোষণায় অক্ষয়কুমারকে বাদ দিয়া দেবেন্দ্র-নাথের হস্ত দেখাইবার চেষ্টার মত মিথ্যা চেষ্টা আর নাই। কিন্তু হইলে কি হয়, রাজনারায়ণ বাবুকে ছাড়াইয়া যাওয়া ত চাই ?

১৮৪৭ খৃঃ 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' শব্দ ব্যবহারের ঘোষণার ইঙ্গিত দুই দিকে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, অক্ষয়কুমার দত্ত যে ১৮৫১ খৃঃ বেদান্ত-বর্জ্জনের প্রথম ঘোষণা করেন, তাহার গৌরব হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করা। আর অক্ষয়কুমারের পূর্ব্বেই এই ঘোষণা দেবেন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন।

আমরা বলি, দেবেন্দ্রনাথ এই ঘোষণা করেন নাই। তিনি মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া অক্ষয়কুমার দ্বারা তত্ত্ববোধিনীতে প্রবন্ধ লেখাইবার জন্ত পীড়াপীড়ি করিয়া, নিষ্ফল হইয়া শেষে রাজনারায়ণ বাবুর শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

আর ইহাও সত্য, ১৮৪৭ খৃঃ 'ব্রাহ্মধর্ম্ম' শব্দ-ব্যবহারেই বেদান্তবর্জ্জনের পালা সম্পূর্ণ

হয় নাই। তখনও তর্ক ও আলোচনাই চলিতেছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে ১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসরই বেদ-সমস্যার আলোচনা খুব বেশী করিয়া হইয়াছিল। কেন না, তৎ-পূর্ব্বে কাশীতে প্রেরিত চারিজন ব্রাহ্মণ ফিরিয়াই আসেন নাই। তাঁহাদের ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৭ খৃঃ বেদান্তবর্জ্জন করিয়া বসিলেন,—কেন না, তাহা না করিলে 'গৌরবের' ভাগ অক্ষয়কুমারের দিকে যে যায়? অথচ রাজনারায়ণ বাবু বলিতেছেন যে, কাশী প্রেরিত ব্রাহ্মণেরা ফিরিয়া আসিলে "১৮৪৮-৫০ এই তিন বৎসর বেদ ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট কি না, ইহা সর্ব্বদা আমাদের মধ্যে বিচারিত হইত।" কিন্তু আধুনিক চেষ্টা এ সমস্ত কাটিয়া ফেলিয়া দিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে, ১৮৪৭ খৃঃ বেদবর্জ্জন হইয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম নাম হইল। কেন না—অর্থাৎ—অক্ষয়কুমারের ঘোষণার পূর্ব্বে হওয়া চাই যে?

সাহিত্যে এরূপ চেষ্টাকে কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব? এরূপ চেষ্টা যাহাদের সাহিত্য-ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের চরিত্র ও জীবনকে তাহাদের রচিত সাহিত্য হইতে কি প্রকারে পৃথক্ করিয়া দেখিব? মোটের উপর কথা এই যে, সাহিত্য ও ইতিহাসকে আমরা মিথ্যার হস্ত হইতে রক্ষা করিব। তজ্জন্য যাহা আবশ্যক, তাহাও করিব। তথাকথিত 'ভদ্রতার' খাতিরে সত্যকে খর্ব্ব করিতে পারিব না।

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ দ্বারা বেদ যেরূপ আপ্তবাক্য বলিয়া ব্রহ্ম-সভায় গৃহীত হইয়াছিল এবং দেবেন্দ্রনাথ প্রথমে তাহা যেরূপ অন্ধভাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং অক্ষয়কুমার প্রথম হইতেই যেরূপ শাস্ত্রনিরপেক্ষ বিশুদ্ধ জ্ঞানকে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন এবং বহু তর্ক-আলোচনার পরে ১৮৫১ খৃঃ উৎসবের বক্তৃতায় ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইতেছে যে, ব্রাহ্মধর্ম্মকে অক্ষয়কুমারই সে যুগে দেবেন্দ্রনাথের কতকটা বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াই বেদের আধিপত্য হইতে মুক্ত করেন।

ইহা মহেন্দ্রনাথ রায়ের জল্পনা-কল্পনা নয়। রাজনারায়ণ বসু তত্ত্ববোধিনীতে ইহার প্রতিবাদ করেন। এই প্রতিবাদে দেবেন্দ্রনাথের গোপন হস্ত কার্য্য করিয়াছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বসুর প্রতিবাদ অক্ষয়কুমারকে তাঁহার সত্য-গৌরব হইতে ভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। এবং এই প্রতিবাদ স্ববিরোধিতা-দোষে দুষ্ট। কেন না, রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার আত্মচরিতে স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন যে, বেদ-বর্জ্জন-ব্যাপারে অক্ষয় বাবুই 'অগ্রসর' ছিলেন এবং দেবেন্দ্রনাথ 'রক্ষণশীল' ছিলেন, এবং উভয়ে তর্ক করার পরে যদি উভয়েই অগ্রসর হ'ন, অর্থাৎ বেদ-বর্জ্জন করেন, তবে অক্ষয়কুমার দেবেন্দ্রনাথের মতপরিবর্ত্তন করাইয়াছিলেন, ইহা 'একেবারেই ভুল' হইবে কেন?

কাশীতে যে চারি জন ব্রাহ্মণকে প্রেরণ করা হইয়াছিল,—তাহাও কি অক্ষয়কুমারের সহিত তর্ক করার পরে নয়? তাঁহারা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিলে যে তর্ক ও আলোচনা হয়, তাহার মধ্যে কি অক্ষয়কুমারের প্রভাব কার্য্য করে নাই? আধুনিক চেষ্টা বৃথা!

কিন্তু ইহা সত্য যে, বেদ-সমস্যা-সম্বন্ধে শেষ পর্য্যন্ত দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়-কুমার একমত হইতে পারেন নাই। তাহার কারণ, অক্ষয়কুমারের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত একটা সুসঙ্গত ধারণা ছিল, যাহা দেবেন্দ্রনাথের কোন কালেই ছিল না।

কিন্তু এ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথ যে রামমোহন-প্রদর্শিত শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়-সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে পারিয়াছিলেন,—তাহাও নয়। দেবেন্দ্রনাথ ইহার বহুকাল পরেও এ বিষয়ে লিখিতেছেন যে-"রামমোহন রায় মনে করিয়াছিলেন যে যাহারা বেদ মানে তাহাদের মধ্যে বেদ রক্ষা করিয়া পরব্রহ্মের উপাসনা প্রচলিত করা কিন্তু যাহারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্মত্ত হইয়া বেদকে আপ্তবাক্য বলিয়া না মানিবে, তাহাদের মধ্যে কি করা, ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই!"—আশ্চর্য্য!

অথচ ইহা যে তাঁহার (রামমোহনের) তখন খুব বিবেচনার মধ্যেই আসিয়াছিল, তাহা রাজার সম্বন্ধে যাঁহারা কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। শাস্ত্র ও যুক্তির অপূর্ব্ব সমন্বয়-সাধনের জন্যই স্বদেশ ও বিদেশের বহু পণ্ডিত-গণ রাজাকে একবাক্যে নবযুগের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্রব্যাখ্যাকার বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। দেবেন্দ্রনাথ রাজার এই সমন্বয় পদ্ধতি বুঝিতে না পারিয়া,—'ইহা তাঁহার তখন বিবেচনায় আইসে নাই'—বলিয়া রাজার প্রতিভাকে অমর্য্যাদা করিয়াছেন। তাহাতে কিছু আসে যায় না। রামমোহনের প্রতিভা দেবেন্দ্র-নাথের সমালোচনার উপর নির্ভর করে না। তথাপি দুঃখের বিষয় যে, শাস্ত্র ও যুক্তিবাদের মধ্যে ক্রমাগত ৮ বৎসর কাল দোল খাইয়াও তিনি এ বিষয়ে রামমোহনকে বুঝিতে ত পারিলেনই না, বরং উল্টা বুঝিয়া বসিলেন।

আধুনিক চেষ্টা প্রতিপন্ন করিতে চান যে, শাস্ত্রমীমাংসায় দেবেন্দ্রনাথ নাকি রামমোহনেরই অনুসরণ করিয়াছেন। আমরা দেখাইতেছি ও দেখিতেছি যে, শাস্ত্রমীমাংসায় দেবেন্দ্রনাথের নিজের স্বীকার-উক্তি দ্বারাই প্রমাণ হইতেছে যে, রামমোহনকে দেবেন্দ্রনাথ বুঝিতে পারেন নাই, এবং যাহা বুঝিয়াছেন, তাহা তিনি ভুল বুঝিয়াছেন।

রামমোহনের শাস্ত্র ও যুক্তির সমন্বয়ে বিদ্যাবাগীশ মহাশয় শাস্ত্রকে প্রাধান্য

দিয়া যুক্তিকে নিষ্প্রভ করিয়াছিলেন, সুতরাং প্রতিক্রিয়ার ফলে, নিজের শিক্ষা ও প্রকৃতিকে অনুসরণ করিয়া অক্ষয়কুমার শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তিকে উজ্জ্বল করিয়া ধরিয়াছিলেন। বিদ্যাবাগীশ ও অক্ষয়কুমার, ইঁহারা উভয়েই একদেশদর্শিতার দোষে দুষ্ট হইলেও,—ইঁহারা সংস্কারের ইতিহাসে স্বাভাবিক বিবর্ত্তনের ফলে প্রত্যেকেই এক একটি ক্রম বা অবস্থার পরিচয় দেন।

কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ইঁহাদের মাঝখানে পড়িয়া কেবলই দোল খাইয়াছেন, নিজেও কোনরূপ মীমাংসায় আসিতে পারেন নাই এবং ব্রহ্মসমাজকেও কোন মীমাংসা সুতরাং দিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার দর্শন এ ক্ষেত্রে সম্যক্ দর্শন নহে। জ্ঞানেরও নহে,—উপলব্ধিরও নহে। তাঁহার ঋষি-দৃষ্টি অন্ততঃ এ ক্ষেত্রে তাঁহাকে কিছুমাত্র সাহায্য করিতে পারে নাই।

শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী।

অচেনা দূতী

অচেনা পাখী কোথায় থাকি'
গাহিছে এই গান?
বুঝি না ভাষা, শুধু রে আশা
আকুল করে প্রাণ!
অযুত যুগ যাঁহার তরে
কত না কোটি জনম ধরে'
চলেছি আমি দিবস-যামি'
করিতে সন্ধান,
—এ কি রে এ কি তাঁহারই আহ্বান?

(২)

কোথায় পাখী? বারেক আঁখি
হেরিতে তোমারে চায়।
চরণে ধরি;— করুণা করি'
আয় রে কাছে আয়!

যদি রে আজো লুকায়ে রবি,
অজানা ভাবে কি-যে-কি ক'বি,
ক্যান্ রে তবে ভাঙ্গায়ে ঘুম
জাগালি চেতনায় ?
—হিয়া যে মোর কাঁদিছে উভরায় !

(৩)

জ্বালালি চিতা ! অশ্রু কি তা'
নেবা'তে পারে হায় !
দহে যে হিয়া ! বাসনা দিয়া
কেমনে ভুলি তা'য় ?
ভোগের সুখে হৃদয় ভরি'
যত এ চিতা চাপিয়া ধরি,
—নিমেষ পরেই সবি যে শেষ !
বিরহ-বেদনায়
পরাণে মরি। আরো কি সহা যায় !

(৪)

মিনতি করে' জিগাই তোরে
রে দূতী, বারে বার,—
এখনও বাকি রহিল না কি
এ মোর অভিসার ?
কোথায় গেলে কবে রে কবে
এ সাধ মোর মিটিবে তবে ?
অলস আঁখি আসে যে ঢুলি'
সুমুখে আঁধিয়ার !
এবারো তবে হ'ল না বুঝি আর !

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।

কোমলে কঠোর

কালিদাসের নাটকগুলি সবই খুব চক্‌চকে। খুব উজ্জ্বল। আপাততঃ দেখিতে গেলে যেন আদিরসেরই বই। নায়ক-নায়িকা ত প্রেমে একেবারে ডগমগ। পাঠক-পাঠিকা, প্রেক্ষক-প্রেক্ষিকাও প্রায় তাই হইয়াই উঠেন। মালবিকার প্রতি রাজার টান, মালবিকারও সে টানের "প্রতিটান", উর্ব্বশীর প্রতি পুরূরবার অনুরাগ, উর্ব্বশীরও রাজার প্রতি পুরা অনুরাগ; রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলায় তন্ময় হওয়া, আবার শকুন্তলারও দুষ্মন্তে তন্ময় হওয়া, প্রেম নয় ত কি? এত প্রেম কোথায় পাওয়া যায়? মালবিকাগ্নিমিত্রে যৌবনের চঞ্চলতা; বিক্রমোর্ব্বশীতে বীরের গম্ভীরতা; শকুন্তলায় একেবারে তন্ময়তা। এক হাতে তিন রকমের প্রেম তিন ধারায় বাহির হইয়াছে। সকল ধারারই অমৃত বহিয়া গিয়াছে। সুতরাং কালিদাসকে লোকে আদি-রসের কবি বলিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কালিদাসেরও হাত বেশ পাকা, তিনি প্রণয়কেই আগাইয়া দেন। বইখানির যেখানটা খোল, কেবল প্রেম। নায়ক-নায়িকা কখন প্রেমের সুখে মগ্ন, কখন 'পাইতেছি না, বলিয়া উৎকণ্ঠায় কাতর, কখনও 'পাইবার নহে' বলিয়া হতাশায় ম্রিয়মাণ, কখন পাইবার আশায় অত্যন্ত চঞ্চল। কখনও বিরহে মৃতপ্রায়। বিরহ আবার কখন আপনার দোষে, কখন দৈবের দোষে। প্রেমে কখন আছেন মান, কখন আছেন কলহ, কখন আছেন ভয়, কখন আছেন চিন্তা; কত অনন্ত উপায়ে যে কালিদাস প্রেম-রস ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা অল্পে বলিয়া উঠা ভার।

কিন্তু এই প্রেম-তরঙ্গের ভিতরে একটা উপদেশ, একটা সমাজের শিক্ষা, একটা সাধু উদ্দেশ্য, দেখা যায় না, অথচ বহিতেছে। সেইটিই আসল কথা, প্রেমটা বাহিরের চাকচিক্য-মাত্র। প্রেমে মনকে নরম করে, জমী তৈয়ার করে, কালিদাস সেই জমীতে উপদেশের বীজ ছড়াইয়া দেন। একজন কবি বলিয়াছেন, আমি অনেক দর্শন-শাস্ত্রের বই লিখিয়াছি, কিন্তু তাহাতে আপামর সাধারণের মন আকর্ষণ করিতে পারি নাই, তাই কাব্যচ্ছলে এই গ্রন্থ লিখিলাম। লোকে ত তিক্ত ঔষধ খাইতে চায় না, তাই তাহাতে মধু মিশাইয়া দিলাম। কালিদাসও প্রেমের মধুতে ডুবাইয়া কঠিন উপদেশ লোকের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তবে কালিদাস ও অশ্বঘোষে তফাৎ এই যে, অশ্বঘোষ যে উপদেশ দিয়াছেন, সেটি ও তাঁর মধুটুকু দুইই দেখা যাইতেছে। কিন্তু কালিদাস যে উপদেশ দিতেছেন, এটা বিশেষ করিয়া তলাইয়া না দেখিলে,

তারাইয়া না পড়িলে কিছুতেই বুঝা যায় না। তাঁহার উদ্দেশ্য যেন শুদ্ধ মধু, কেবল প্রেম, কেবল আমোদ, কেবল "রথ দেখা"। তিনি যে উহার মধ্যে একটু "কলাবেচা" রাখিয়াছেন, তাহা সহজে বুঝা যায় না। যায় না বলিয়াই কালিদাসের এত আদর। লোকে বলে, "বাই, কালিদাসের শরণ লই। দুদণ্ড বিশুদ্ধ আমোদে কাটিবে, এ আমোদে 'বুড়্‌টেপিরি' একেবারে নাই, "কটুকটে" কথার ভাঁজ নাই, জ্যাঠামির "জ্যা"টি পর্য্যন্ত নাই অর্থাৎ উপদেশ দিবার ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, প্রয়াস নাই। অসুন্দর কিছুই নাই। সবই সুন্দর, সবই মধুর, সবই আশ্চর্য্য।" কিন্তু তলায় তলায় মন বদলাইয়া যায়, এমন কি, সমস্ত মানুষটা আর এক রকম হইয়া যায়। যা ছিল, তা হ'তে অনেক ভাল হইয়া যায়।

দেখ, মালবিকাগ্নিমিত্রে কি হইল। পাটরাণী ধারিণী বড় বেশ লোক। রাজার মেয়ে। সহবৎ ভাল। সমস্ত ভদ্রয়ানা; অভদ্রতার লেশও নাই। কাহাকেও মন্দ কথা বলিতে জানেন না, সবার উপরই তাঁহার সমান দয়া—সমান অনুগ্রহ। ইরাবতীর যখন সব গিয়াছে, তখন ধারিণীই তাহার ভরসা। কিন্তু ধারিণীর অদৃষ্টদোষে স্বামীটি একটু রূপ-পাগ্‌লা। রূপ দেখিলে আর রক্ষা নাই। ধারিণীর এক চাকরাণী ছিল—ছোট লোকের মেয়ে। নাম ইরাবতী। সুন্দরী বটে। তার উপর নাচ্‌তে জানে ভাল, গাইতে জানে ভাল। তাহার উপর আবার একটু একটু নেশাও করে। রাজার ঝোঁক পড়িল তাহার উপর। সে প্রথম রাজার প্রণয়পাত্রী, পরে রাণীও হইল। ধারিণীর সহিল না। তিনি গোপনে গোপনে তাহার সর্ব্বনাশের চিন্তা করিতে লাগিলেন। আর একটি চাকরাণী পাইলেন, সেটি দেখ্‌তে আরও ভাল। ধারিণী ভাবিলেন, বেশ হইল—"কণ্টকেনৈব কণ্টকম্"। নূতন দাসীকে ভাল করিয়া নাচগান শিখাইতে লাগিলেন। মনে করিলেন, এক দিন মাহেন্দ্রক্ষণে তাহাকে রাজার কাছে পঁহুছিয়া দিয়া ইরাবতীকে রাজার মন থেকে তফাৎ করিয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার সে মাহেন্দ্রক্ষণ আসিল না। তাহার উদ্যোগ-পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বেই মালবিকার কথা রাজার কানে উঠিল। আর পায় কে? পাগল ক্ষেপিল; মালবিকার সঙ্গে রাজার মিলন হইল। ইরাবতী তফাৎ হইল। কিন্তু সেই সঙ্গে ধারিণী রাণীর কি হইল? তাঁহার যে দেবী শব্দটি ছিল, তাহাও গেল। পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়। রাণী ধারিণীর তাহাই হইল। মালবিকার সহিত রাজার বিবাহের পর ইরাবতীর দূতী আসিয়া যখন রাজার নিকট ইরাবতীর হইয়া মাপ চাহিল, রাজা কিছুই বলিলেন না। যেন সে কথা তাঁহার কানেই গেল না। ধারিণী গিন্নীপণা করিয়া রাজার হইয়া সে মাপ চাওয়ার জবাব দিলেন। তখনও জ্ঞান—তিনি যা ছিলেন, অন্ততঃ তাই থাকিবেন। শেষ যখন মালবিকাকে দেবী করার কথা

হইল, তখনও রাণী গিন্নীপণা করিতেছেন ; কিন্তু যখন দেখিলেন, সব লোক 'দেবী দেবী' বলিয়া নূতন রাণীকে খুসী করিতেছেন, তখন ধারিণীর দশাটা কি হইল? তিনি ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া সকলের দিকে চাহিতে লাগিলেন। কালিদাস "দেবী পরিজনমবেক্ষতে" এই কয়টি কথায় যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একখান বই লিখিয়াও শেষ করা যায় না। এ সমস্তের মধ্যে সার কথা—"পরের মন্দ করিতে গেলে আপনার মন্দ আগে হয়।"

বিক্রমোর্ব্বশীতেও এই কথা। রাজা প্রকাণ্ড দুর্দান্ত অসুরের হাত থেকে তোমায় উদ্ধার করিয়াছেন। তুমি উর্ব্বশী তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিণী হইতে পার। তিনি বীর, রমণী-রত্ন বীরেরই ভোগ্য। সে ত বেশ কথা। তুমি রাজাকে ভালবাস। কিন্তু তুমি অপ্সরা, স্বর্গের বেশ্যা ; নৃত্য করা, নাটক অভিনয় করাই তোমার কাজ। তুমি আপন কাজে অমনোযোগ করিবে, যে তোমার মনিব, সে তাহা সহিবে কেন? লক্ষ্মীস্বয়ংবর নাটকে তুমি লক্ষ্মী সাজিবে, স্বয়ং ভরত মুনি ষ্টেজ-ম্যানেজর। তোমায় লক্ষ্মীর পার্ট দিয়াছেন আর তুমি কি না রাজায় তন্ময় হইয়া, পুরুষোত্তম বলিতে পুরূরবা বলিয়া বসিলে। ইহার শাস্তি ত তোমায় পাইতেই হইবে। শাস্তি হইল -মনুষ্যলোকে তোমার বাস। তুমি ত ভাবিলে, আমার শাপে বর হইল ; কিন্তু ভাব দেখি, চিরকাল যদি তোমায় মনুষ্যের মধ্যে বাস করিতে হইত, কত কষ্ট হইত। পুরূরবা ত মানুষ—এক দিন মরিবেই। তার পর তুমি ত অমর, এই পৃথিবীতে বসিয়া একেলা নরক যন্ত্রণা ভোগ করিবে। ভাগ্যে ইন্দ্র তোমার সহায় ছিলেন, তাই তোমার শাপের একটা অবসানের কথা বলিয়া দিলেন। রাজা পুত্রমুখ দেখিলেই তোমার আবার স্বর্গে আসা হইবে।

শকুন্তলায়ও ঐ কথা। কিন্তু শকুন্তলা কালিদাসের বেশী বয়সের লেখা। ইহাতে সব কোমল। এত কোমলতা অন্য জায়গায় অল্পই দেখা যায়। রাজা কোমল, শকুন্তলা কোমল, দুটি সখী—অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা, কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি। বুড়ী গোতমীও কোমলতারাশি। আর কাশ্যপ শকুন্তলার পালক পিতা। আহা! তাঁহার কোমলতায় লোকের হৃদয় গলিয়া যায়। যে কেহ মেয়ে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়াছে, সেই জানে, বহুকাল লালন-পালন করিয়া আপন মেয়েকে পরের হাতে দেওয়া কত কষ্ট। সুতরাং সে যদি কণ্ব মুনির ব্যাপার দেখে, কাঁদিয়া আকুল হয়। যে নাটকে কোমলতার এত ছড়াছড়ি, তাহার মধ্যে উপদেশ আছে, কঠোরতা আছে, কাহারও মনেই হয় না। পড়িবার সময় সে কঠোরতা একেবারেই দেখা যায় না। সব কোমলতায় ঢাকিয়া যায়। কিন্তু সে কঠোরতা বড়ই কঠোর ;—অত্যন্ত কঠোর। ভাসা ভাসা দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া আরও কঠোর। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া বুঝিয়া লইতে হয় বলিয়া আরও কঠোর।

এত কোমলতার মধ্যে কণ্ব মুনি যে শকুন্তলাকে অতিথিসৎকারের ভার দিয়া তীর্থ-যাত্রা করিয়াছেন, সে কথাটা কাহারও মনেই থাকে না; থাকিলেও রাজার প্রতি আতিথ্য দেখিয়াই শকুন্তলার কার্য্য যে খুব কোমল ও ভাল, এইরূপই মনে হয়। প্রিয়ংবদা রাজার সাম্নে শকুন্তলাকে বলিলেন, "আজি যদি ঋষি এখানে থাকিতেন?" শকুন্তলা বলিলেন, "তাহা হইলে কি হইত?" উত্তর হইল, আপনার জীবিতসর্ব্বস্ব দিয়াও অতিথির সৎকার করিতেন। তবেই রাজার প্রতি শকুন্তলার যে টান, সেটার ভিতর আতিথ্যও একটু আছে। এমন সুন্দর আতিথ্য!! কিন্তু এক জায়গায় আতিথ্য করিয়া যখন শকুন্তলা আত্মচিন্তায়, অতিথি-চিন্তায়, প্রেম-চিন্তায় মগ্ন, সেই সময় আর এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি আর কেহ নন, স্বয়ং দুর্ব্বাসা; আর্য্য সমাজের, ভারত-সমাজের, হিন্দু-সমাজের কঠোরতার প্রতিমূর্ত্তি। তাঁহার কাছে পান হইতে এতটুকু চুণ খসিবার যো নাই। তাঁহার ভয়ে সকলেই কম্পবান্। যুধিষ্ঠির কম্পবান্, রাম কম্পবান্, ভারত শুদ্ধ কম্পবান্। কালিদাস সেই কঠোর দুর্ব্বাসাকে কোমলতাময়ী শকুন্তলার সম্মুখে অতিথি ভাবে উপস্থিত করিয়া দিলেন। তিনি আশ্রমদ্বারে আসিয়া বলিলেন,—"অয়মহং ভো"—"এই আমি গো।" মনু বলেন, এই কয়টি কথা বলিয়া কেহ গৃহস্থের দ্বারে দাঁড়াইলেই গৃহস্থকে বুঝিতে হইবে, অতিথি আসিয়াছেন। অতিথি আর দুই বার বলিবে না; দুর্ব্বাসা আর দ্বিতীয় বার "অয়মহং ভো" বলিলেন না। একটু অপেক্ষা করিয়াই যখন দেখিলেন, শকুন্তলা কোন উত্তর দিলেন না—অভ্যর্থনা করিলেন না, তখন একেবারেই কঠোর শাপ দিয়া বসিলেন, আর দাঁড়াইলেন না। কি ভয়ানক শাপ! "তুমি যাহার জন্য ভাবিতে বসিয়া আমার মত অতিথিকেও দেখিতে পাইলে না, সে বুঝাইয়া মনে করাইয়া দিলেও তোমার কথা স্মরণ করিবে না।" শকুন্তলার সব প্রেম, সব আশা ফুরাইয়া গেল। এই ত গেল কাজে হেলা করার শাস্তি। শাস্তিটা বড়ই গুরুতর হইল। শকুন্তলা যে নিতান্ত বালিকা, সে যে অতিথি-সৎকারে নূতন ব্রতী, দুর্ব্বাসা সে সব কথা মনেই আনিলেন না। তিনি অতিথিসৎকারের ব্যত্যয় দেখিলেন, অমনি শাপ দিলেন। প্রিয়ংবদা আসিয়া দুর্ব্বাসাকে একটু নরম করিয়া, দুর্ব্বাসার পায়ে ধরিয়া, একটা শাপের অবসান করিয়া লইলেন। কিন্তু সে কথার এখন আমাদের কাজ নাই।

আর কঠোর কণ্ব মুনি নিজে। তিনি আসিয়া যেমন শুনিলেন, শকুন্তলার সঙ্গে রাজার গান্ধর্ব্ব-বিবাহ, অমনি শকুন্তলাকে আশ্রম হইতে তফাৎ করিয়া দিবার সংকল্প করিলেন। তিনি সন্ধ্যার সময় এই কথা শুনিলেন, তৎক্ষণাৎ শকুন্তলাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ভোর হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার শিষ্য

বাহিরে আসিয়া বলিলেন,—"বেলা দেখিবার জন্ম ভগবান্ কাশ্যপ আমায় আদেশ করিয়াছেন।" তাহাতে বোধ করিতে হইবে যে, যেন রাত্রে কণ্ব মুনির ঘুম হয় নাই। তিনি ভোর হইবার পূর্ব্বে শিষ্যদিগকে উঠাইয়া দিয়াছেন। যদি বল, কণ্ব যে এত কঠোর, তুমি জানিলে কিরূপে? তিনি ত নিজে কঠোরতার একটিও কথা বলেন নাই। যখন তিনি শকুন্তলার গান্ধর্ব্ব-বিবাহের কথা শুনিলেন, তিনি কতই আনন্দ প্রকাশ করিলেন। মেয়ে বিদায় করিবার সময় তাঁহার গলা ধরিয়া গেল, চক্ষু বাষ্পময় হইয়া উঠিল। তবুও তুমি তাঁহাকে কঠোর বল কেন? বলি তাঁহার কাজ দেখিয়া। তিনি বিদায় দিবার পূর্ব্বে শকুন্তলার সঙ্গে দেখাই করিলেন না। শুনিবামাত্র শিষ্যদিগকে যাত্রা করিবার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। এ সকল কি বড় কোমলতার কথা? বলিবে—না, তা কেন? শকুন্তলা রাজার বিরহে কাতর, তাই শকুন্তলাকে রাজার কাছে যত শীঘ্র পাঠান যায়, তাহারই চেষ্টা করিলেন। ইহাতে কঠোরতা না হইয়া কোমলতাই প্রকাশ পায়। এ কথা সত্য বটে, তবে কি না, সন্ধ্যায় শুনিলেন, আর সকালেই মেয়ে পাঠান, একটু তাড়াতাড়ি হয় না? আর এক কথা, তপোবন-বিরুদ্ধ কাজ করিলে, যে করে, তাহাকে ঋষিরা এক মুহূর্ত্তও আশ্রমে রাখেন না। দেখ না, বিক্রমোর্ব্বশীতে আয়ু যখনই শকুনটা বাণ মারিয়া মারিয়া ফেলিল, তখনই চ্যবন ঋষি বলিলেন, এ তপোবন-বিরুদ্ধ কাজ করিয়াছে, ইহাকে আর এখানে রাখা যায় না। তাই তৎক্ষণাৎ সত্যবতীর সঙ্গে দিয়া তাহাকে উর্ব্বশীর কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এও তাই, শকুন্তলাকে পাঠাইতেই হইবে, আর রাখা যায় না। তবে কঠোর কাজ যদি কোমল কথায় করা যায়, দোষ কি? বরং তাহাতে গুণই আছে। কাজটা কঠোর, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই।

শকুন্তলা দুর্ব্বাসার কাছে অপরাধী, তাই তাহার শাপ। তিনি কণ্বের কাছে অপরাধী, তাই আশ্রম হইতে তাঁহার বিতাড়ন। দুটাই বড় কঠোর।

কণ্বের এই কঠোরতার আর এক প্রমাণ এই যে, শকুন্তলার যাওয়ার পর কণ্ব আর তাঁহার কোনই খোঁজ রাখেন নাই। মারীচের আশ্রমে যখন দুষ্যন্ত ও শকুন্তলার মিলন হইয়া গেল, তখন দেখা গেল, কোমলহৃদয়া মাতা মেনকা সেইখানেই উপস্থিত আছেন। কিন্তু কণ্ব! অদিতি বলিলেন, কণ্বকে খবর দেওয়া যাউক। তাহাতে মারীচ বলিলেন, তাঁহাকে আর খবর দিবার দরকার কি? তিনি তপঃপ্রভাবেই সব জানেন। রাজার ভয় ছিল—শকুন্তলাকে ত্যাগ করায় কণ্ব মুনি তাঁহার উপর চটিয়া আছেন। তাই তিনি বলিলেন, "তবে বোধ হয়, তিনি

আমার উপর বেশী রাগ করেন নাই।" তখন মারীচ বলিলেন, "তথাপি আমাদের তাঁহাকে প্রিয়-সম্ভাষণ করা চাই।" এই বলিয়া তিনি একজন শিষ্যকে ডাকিয়া কণ্বের নিকট খবর পাঠাইলেন।

ঐ যে একটি "তথাপি" শব্দ আছে, উহাতে বেশ জানা যায় যে, কণ্ব এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আশ্রম হইতে যাওয়ার পর শকুন্তলার কি হইল, তিনি তাহার কোনই খোঁজ লয়েন নাই; তাহা লইবার বড় ইচ্ছাও নাই; তবে তিনি শকুন্তলাকে পালন করিয়াছিলেন, তাঁহাকে শকুন্তলার মঙ্গলকালে খবর দেওয়া মারীচের উচিত, তাই মারীচ তাঁহাকে খবর পাঠাইলেন।

কালিদাস এই কঠোরতা কেমন লুকাইয়া রাখিয়াছেন। একেবারেই একটিও কঠোর শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বরং কঠোরকে কেমন কোমল করিয়াছেন। কাজে কঠোর, কিন্তু মুখে কোমল হইলে সংসারে তাহাকে ভণ্ড বলে—পছন্দ করে না। কিন্তু নাটকে সেটি কেমন সুন্দর হইয়াছে। আর সেইটিকে সাজাইতে কালিদাস কত গুণপনা দেখাইয়াছেন। লোকে এরূপ লোককে ভণ্ড লোক বলে বলুক; কিন্তু যে কাজে ঠিক থাকে, কথায় কাহারও মনে ব্যথা দেয় না, তাহাকেই আমরা প্রকৃত মনুষ্য বলিয়া মনে করি। কালিদাস প্রকৃত মানুষ কাহাকে বলে জানিতেন এবং তাই হইবার জন্য আমাদের উপদেশ দিয়াছেন।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

অনুরণিত হইয়া উঠে। যদি তাহার চিত্তে প্রেম থাকে, যদি তাহার জন্মান্তরের পুণ্য থাকে, তবে তখন সে পাগলের মত গাহিতে থাকে, তাহার সম্মুখবর্ত্তিনী কল্পনাময়ী প্রতিমার চির-প্রসন্নমুখের দিকে মুদ্রিত-নেত্রে চাহিয়া বলে—

"মধুর-মুরতি তব, ভরিয়ে রয়েছে ভব,
সমুখে সে মুখশশী জাগে অনিবার!
কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে,
এ জনমে ভুলিতে রে পারিব না আর।"

(সারদামঙ্গল)

তখন সে যুক্তকরে তাহার আদরিনী প্রতিমাকে স্তব করিতে আরম্ভ করে, কখনো ধ্যান করে, কখনো আবার দুই হাত বাড়াইয়া সেই সস্মিতবদনা জ্যোতির্ম্ময়ীকে ধরিতে যায়, সত্যই সেই করুণাময়ীর সকরুণ নয়নের দীপ্তিতে নিজেকে ডুবাইয়া দিয়া তখন ঐ ব্যক্তি কত কি বলিতে থাকে,—কখনো শোকাশ্রুতে ধরণী ভাসাইয়া দেয়, আবার প্রেমাশ্রুতে কখনো বা মরুভূমি অমরধামে পরিণত করে,—তখন তার—

"সে শোক-সঙ্গীত কথা,
শুনে কাঁদে তরু লতা,
তমসা আকুল হয়ে কাঁদে উভরায়।
নিরখি নন্দিনী ছবি,
গদগদ আদি-কবি,
অন্তরে করুণাসিন্ধু উথলিয়া যায়।"

(সারদামঙ্গল)

যথার্থই তখন সেই বিশ্বনন্দিনী প্রতিমার প্রতি নিশ্বাসে জগৎ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। ঐ সাধক কবি তখন বুঝিতে পারেন না, বা জানিতেও পান না যে, তিনি কি কহিতেছেন, কি গাহিতেছেন? তাঁহার অপ্রবুদ্ধ কণ্ঠের "মা নিষাদ" গীতিকা যে জগতে এক নূতন ছন্দের সৃষ্টি করিবে, নূতন রাগের প্রবাহ বহাইবে, ইহার বিন্দুবিসর্গও তিনি তখন ঘুণাক্ষরে জানিতে পান না। কবি তখন পার্শ্ববর্ত্তিনী বিলাস-বিহ্বলা কমলার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, পুরোবর্ত্তিনী করুণাময়ী বাগ্‌দেবতার দিকে অনিমেষে চাহিয়া অতৃপ্ত-হৃদয়ে বলেন,—

"এস মা করুণা-রাণী,
ও বিধু-বদন খানি,
হেরি হেরি আঁখি ভরি, হেরি গো আবার;

শুনে সে উদার কথা,
জুড়াক মনের ব্যথা,
এস আদরিণী বাণী সমুখে আমার!
যাও লক্ষ্মী অলকায়,
যাও লক্ষ্মী অমরায়,
এস না এ যোগি-জন-তপোবনে আর।"

(সারদামঙ্গল)

কবির তখনকার সেই উন্মাদনা-সঙ্গীত যে, কালে এক নব-মন্দাকিনী প্রবাহিত করিবে, তাহা কবি বুঝিতে পারেন না। এমনই অপ্রবুদ্ধ ভাবে, বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষরের কবি মধুসূদন একদিন সঙ্গীত ধরিয়াছিলেন। আদি-কবি বাল্মীকি যখন আপনার গানে আপনিই বিমুগ্ধ ও কদাচিৎ "কি গাহিলাম" বলিয়া সংশয়িত, তখন চতুর্ম্মুখ স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া রত্নাকরকে আশ্বস্ত করিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন,—"ঋষিবর, তুমিই জগতের আদি-কবি হইলে, অসঙ্কোচে ও উদাত্তকণ্ঠে রামায়ণ গান কর, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড বিমোহিত হইবে, তোমার গানে মর-জীব অমরতার সুখ উপলব্ধি করিবে।" হায়, এ বাঙ্গালার রত্নাকর মধুসূদনের ভাগ্যে ঠিক ইহার বিপরীত ফলিয়াছিল। অথবা শুধু এ দেশে কেন, সকল দেশের মহাকবিদের ভাগ্যেই লাঞ্ছনা সমান! দুর্জ্জন সমালোচকের মর্ম্মঘাতিনী কশায় মহাকবি কীট্‌সের হৃদয় শতধা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল! হায়, অকালে ক্ষয়রোগে তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিল!!

বঙ্গের কবিতাসুন্দরীর রাতুল-চরণ শৃঙ্খলিত দেখিয়া মধুসূদনের প্রাণে বাজিয়াছিল, উপাস্য দেবতার দুর্দ্দশায় ভক্তের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল, তাই কাঁদিতে কাঁদিতে মধুসূদন বলিয়াছিলেন,—

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে,
মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি, কত ব্যথা লাগে,
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে!
চীন-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে!"

প্রেমে হউক, শোকে হউক, আদরে হউক, উপেক্ষায় হউক, মানুষ যখন পাগলপারা হয়, তখন তাহার সকল বিষয়েই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যায়, সে তখন উদ্দামভাবে বিচরণ করিতে চায়, তাহার সমক্ষে তখন বিশ্বের তাবৎ পদার্থই ঐহিক রীতিনীতির

শৃঙ্খলা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া, পুরাতন সমস্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া, এক অতি মনোরম নবীনতায় সাজিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

এই কবিবাক্যের তখন প্রকৃত সার্থকতা জন্মে। মহাকবি মধুসূদন বীণাপাণির প্রেমে পাগল হইয়াছিলেন,—আপনার ইহকাল-পরকাল, সুখ-দুঃখ, সম্পদ্-বিপদ্-পুত্র-কলত্র,—সমস্ত ভুলিয়া কবিতার সেবা করিয়াছিলেন, যথার্থই "ক্ষিপ্তগ্রহের ন্যায়" দিগ্‌বিদিগ্-জ্ঞানশূন্য হইয়া, কবিতা-সুন্দরীর প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া ছুটিয়াছিলেন,—একাগ্রহৃদয়ে ধ্যানে বসিয়াছিলেন,—তাঁহার সাধনায় সিদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার "অনন্য-পরতন্ত্রা" ভারতীকে মানস-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দুর্ম্মতি সে জন, যার মন নাহি মজে
কবিতা-অমৃত-রসে! হায়! সে দুর্ম্মতি,
পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সদা যে জন না ভজে
ও চরণ-পদ্ম, পদ্ম-বাসিনি! ভারতি!
কর পরিমল-ময় এ হিয়া-সরোজে—
তুষি যেন বিজ্ঞে, মা গো, এ মোর মিনতি!"

তাঁহার মিনতি সফল হইয়াছে। শুধু "হিয়া" নহে, ভারতীর করস্পর্শে তাঁহার দেহ মন সমস্তই "পরিমলময়" হইয়াছিল, তাই তাঁহার সংস্পর্শে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গভূমি চিরদিনের মত পরিমলময়ী হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গভাষার "রাঙা চরণে মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি" দেখিয়া, মধুসূদনের হৃদয়ে যে কি ব্যথা লাগিয়াছিল, তাহা উপরিধৃত কয় পঙ্‌ক্তি হইতেই বেশ বুঝা যায়। আমি যাঁর সেবা করিয়া জীবন ধন্য করিব, যাঁহাকে মা বলিয়া প্রাণ শীতল করিব, কানন-প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিয়া যাঁহাকে ডাকিব, আমার সেই ডাকে সমগ্র গৌড়ভূমি চমকিয়া উঠিবে, আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিবে,—আমার এমন যে মা, এত সাধের, এত আদরের যে মা, তাঁহার চরণে শৃঙ্খল! পুত্র আমি, আমার সমগ্র সামর্থ্য ব্যয় করিয়া সে শৃঙ্খল ভগ্ন করিব। মা আমার উন্মুক্ত-চরণে, বন-কুরঙ্গীর মত স্বৈর-চরণে ইতস্ততঃ বিচরণ করিবেন, আর পুত্র আমি মা মা বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে বেড়াইব। যদি মায়ের চরণ-নিগড় মুক্ত করিতে না পারিলাম, তবে কিসের পুত্র আমি, কুপুত্র আমি। তাই বাণীর বরপুত্র মধুসূদন সজলনয়নে বলিলেন,—

ছিল নাকি ভাব-ধন কহ লো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে,

ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে!
কি কাজ রঞ্জনে রাঙ্গি কমলের দলে?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে!

লৌকিক ভাষায় অনুষ্টুপ্ ছন্দের প্রবর্তনের স্থায় বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন করিয়া মধুসূদন বাঙ্গালা কবিতার পথ অতি সুগম করিয়া গিয়াছেন। যত দিন বঙ্গ-ভাষা ও বাঙ্গালী জাতি থাকিবে, তত দিন তাঁহার অমিত্রাক্ষরের মধুর বীণাধ্বনি শ্রুত হইবে। অনেকের কবিতা পাঠকালেই হৃদয়ের ওজস্বিতা যেন কর্পূরের মত ক্রমে উপিয়া যায়, ক্রমে শরীর ঝিমাইতে থাকে, দেহে অহিফেনের লক্ষণ প্রকাশ পায়। আর মধুসূদনের তরঙ্গিনী কবিতা পাঠ করিয়া—

"উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।"

(নবীনচন্দ্র)

মধুসূদন চাহিতেন যে, তাঁহার স্বজাতিকে, তাঁহার চিরপ্রিয় গৌড়জনকে এমন সুধা-পান করাইবেন, যাহাতে তাহারা মানুষের মত হইবে। একেই ত নানা ভাবে সকলে ক্রমে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহার উপর আবার ঘুমের ঔষধ প্রয়োগ কেন? এখন জাগ্রত করিতে হইবে; তাই মধুর সমস্ত কবিতাতেই একটা প্রাণের অস্তিত্ব দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহার কবিতার সমস্তই প্রায় দেশীয় উপাদানে রচিত। তাহাতে বিদেশীয় মসলা নাই। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছিলেন, পাশ্চাত্য-জগতের ভাল মন্দ সমস্তই দেখিয়াছিলেন ও শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতৃ-পিতা-মহের প্রাচ্যের প্রতিমার স্থানে কদাচ পাশ্চাত্য প্রতিমা বসান নাই। জাতীয়তার বিসর্জ্জন দেন নাই। পশ্চিম গগনের সুচারু সান্ধ্যরাগের আভায় তিনি তদীয় কবিতা-রাণীর ললাট মার্জ্জনা করিয়া দিয়াছেন মাত্র, কিন্তু তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন প্রাচীর অরুণ রাগে। তাই তাঁহার কবিতার বিনাশ অসম্ভব। উপবৃক্ষই কালে শুকাইয়া যায়, মূল বৃক্ষের কিছুই হয় না। সোজা কথায় ইউরোপের নানা কারু-কার্য্যখচিত সুন্দর ফ্রেমে তিনি ভারতীয় ছবি বাঁধাইয়াছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা দেশান্তর হইতে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য, কিন্তু জাতীয় কবিতাও যদি বিজাতীয় ছাঁচে ঢালাই করিতে হয়, তবে আর রহিল কি? এরূপ দুষ্কার্য্যের ফল জাতীয়তার ক্রমিক ধ্বংস। মহাকবি মধুসূদন সে পথে যান নাই। তিনি ইউরোপের মিত্রাক্ষরে এ দেশের কবিতাকে সাজাইয়াছেন। তিনি গৌড়কে প্রাণময় করিতে চাহিয়াছিলেন, বঙ্গের কবিতাকে মদালসার পরিবর্ত্তে বীরাঙ্গনার ভূষায় বিভূষিত করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন; কৃতকার্য্য হইয়াছেন। নাটক-প্রহসনাদি সম্বন্ধে তাঁহার সাফল্য তর্কের বিষয় হইলেও, অমিত্রচ্ছন্দের সম্পর্কে তিনি যে নবযুগের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সর্ব্ববাদি-

সম্মত। মধুসূদনের পূর্ব্বে বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দ অন্তভাবে কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হইত বটে, কিন্তু তাহার কোনরূপ আকর্ষণী শক্তি ছিল না। মধুসূদনের যে কম্বুনাদে বঙ্গসাহিত্য-গগন মুখরিত, তাহার এক ভগ্নাংশও ঐ সব প্রাণহীন কবিতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না। শুধু তাঁহার নয়নের নহে, তাঁহার কবিতার "হিরণ্ময় জ্যোতিতে"ও বাঙ্গালা ভাষা চিরদিনের মত জ্যোতিষ্মতী হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার কার্য্যে এবং কবিতায়, উভয়ত্রই একটা উৎকট আবেগ দেখিতে পাই। কার্য্যক্ষেত্রে যেমন তিনি কদাচ জড়তার অধীন হইতেন না, কখনো একভাবে, একটা বিষয় লইয়া থাকিতে পারিতেন না, সর্ব্বদাই চাহিতেন, যাহা করিতেছেন, তাহা ছাড়া আরও একটা কিছু; কবিতার ক্ষেত্রেও তদ্রূপ। যখন যেখানে গিয়াছেন, ভালমন্দ যেমন অবস্থাতেই পড়িয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ের টান কিন্তু কবিতার প্রতি সর্ব্বদাই সমান। কোন কারণে, কোন অবস্থাতেই তাহার ন্যূনতা ঘটে নাই। বরঞ্চ বাহ্য বিশৃঙ্খলা, সাংসারিক অস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কবিতার সেবায় তিনি অধিকতররূপে নিবিষ্ট হইতে পারিতেন। আত্মসত্তায় তাঁহার প্রভূত বিশ্বাস ছিল, তাই যখন একটা নূতন কিছু করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন দৃঢ়তার সহিত বন্ধু-বান্ধবকে তাহার সাফল্যের কথা বলিতেন। সর্ব্বপ্রথম যখন চতুর্দ্দশপদী কবিতা লেখেন, তখন তিনি প্রথম কবিতাটি, তদীয় প্রিয় ও অকৃত্রিম সুহৃদ রাজনারায়ণ বাবুকে পাঠাইয়া লিখিয়াছিলেন,—

What say you to this my good friend ! In my humble opinion, if cultivated by men of genius. our sonnet in time would rival the Italian.

তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী তিনিই সার্থক করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সনেটটি কবি-ভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ মাইকেল-জীবনীতে আমরা এইরূপ দেখিতে পাই:—

কবিমাতৃভাষা

"নিজাগারে ছিল মোর অমূল্য রতন
অগণ্য ; তা' সবে আমি অবহেলা করি,
অর্থলোভে দেশে দেশে করিনু ভ্রমণ,
বন্দরে বন্দরে যথা বাণিজ্যের তরী।
কাটাইনু কত কাল সুখ পরিহরি,
এই ব্রতে, যথা তপোবনে তপোধন,
অশন শয়ন ত্যজে ইষ্টদেবে স্মরি,
তাঁহার সেবায় সদা সঁপি কায়-মন৷

বঙ্গকুললক্ষ্মী মোরে নিশার স্বপনে
কহিলা,—'হে বৎস, দেখি তোমার ভকতি,
সুপ্রসন্ন তব প্রতি দেবী সরস্বতী।
নিজ গৃহে ধন তব, তবে কি কারণে
ভিখারী তুমি হে আজি, কহ, ধনপতি!
কেন নিরানন্দ তুমি আনন্দ-সদনে'!"

এই কবিতা-রচনার অনেক পরে মাইকেল চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী নাম দিয়া যে কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করেন, এইটি তাহার তৃতীয় কবিতা; মনে হয়, ঐ প্রথম কবিতাটি মাজিয়া ঘসিয়া কবিবর "বঙ্গভাষা" এই নামে বাহির করেন, কেন না, প্রথমের কথা ভোলা বা প্রথমের মায়া ছাড়া বড়ই কঠিন।

বঙ্গভাষা

"হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা' সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি।
অনিদ্রায়, নিরাহারে, সঁপি কায়, মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি;—
কেলিনু শৈবলে, ভুলি কমল-কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী দশা তবে কেন তোর আজি!
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!'
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।"

তিলোত্তমা-রচনার পর চতুর্দ্দশপদী কবিতায় মাইকেল হাত দেন। তিলোত্তমা অমিত্রচ্ছন্দের এক প্রকার প্রথম কাব্য। বোধ হয়, বঙ্গের তদানীন্তন পণ্ডিতমণ্ডলী তিলোত্তমার প্রতি প্রথম প্রথম তত সদয় ব্যবহার করেন নাই। মাইকেল যদিও কখনো আত্মমতানুযায়ী কার্য্য করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই, বা পরের মুখাপেক্ষী হইয়া কবিতা লেখেন নাই, তথাপি কিন্তু বঙ্গের নূতনচ্ছন্দের আবিষ্কর্ত্তা

তাঁহার আদরিণী তিলোত্তমাকে অন্যে আদর করিতেছে, দেখিয়া, আনন্দে বন্ধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—You will be pleased to hear that the Pundits are coming round regarding Tillottoma. The renowned Vidyasagore has at last condescended to see 'great merit' in it, and the 'Shome Prokash' has spoken out in a favourable manner.

বঙ্গভাষার প্রধান মহাকাব্য মেঘনাথ-বধ-প্রকাশ-বিষয়ে রাজা দিগম্বর মিত্র অর্থ-সাহায্য করিবেন, এই প্রতিশ্রুতি পাইয়া, বঙ্গ-কবিকুল-কেশরী মধুসূদন নিজেকে অশেষ সৌভাগ্যশালী মনে করিয়াছিলেন। হায়,—বাণীর বরপুত্রের এই সময়ের উক্তিতে নয়ন সজল হইয়া আসে। তিনি বলিয়াছিলেন,—In this respect, I must thankfully acknowledge, I am singularly fortunate. All my *idle* things find Patrons and customers. * * * তাঁহার 'idle things' গুলি আজ বঙ্গভাষার উজ্জ্বলরত্ন, বঙ্গবাণীর কিরীটমণি এবং বাঙ্গালার তথা বাঙ্গালীর অশেষ গর্ব্বের কারণ।

সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের কাব্যাবলীর প্রত্যেকখানিই যেমন নিজের নিজের এক অতি অসাধারণ ধর্ম্মে শ্রেষ্ঠত্বসম্পন্ন, মধুসূদনের কবিতা-গ্রন্থগুলিরও প্রত্যেকখানি সেইরূপ এক একটি অসাধারণ ধর্ম্মে বিমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব-সম্পন্ন। সেইরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম বাঙ্গালার অন্য কোন কাব্যে আছে কি না, বা কালে থাকিবে কি না, তাহা বলিতে পারি না। মধুসূদনের বীরাঙ্গনা যখন পড়ি,—দ্বারকানাথের উদ্দেশে রুক্মিণীর সেই পত্র—সেই :—

"শরমে মায়ের পদে নারি নিবেদিতে
এ পোড়া মনের কথা। চন্দ্রকলা সখী,
তার গলা ধরি, দেব, কাঁদি দিবানিশি!—
নীরবে দু'জনে কাঁদি সভয়ে বিরলে!
লইনু শরণ আজি ও রাজীব-পদে;—
বিঘ্ন-বিনাশন তুমি, ত্রাণ বিঘ্নে মোরে।
কি ছলে ভুলাই মনঃ, কেমনে যে ধরি
ধৈরয, শুনিবে যদি, কহিব, শ্রীপতি!
বহে প্রবাহিণী এক রাজ-বন-মাঝে,
"যমুনা" বলিয়া তারে সম্বোধি আদরে,
গুণনিধি! কূলে তার কত যে রোপেছি

তমাল কদম্ব—তুমি হাসিবে শুনিলে !!
পুষিয়াছি সারী শুক, ময়ূর ময়ূরী
কুঞ্জবনে ; অলিকুল গুঞ্জরে সতত,
কুহরে কোকিল ডালে ; ফোটে ফুলরাজী।
কিন্তু শোভাহীন বন প্রভুর বিহনে !
কহ কুঞ্জবিহারীরে হে দ্বারকাপতি,
আসিতে সে কুঞ্জবনে বেণু বাজাইয়া ;
কিংবা মোরে লয়ে দেব দেহ তাঁর পদে।"

এই অনুপম পঙ্‌ক্তিগুলি যখন পাঠ করি, তখন যথার্থই আত্মবিস্মৃত হই, কবির অপূর্ব্ব সৃষ্টিচাতুর্য্য দর্শনে ও শব্দগ্রন্থনের অনুপম কৌশলে একেবারে বিমোহিত হইয়া পড়ি। তখন—

"তয়া কবিতয়া কিংবা তয়া বনিতয়াপি বা।
পাদবিন্যাসমাত্রেণ মনো নাপহৃতং যয়া॥"

আলঙ্কারিকের এই উক্তির প্রকৃত অর্থাববোধ হয়। এমন সুন্দর কবিতা, সুন্দর পদরচনা, সুন্দর ভাবাবেশ যে ভাষায় আছে, যে ভাষায় হইতে পারে, সেই ভাষা আমার মাতৃভাষা, সেই ভাষা আমার জন্মভূমির ভাষা, আমার বাঙ্গালার ভাষা, ইহা যখন ভাবি, তখন সত্যই একটা অপূর্ব্ব শ্লাঘা অনুভব করি। যখন—

"এই দেখ্‌ ফুলমালা গাঁথিয়াছি আমি—
চিকণ গাঁথন !
দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বঁধুরে ছলে—
প্রেম-ফুল-ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন !
হ্যাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধা-বিনোদন ?
কি কহিলি, কহ, সই, শুনি লো আবার—
মধুর বচন।
সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন !
মধু,—যার মধুধ্বনি— কহে, কেন কাঁদ, ধনি !
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?"

প্রভৃতি ব্রজাঙ্গনার বিষাদ-গীতিকা শ্রবণ করি, তখন এই সকল কবিতার প্রতি চরণে, প্রতি অক্ষরে, মধুধ্বনি, মধুসূদনের নবনীতকল্প হৃদয়ের প্রকৃত রূপ দেখিতে পাই।

আবার

"কি কহিলি, বাসন্তি, পর্ব্বতগৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে,
কা'র হেন সাধ্য বল রোধে তার গতি!
দানব-নন্দিনী আমি, রক্ষঃকুল-বধূ,
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি! ভিখারী রাঘবে ?"

প্রমীলার এই মেঘমন্দ্রধ্বনির সহিত ব্রজাঙ্গনার ঐ মধুধ্বনি মিলাইয়া পড়িলে বুঝা যায় যে, বিধাতা কি অপূর্ব্ব উৎকটে-মধুরে, কঠোরে-কোমলে, রৌদ্রে-জ্যোৎস্নায় মধুর কল্পনাপ্রতিমার গঠন করিয়াছিলেন। কল্পনা, সহচরীর স্থায় তাঁহার অনুবর্ত্তন করিত। কোথাও কল্পনার মন্দতায় বা ভাবের অল্পতায় তাঁহার কবিতার অঙ্গহানি ঘটে নাই। তাঁহার যে কোন কবিতা যখনই পাঠ করি, দেখি, তাহাতে তদীয় হৃদয়ের দৃঢ়তার একটা ছাপ্ যেন স্বতই লাগিয়া আছে। বঙ্গকাব্যকাননে তিনি দৃপ্ত সিংহের স্থায়, মদগর্ব্বিত নাগেন্দ্রের স্থায় বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, কোথাও কদাচ কোন কারণে তিনি স্খলিত হন নাই। বিশ্বের কে কি বলিল, কে কি করিল, যে পথে চলিয়াছি, ইহাতে কোথায় কত দূরে যাইয়া পান্থশালা পাইব, যে পাথেয় আছে, তাহাতে কুলাইবে কি না, এই সব ঐহিক হিসাব-নিকাশের তিনি কোন ধারই ধারিতেন না। তাঁহার পৃথিবী এক স্বতন্ত্র বস্তু ছিল। তাঁহার পৃথিবী যথার্থই

"নিয়তি-কৃত-নিয়মরহিতা, হ্লাদৈকময়ী,
অনন্য-পরতন্ত্রা এবং নবরসরুচিরা" ছিল।

(কাব্যপ্রকাশ)।

মহাকবি তাঁহার সেই কল্পিত জগতের কল্পনাসাগরে নিজেকে ভাসাইয়া দিতেন, ক্ষীরোদশায়ী পুরুষোত্তমের স্থায় নিজের ভূমায় নিজেই ডুবিয়া থাকিতেন। মধ্যে মধ্যে আনন্দালস-নেত্রে স্বদেশবাসীদের দিকে চাহিয়া প্রেমভরে মধুবর্ষণ করিতেন, "যোড় করি কর, গৌড়সুভাজনে" কহিতেন; "শুন যত গৌড়চূড়ামণি"—বলিয়া যে অমৃতে নিজে আত্মহারা, তাহা বিলাইবার জন্ত স্বদেশবাসী ভ্রাতৃবৃন্দকে আহ্বান করিতেন।

"বিনা স্বদেশের ভাষা পূরে কি আশা ?"

এই কবিবাক্যে তাঁহাকে উদ্বোধিত করিয়াই যেন গন্তব্য পথ চিনাইয়া দিয়াছিল। যখন তিনি আদি-কবি বাল্মীকির ন্যায় দিব্যচক্ষু পাইলেন, তখন ধ্যানভঙ্গের পর দেখিলেন, তাঁহার বড় সাধের "মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে।" তদবধি কি এক উন্মাদনা তাঁহার হৃদয়ে আসন পাতিয়া বসিল, সেই উন্মাদনার অঙ্গুলি-সঙ্কেতে কবিবর দিগ্‌বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া স্বকীয় স্বৈরচারিণী কল্পনাকে লইয়া ছুটিলেন। অন্য কথা নাই, অন্য চিন্তা নাই, অন্য কার্য্য নাই, ঐ এক ধ্যান, এক জ্ঞান। কবিভূষণ যোগীন্দ্রনাথের সঙ্কলিত মাইকেল-জীবনীতে কবিবরের যে সকল পত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, মহাকবি মধুসূদনের চিত্তে দিবারজনী বঙ্গভাষার এবং বঙ্গ-কবিতার চিন্তা কিরূপ প্রকটভাব ধারণ করিয়াছিল। ঐ সকল পত্রের প্রত্যেকখানির গড়ে প্রতি ত্রিশ পঙ্‌ক্তির মধ্যে সাতাইশ পঙ্‌ক্তি কেবল বঙ্গ-কবিতার কথায় পূর্ণ। বিধাতা দেবদুর্ল্লভ প্রেমরত্নে তাঁহার হৃদয় বিমণ্ডিত করিয়াছিলেন, অপার্থিব কবিত্ব-সম্পদে সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার সমস্তই কবিত্বময় ছিল। তিনি দেখিতেন কবিতা, শুনিতেন কবিতা, কহিতেন কবিতা। কখনো তিনি ভারত-সাগরে ডুবিয়া তিলোত্তমারূপ মুক্তা তুলিতেন ও তাহার মালা গাঁথিয়া মাতৃভাষার কমকণ্ঠে পরাইয়া দিতেন,—কখন আবার

"গম্ভীরে বাজায়ে বীণা গাইল কেমনে,
নাশিলা সুমিত্রাসুত লঙ্কার সমরে,
দেবদৈত্য-নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র-নন্দনে";—

কখন বা—

"কল্পনা-দূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে

গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি" শুনিতেন, ও সেই "বিরহে বিহ্বলা বালার" করুণকণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া বিদ্যাপতি-চণ্ডিদাসের বীণায় বিরহসঙ্গীতের আলাপ করিতেন। কত সাগর মহাসাগর পার হইয়া দেশবিদেশে তিনি ঘুরিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের প্রতি তাঁহার কেমনই একটা আকর্ষণ ছিল যে, তিনি উদ্দাম যৌবনেও ডুব দিলেন "ভারত-সাগরে," অন্য সাগরে নহে। পাশ্চাত্য কবিকুলের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াও তিনি তিলার্দ্ধের জন্য প্রাচ্য কবিকুলের সেবা করিতে বিস্মৃত হন নাই। "কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদ" পাথেয় লইয়া তিনি দুর্গম কবিত্ব-কাননে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

তাঁহার কবিজীবনের দুইটি স্তর দেখিতে পাই। প্রথমটি কবির ইউরোপ-গমনের পূর্ব্বকাল, দ্বিতীয়টি ইউরোপ-যাত্রা হইতে তাহার পরবর্ত্তী কাল। তদীয় যে সমুদয় কাব্য-রত্নাবলীতে বঙ্গবাণী অলঙ্কৃত, সেগুলি ঐ পূর্ব্বকালে গ্রথিত, আর হেক্টর-বধ,

মায়াকানন এবং কবিতামালা তাঁহার ইউরোপ হইতে প্রত্যাগমনের পর লিখিত। ইহাতে বেশ দেখা যায় যে, যে শক্তি থাকায় তিনি "পূর্ব্বে ভারতসাগরে" ডুবিয়া রত্ন তুলিতে পারিয়াছিলেন, ভারতসাগরের পারে যাইয়া তাঁহার সে শক্তির তিনি উপচয় করিতে পারেন নাই, প্রত্যুত অপচয়ই ঘটিয়াছিল। যদিও চতুর্দ্দশপদী কবিতার প্রকাশ ফরাসীর ভার্সেলস্ নগরে, কিন্তু তাহার জন্মস্থান এই ভারতবর্ষ। রাজনারায়ণ বাবুর নিকট কবি নিজেই সে কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তিনি যখন ইউরোপে গমন করেন, তখন তাঁহার ঐ প্রথম সনেটটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, নতুবা রাজনারায়ণ বাবুর নিকট লিখিত সেই সনেট আমরা বর্ত্তমান চতুর্দ্দশপদী কবিতাপুস্তকে ঐরূপ সংশোধিত আকারে দেখিতে পাইতাম না। তিনি ইউরোপে যাইয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যে উদ্দেশ্যে তিনি গিয়াছেন, তাহার সুসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন না। তিনি আইন-কানুন যাহাই পড়ুন বা যাহাই করুন না কেন, প্রাণ কিন্তু তাঁহার সর্ব্বদাই মাতৃভাষার জন্য কাঁদিত। তিনি নিজেই কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছেন,—

"পরধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে, ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি!
অনিদ্রায়, নিরাহারে সঁপি কায়-মনঃ,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি॥"

বাহ্যতঃ মধুসূদন ইউরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে—বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়া ছিল। কবে বাঙ্গালায় শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চ্চনা, কবে বিজয়া-দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুল কুল করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ভাগ্যবান্ ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল,—সুদূর ফরাসীতে বসিয়া, বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিতপ্রায়, সেই স্থানে বসিয়া তিনি বঙ্গের এই সমুদয় সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন, ও না জানি কত আনন্দই পাইতেন। বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভার্সেলেসে বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন। জন্মভূমি যশোর-সাগরদাড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্য্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে সমুদয় তিনি সাগরপারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থই মধুময় ছিল। "বাঙ্গালার ফুল, বাঙ্গালার ফলে, বাঙ্গালার মাটী, বাঙ্গালার জলে" তাঁহার অন্তর বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল। ফরাসীতে বসিয়া তিনি যমুনার কথা ভাবিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন,—

"আর কি কাঁদে, লো নদি, তোর তীরে বসি,
মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী?
আর কি পড়ে লো এবে তোর তীরে খসি
অশ্রুধারা, মুকুতার কমরূপ ধরি?"

বলিয়া তাঁহার মধুর বাঁশরী বাজাইতেন। কতকাল হইল, বঙ্গের কবিকুঞ্জ মধু-হীন হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাপিও যেন সে বাঁশীর সুর বাঙ্গালার বাতাসে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। "শ্যামা" বঙ্গভূমিকে লক্ষ্য করিয়া মধুসূদন বলিয়াছিলেন—

"মধুহীন করো না'ক তব মনঃ-কোকনদে।"

তাঁহার সে প্রার্থনা সফল হইয়াছে। বঙ্গভূমি বক্ষের উপর মধুর স্মৃতি ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। যত দিনের পর দিন যাইতেছে, ততই মধুর মধুর কবিতার রসে বঙ্গ অধিকতররূপে নিমগ্ন হইতেছে। সভ্যবৃন্দ, কৃত্তিবাস, কাশীদাসের দেশে, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের দেশে, জয়দেব, মুকুন্দরাম, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাসের দেশে মধুসূদনের জন্ম, যে দেশে নির্ম্মল আকাশে বলাকার খেলা, শ্যামল বনানীতে শ্যামাদোয়েলের সঙ্গীত, সুনীলতটিনীতে দাঁড়িমাঝিদের সারি-গান, সেই দেশে মধুসূদনের জন্ম, যেখানে সায়ংকালে নদীতীরে বটবৃক্ষের মূলে বসিয়া রাখাল বালক—

"হরি, বেলা গেল সন্ধ্যা হলো
পার করো আমারে"

বলিয়া গান ধরে, নদীর কুল কুল গীতিকার সহিত সেই রাখাল-সঙ্গীত মিশিয়া ভাসিতে ভাসিতে ক্রমে মিলাইয়া যায়, মধুর সেই দেশে জন্ম,—তাহার উপর আবার সম্ভ্রান্ত বংশের অবতংস, ধনে মানে, কুলে শীলে সর্ব্বাংশে তদানীন্তন সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। সকল রকমেই স্পৃহণীয় অবস্থায়, অভিজাত ও অবস্থাপন্ন পিতা-মাতার আদরের পুত্র মধুসূদন পরিবর্দ্ধিত। সর্ব্বোপরি, বিধাতার শুভাশীর্ব্বাদ, বাগ্‌দেবতার কৃপামৃত তাঁহার উপর বর্ষিত; রাজরাজেশ্বরের অক্ষয় ভাণ্ডারেও যে রত্ন নাই, শত শত সাম্রাজ্য-বিনিময়ে যে রত্নের লাভ করা যায় না, সেই সর্ব্বোত্তম কবিত্বরত্নের অম্লান মালা বীণাপাণি স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে পরাইয়া দিয়াছিলেন,—সুতরাং তাঁহার সমকক্ষ কে?

শুভক্ষণে মধুসূদন ভক্তিগদগদ-কণ্ঠে বাগ্‌দেবতার চরণে প্রার্থনা করিয়াছিলেন—

"* * * মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া,

বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)।
তেমতি দাসেরে আসি দয়া কর, সতি !
———তব বরে চোর রত্নাকর,
কাব্য-রত্নাকর কবি !
উর তবে, উর, দয়াময়ি !
গাইব, মা ! বীররসে ভাসি
মহাগীত, উরি দাসে, দেহ পদ-ছায়া।"

মধুসূদনের প্রার্থনায় বীণাপাণি প্রসন্ন হইয়াছিলেন। মায়ের বীণায় পুত্র স্বরসংযোগ করিতে পাইয়াছিল। পুত্রের জীবন সার্থক হইয়াছে। আর সেই সঙ্গে তদ্দেশ-বাসী বলিয়া এবং সেই কবি যে ভাষায় দিবাকরকল্প, সেই ভাষার সেবক বলিয়া আমরাও ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হইয়াছি। তাঁহার বিরচিত মধুচক্রে গৌড়জন দিবা-রজনী আনন্দে মধু পান করিতেছে ও করিবে। বঙ্গভাষাকে তিনি যে অনর্ঘ সম্পদে সাজাইয়া গিয়াছেন, যে "কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভায়" বঙ্গভাষাকে উদ্ভাসিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার মহিমা কোন দিন ক্ষুণ্ণ হইবে না। বঙ্গ-কবিতাসাম্রাজ্যে তিনি সম্রাটের ন্যায় আসিয়াছিলেন, সম্রাট্‌জননীর যেমন হওয়া উচিত, তেমনই ভাবে বুঝি বা ততোধিকরূপে বঙ্গভাষাকে সাজাইয়া গিয়াছেন। কালের নিরঙ্কুশ বিধানে কত কি ভাঙ্গিবে, গড়িবে, কিন্তু মধুসূদনের কবিত্বপ্রতিমার জ্যোতিঃ দিন দিন আরও বর্দ্ধিত হইবে বই ম্লান হইবে না। মধুসূদনের জন্মে বঙ্গভাষার ও বঙ্গদেশের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি হইয়াছে। আর তাঁহার ন্যায় একজন জাতীয় মহাকবিকে বৎসরান্তে অন্ততঃ একটি দিনও আমরা পূজা করিতে আসি বলিয়া, আমরাও ধন্য হইতেছি।

আহা !

বঙ্গভাষা সুললিত কুসুম-কাননে
কত লীলা করি,
কাঁদাইয়া গৌড়-জন, সে কবি মধুসূদন
গিয়াছে,—বঙ্গের মধু বঙ্গ পরিহরি।
যাও তবে কবিবর, কীর্ত্তিরথে চড়ি !
বঙ্গ আঁধারিয়া,
যথায় বাল্মীকি ব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
রহিয়াছে সিংহাসন তোমার লাগিয়া।

যে অনন্ত মধুচক্র রেখেছ রচিয়া
কবিতা-ভাণ্ডারে ;
অনন্ত কালের তরে, গৌড়জন-মধুকরে,
পান করি, করিবেক যশস্বী তোমারে।
(নবীনচন্দ্র)

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

নারায়ণ

মাসিক পত্র

সম্পাদক

শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩২৪ সাল

সূচী

	বিষয়		লেখক	পৃষ্ঠা
১।	কাণ্বের কোমল মূর্ত্তি	...	শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৬৫৯
২।	স্বামী ...	...	শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৬৭২
৩।	আহ্বান (কবিতা)	...	শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী	৬৮৯
৪।	বাংলাব চিত্রকলা	...	শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়	৬৯১
৫।	কমলের দুঃখ	..	শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত	৭০৩
৬।	অদৃষ্ট ...	...	শ্রীঅপর্ণা দেবী	৭১০
৭।	মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	...	শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	৭১২
৮।	সাহিত্যে "রূপান্তর"	...	শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল	৭২২
৯।	দোস্‌রা নম্বর	...	শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী	৭২৯

কলিকাতা, ১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট,

"বসুমতী" প্রেসে,—শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নারায়ণ

৩য় বর্ষ, ২য় খণ্ড, ৩য় সংখ্যা] [শ্রাবণ, ১৩২৪

কণ্বের কোমল মূর্ত্তি

কণ্বমুনি কশ্যপের বংশ। তিনি ঋষি, তপস্বী, সংযমী, অতি কঠোর। তিনি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী অর্থাৎ চির-ব্রহ্মচারী। তিনি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশই করেন নাই। ব্রহ্মচর্য্যই তাঁহার একমাত্র আশ্রম। তিনি শিষ্যদের শিক্ষা দেন, নিজে ব্রত, উপবাস, হোম, যজ্ঞ করেন, আর বনে বাস করেন। শকুন্তলাকে তিনি কুড়াইয়া পান, তাঁহার দয়া হয়। তিনি তাহাকে পালন করেন। ক্রমে শকুন্তলার প্রতি তাঁহার খুব স্নেহ হয়, খুব মায়া হয়। কঠোর মুনির মন একটু গলে। শার্ঙ্গরব ও শারদ্বত তাঁহার কঠোরতা ও সংযমের প্রতিমূর্ত্তি, আর অনসূয়া, গোতমী ও প্রিয়ংবদা তাঁহার স্নেহের মায়ার প্রতিমূর্ত্তি।

শকুন্তলা-নাটকে কালিদাস এই পাঁচটি পাত্রের দ্বারাই কণ্বমুনিকে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। সুতরাং ইহাদের স্বভাব-চরিত্র একটু ভাল করিয়া বুঝা চাই। মহাভারতে এ পাঁচটির একটিও নাই। একা শকুন্তলা—কণ্বের আশ্রমে প্রতিপালিতা শিক্ষিতা শকুন্তলা একাই সব করিয়াছেন। রাজার সঙ্গে গান্ধর্ব্ববিবাহেও শকুন্তলা একা। রাজসভায় বারবছরের ছেলে লইয়াও শকুন্তলা একা। পদ্মপুরাণে আশ্রমে শকুন্তলার একটি সখী ছিল; কিন্তু পদ্মপুরাণ আগে কি কালিদাস আগে, সে কথা লইয়া এখনকার পুরাণকারদের মতামত আছে। সে কচ্‌কচি আমাদের এখানে দরকার নাই।

মহাভারতে একা শকুন্তলা যাহা করিয়াছেন, কালিদাস তাহারই জন্য এই পাঁচটিকে

সৃষ্টি করিয়াছেন। শকুন্তলার লালন-পালনে শকুন্তলার ভাল-মন্দ করায় এই পাঁচটিই কণ্বের সহায়। তিনি যেন একাই পাঁচ হইয়া তাঁহার জীবিত-সর্ব্বস্ব শকুন্তলার অদৃষ্ট-বিধাতা হইয়াছেন। সুতরাং এই পাঁচটিরই পরিচয় আবশ্যক এবং শকুন্তলার জন্য কে কি করিল, তাহাও জানা আবশ্যক। কূটস্থ ব্রহ্ম যেমন দূরে থাকিয়া কূটে—পর্ব্বতশিখরে—থাকিয়া জগতের কার্য্যকলাপ দেখেন, কণ্ব-মুনিও দূরে থাকিয়া শকুন্তলার ভাগ্যচক্র চালন করেন। তাঁহাকে কালিদাস উপস্থিত করেন না। কেবল একবার উপস্থিত করিয়াছিলেন—সে কেবল করুণার মূর্ত্তি, স্নেহের মূর্ত্তি, পিতার মূর্ত্তি। তিনি অতি কঠিন সময়ে বাহির হইয়া আসিয়াছেন এবং একটি বিষম সমস্যা পূরণ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সমস্যাটিও বড়ই বিষম। অন্য সময়ে তাঁহার মূর্ত্তিগুলিই কাজ করিয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলির মধ্যে অনসূয়া আর প্রিয়ংবদা সর্ব্বদাই শকুন্তলার সঙ্গে থাকে। একজন কেবল শকুন্তলাকেই লইয়া থাকেন; আর একজন শকুন্তলার হইয়া ঘুরিয়া বেড়ান। একজন শকুন্তলার জন্য ভাবেন; আর একজন শকুন্তলার জন্য কাজ করেন। একজন সব্‌জেক্‌টিব সখী; আর একজন অব্‌জেক্‌টিব সখী। একজন তাঁহার পরিচর্য্যা করেন; আর একজন তাঁহার জন্য ওকালতি করেন। একজন ধীর, আর একজন খরতর। একজন কেবল শকুন্তলাকেই দেখেন; আর একজন চারিদিক দেখেন কেবল শকুন্তলার ভালর জন্য। কিন্তু দুজনেরই স্নেহ সমান, মায়া সমান এবং শকুন্তলার প্রতি সমান টান। কালিদাস সেই জন্য অনেক জায়গায় দুজনকে দিয়া একই কথা বলাইয়াছেন, দেখাইয়াছেন, শকুন্তলার উপর সমান টান ত আছেই, তাহার উপর দুইজনে দুই উপায়ে শকুন্তলার মঙ্গল চিন্তা করেন। এখন দেখা যাক্, দুজনে কি কি উপায়ে শকুন্তলার হিত করিলেন। প্রথম অনসূয়া। শকুন্তলার এতটুকু কষ্টও তিনি সহিতে পারেন না। শকুন্তলা যে ফুলগাছে জল দেন, অনসূয়ার তাহাতেও কষ্ট। বলিলেন, "তোমার চেয়েও গাছগুলিকে কণ্বমুনি অধিক ভালবাসেন বোধ হয়; নহিলে তুমি নবমালিকা-ফুলের মত নরম, তোমায় কেন গাছে জল দিতে বলিবেন?" শকুন্তলাও ঠিক জানেন যে, অনসূয়া তাঁহার অধিক টান টানেন, তাই যখন বাকল পরিয়া তাঁহার কষ্ট হইতেছিল, তিনি প্রিয়ংবদার কাছে না গিয়া অনসূয়াকে বলিলেন, "বাকল বড় আঁটি হইয়াছে, তুমি একটু লোল করিয়া দেও।" শকুন্তলা যখন বনজ্যোৎস্না নামে নবমালিকাগাছটিকে জল না দিয়াই সারিয়া যাইতেছেন, তখন অনসূয়াই তাঁহাকে মনে করিয়া দিলেন; কারণ, তিনি জানেন, বনজ্যোৎস্না শকুন্তলার বড় আদরের জিনিস। তিনি চালাক নন, রঙ্গরস তাঁহার বড় একটা পছন্দ নয়। তাই যখন প্রিয়ংবদা রঙ্গ করিয়া বলিল, "অনসূয়া, জানিস্, বনজ্যোৎস্নাকে শকুন্তলা এত ভালবাসে কেন?"

সে সরলা উত্তর করিল, "আমি বলিতে পারি না।" রাজা তাহাদের সাম্‌নে উপস্থিত হইয়া যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তপস্বিকন্যাদের উপর কে অত্যাচার করিতেছে?" তখন অনসূয়া আসিয়া বলিলেন, "না না, কেহ কিছু করে নাই, কেবল একটি ভোমরা আমাদের সখীকে বড় ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে।" তার পর রাজা যখন শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন গো, তোমাদের তপস্যার কোন বিঘ্ন হইতেছে না ত?" আর শকুন্তলা ভয়ে সম্ভ্রমে জড়সড় হইয়া পড়িলেন, কথা কহিতে পারিলেন না। তখন অনসূয়াই বলিল, "যখন এমন অতিথি পাইয়াছি, তখন আর কি আমাদের তপস্যার বিঘ্ন হইতে পারে?" শকুন্তলার উপর অতিথিসৎকারের ভার, তাই তাঁকে বলিলেন, "যাও শকুন্তলা, অর্ঘ্যের জন্য কুঁড়েতে গিয়া জল আন, এই জলেই উঁহার পা ধোয়া হইবে।" তিনিই শকুন্তলাকে মনে করাইয়া দিলেন, অতিথির সৎকারই আমাদের কাজ; বলিলেন, "এস আমরা বসি।" রাজার পরিচয় অনসূয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা যখন "হত ইতি গজ" করিয়া আপনার পরিচয় দিলেন, তখন তিনিই বলি-লেন, "তপস্বীরা আজ কৃতার্থ হইলেন।" রাজা যখন শকুন্তলার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনিই সরলভাবে সে পরিচয় দিয়া দিলেন। শেষ কথাগুলা একটু সরমের কথা, তাই তাঁহার একটু বাধ-বাধ করিতেছিল। রাজা যখন বলিলেন, "আর বলিতে হইবে না, ইহার পর যাহা যাহা হইয়াছে, আমিই বুঝিয়া লইয়াছি, ইনি অপ্সরার মেয়ে।" তখন হাঁপ ছাড়িয়া অনসূয়া বলিলেন, "আজ্ঞা হাঁ।" রাজা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মেয়ে লইয়া মুনি কি করিবেন?" তখন কিন্তু অনসূয়া তাহার জবাব দিলেন না। কারণ, এখানে একটু ওকালতির দরকার, সেটা তার অভ্যাস নাই। তাই প্রিয়ংবদা তাহার জবাব দিল। শকুন্তলা যখন প্রিয়ংবদার জবাব শুনিয়া চলিয়া যাইতে চাহিলেন, তখন আবার অনসূয়ার দরকার হইল। তিনি বলিলেন, "এমন অতিথি পাইয়াছ, ইঁহার সৎকার না করিয়া আপন ইচ্ছায় চলিয়া যাওয়া উচিত নহে।" হাতীর কথা উঠিলে রাজা যখন উঠিয়া যাইতে ব্যস্ত হইলেন, তখন অনসূয়াই বলিলেন, "আরণ্য হাতীর ব্যাপারে আমরাও ভয়ে আকুল হইয়াছি। অনুমতি করেন ত আমরাও ঘরে যাই।"

শকুন্তলা অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে সখীরা পদ্মের পাতা দিয়া উঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন এবং দুজনে উঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, পদ্মপত্রের বাতাস তোমার ভাল লাগিতেছে ত?" আর শকুন্তলা জবাবে বলিলেন, "তোমরা কি আমায় বাতাস করিতেছ?" তখন দুজনেই বিষণ্ণ হইলেন, কিন্তু কেন শকুন্তলার এত অসুখ হইল, সে কথা জিজ্ঞাসার ভার অনসূয়াই লইলেন। সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই, ভালবাসার সুখদুঃখ ত আমরা জানি না; কিন্তু বইয়ে যেমন পড়িয়াছি, তাহাতে বোধ হয়, তুমি কাহাকেও ভালবাসিয়া বড় কষ্ট পাইতেছ, তা ভাই, আমাদের কাছে

খুলে বল। কারণ জানিতে না পারিলে কেমন করিয়া প্রতীকারের চেষ্টা করিব?" শকুন্তলা যখন সব খুলিয়া বলিলেন, তখন অনসূয়াই বলিলেন, "অতিশীঘ্র এবং অতি-গোপনে এখন রাজার সহিত মিলনের উপায় কি?" উপায় করায়, ওকালতির ভার অনসূয়ার নহে। কিন্তু যে উপায়টি স্থির হইল, অনসূয়া বলিলেন, সেটি বেশ হইয়াছে। কিন্তু তবুও শকুন্তলার মত না লইয়া কাজে প্রবৃত্ত হইতে পারিলেন না। যখন রাজার ও শকুন্তলার মনের ভাব এক, এ কথাটা ঠিক বুঝা গেল, তখন অনসূয়াই রাজাকে প্রথম "বয়স্ত" বলিয়া সম্বোধন করিলেন এবং শকুন্তলা যে পাথরখানিতে বসিয়াছিলেন, তাহারই একপাশে বসিতে বলিলেন। আবার রাজা যখন বলিলেন, "আমার মনের ভাব অন্যরূপ, এ কথাটা আপনারা একেবারেই মনে করিবেন না"; তখন অনসূয়াই বলিলেন, "বয়স্ত," আপনাদের ত অনেক পরিবার আছে। তবে আমাদের যাহাতে সখীর জন্য এর পর দুঃখ করিতে না হয়, তাহা করিবেন।" এই কথাটি বলিয়া তিনি রাজাকে বলাইয়া লইলেন যে, "শকুন্তলাই তাঁহার পাটরাণী হইবেন।"

রাজা যে দিন ঋষিদের নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী যাইবেন, সে দিন অনসূয়া ভারী চিন্তিত—সবই ত হ'ল ভাল; শকুন্তলার গান্ধর্ববিবাহ ত হ'ল। বরও ভাল হ'ল। কিন্তু যদি দেশে গিয়া আর পাঁচরাণীর পাল্লায় পড়িয়া রাজা শকুন্তলাকে ভুলিয়া যান? তাহাতে প্রিয়ংবদা বলিলেন, "ওরকম চেহারায় এতটা ভুল সম্ভব হবে না। তবে কর্তা বাড়ী আসিয়া কি বলেন, সেইটাই ভয়।" তাহা শুনিয়া অনসূয়া বলিলেন, "সে ভয় বড় নাই। তিনি ত ভাল বরে মেয়ে দেবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। তা যদি দৈবই ভাল বর জুটাইয়া দিয়াছে, তিনি ত কৃতার্থই হইয়াছেন।" দুজনেই ফুল তুলিতেছিলেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, "ফুল যথেষ্ট হইয়াছে।" অনসূয়া বলিলেন, "না, এখনও হয় নাই। কেন না, এখন যে শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতার পুজা করিতে হইবে।" এই সব কথা হইতেছে, এমন সময়ে কে চীৎকার করিয়া বলিল, "অয়মহং ভোঃ!" কথাটা প্রথমেই অনসূয়ার কানে গেল। তিনি বলিলেন, "অতিথি আসিয়াছে গো।" ইতিমধ্যেই দুর্বাসা আসিয়া শাপ দিয়া চলিয়া গেলেন। অমনি প্রিয়ংবদা বলিলেন, "বাপ্‌ রে, অন্য কোন অতিথি নয়, স্বয়ং দুর্বাসা।" অনসূয়া বলিলেন, "তবে তুমি যাও, পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে ঠাণ্ডা কর। আমি পাদ্য অর্ঘ্য লইয়া যাইতেছি।" এই সময় অনসূয়া হোঁচট খাইলেন, তাঁহার হাত থেকে ফুলের সাজি পড়িয়া গেল। তিনি জানিলেন, শকুন্তলার সৌভাগ্যদেবতারা প্রসন্ন নন। তিনি ফুলগুলি কুড়াইয়া লইতেছেন, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা আসিয়া খবর দিলেন যে, তিনি দুর্বাসাকে নরম করিতে পারিয়াছেন। অনসূয়ার বড়ই আনন্দ। আগ্রহ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। যখন শুনিলেন যে, অভিজ্ঞান দেখাইলেই সব চুকিয়া যাইবে, তখন বলিলেন, "তা এখন আমাদের আশা হইল। রাজা নিজেই একটি আঙটী

দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নাম খোদা আছে, শকুন্তলা সেইটি দেখাইলেই চলিবে।” আবার বলিলেন, “দেখ ভাই প্রিয়ংবদা, এ কথাটা আমাদেরই মনে মনে থাকুক। শকুন্তলাকে এ কথাটা বলার দরকার নাই। সে ভয় পাবে।”

শকুন্তলার বিদায় যে দিন, সে দিন অনসূয়া খুব সকালে উঠিয়া ভাবিতেছেন, “রাজা ত শকুন্তলার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিলেন না। শকুন্তলা নিতান্ত সরল, সে ত সে কথা বুঝিতে পারিতেছে না। কিন্তু এত দিন কোন খবর দিলেন না, এইটা কি রাজার উচিত হইয়াছে? আমার যে আর কোন কাজে আস্থা নাই। আমার যে কোনও কাজে হাত-পা এগোয় না। হয় ত দুর্ব্বাসার শাপই রাজাকে সব কথা ভুলাইয়া দিয়াছে। কি করি, অভিজ্ঞান আঙটীটা রাজার কাছে পাঠাইয়া দিব? কে বা যাবে? তপস্বী বেচারারা সমস্ত দিন আপন কাজ লইয়াই থাকে, কাকেই বা বলি? আবার সখীরই দোষ, সুতরাং কর্ত্তার কাছে যে সব কথা খুলিয়া বলিব, তাও ত পারি না। এ দিকে শকুন্তলা যে গর্ভবতী, কি করি, ভাবিয়া কূল পাই না।” তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে প্রিয়ংবদা আসিয়া খবর দিল, শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে। অনসূয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আগ্রহ করিয়া শুনিতে লাগিলেন। দৈববাণীতে কণ্ব সব খবর শুনিয়াছেন, জানিতে পারিয়া অনসূয়ার বড় আমোদ। তিনি প্রিয়ংবদাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, “শকুন্তলা যাবে, বড় আনন্দের কথা; কিন্তু আমাদের বড় উৎকণ্ঠা হইতেছে। দেখ, নারিকেলের ঠুলিতে একছড়া বকুলের মালা রাখিয়াছি, সে ছড়াটা এই সময়ে সঙ্গে লইয়া যাই। গোরোচনা, তীর্থমৃত্তিকা, দূর্ব্বা এ সকলগুলি আমিই সংগ্রহ করি গিয়া। মঙ্গলকাজে ত এ সবগুলি দিতেই হবে।”

বিদায়ের সময়ে কণ্বমুনির সম্মুখে দুই সখীই একেবারে কথা কহিয়াছেন। কেবল যখন শকুন্তলা চক্রবাকীকে দেখিয়া জনান্তিকে বলিলেন, “এই চকী পদ্মপাতার আড়ালে থাকিলেও চকা চীৎকার করিয়া দেশ মাতাইয়া তুলে। অতএব আমি যাহা করিতেছি, অন্যে তাহা পারে না অর্থাৎ আমি যে রাজাকে ছাড়িয়া এত দিন আছি, এমন থাকাটা খুব কঠিন।” তাহাতে অনসূয়া বলিলেন, “এও চকা ছাড়িয়া রাত্রি কাটায়। জাগরণের রাত্রি পোহায় না। কেবল আশা থাকে বলিয়াই বিরহের দুঃখটা কতক সহা যায়।”

এই ত গেল অনসূয়ার কথা। তিনি শান্ত, সরল, ধীর, বেশ বিজ্ঞ, অনেক খবর রাখেন আর শকুন্তলাতেও একেবারে তন্ময়।

তাহার পর প্রিয়ংবদা, বড় চালাক, চতুর, চঞ্চল, বড় রহস্যপ্রিয়; সুবিধা পাইলে কাহাকেও ছাড়েন না। শকুন্তলা যখন “বাকল কসা হইয়াছে, প্রিয়ংবদা কসিয়া

দিয়াছে” বলিতেছিলেন, প্রিয়ংবদা তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। বলিলেন, “দোষ বুঝি আমার? নিজের যৌবন আরম্ভ হইয়াছে, ছাতী ফুলিয়া উঠিয়াছে, কাপড় কসা হইতেছে, দোষ বুঝি আমার?” তার পর গাছে জল দিতে দিতে বকুলগাছের কাছে আসিয়া বলিলেন, “শকুন্তলা, তুই ভাই, এই গাছটার তলায় একবার দাঁড়া। গাছে আর লতায় একবার মিল হউক।” আবার যখন বনজ্যোৎস্নার কথা পড়িল, প্রিয়ংবদা বলিল, “অনসূয়া, জানিস্, শকুন্তলা কেন বনজ্যোৎস্নাকে এত ভালবাসে? ও যেমন মনের মত গাছের সঙ্গে মিলিয়াছে, আমিও ঐ রকম মনের মত বর পাব।” শকুন্তলা ত রাগিয়াই অস্থির। অনসূয়া যখন অতিথিসৎকারের জন্য পাদ্য ও অর্ঘের আয়োজন করিবার জন্য ব্যস্ত, প্রিয়ংবদা বুঝিলেন, এ অতিথি পাদ্য অর্ঘ্য চায় না, মিষ্ট কথাই চায়, তাই বলিলেন, “আপনি এই ছায়ায় ছাতিমগাছের তলায় বসুন ও বিশ্রাম করুন।” অতিথিটি কে, জানিবার জন্য প্রিয়ংবদাই প্রথম উৎসুক হন এবং কানে কানে অনসূয়াকে বলেন, “জান না ভাই, এ লোকটি কে?” অনসূয়া শকুন্তলার পরিচয় দিলে পর, যখন মেয়ে লইয়া মুনি কি করিবেন কথা উঠিল, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “ভাল বর পেলে মুনি কন্যাটি দান করিবেন।” শকুন্তলা এই কথা শুনিয়া যখন যাইতে উদ্যত হইলেন, কিছুতেই ফিরিবেন না, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, “আমার দুকলসী জল ধারিস্, দিয়া তবে যা।” শকুন্তলার ধার রাজা যখন আঙটী দিয়া শোধ দিলেন, তখন প্রিয়ংবদা আঙটীতে রাজার নাম দেখিয়া অতিথি যে রাজা, এইটিই অনুমান করিলেন। তখন অতিথি বলিলেন, “আমি রাজপুরুষ, রাজা আমায় এই আঙটীটি দিয়াছেন।” প্রিয়ংবদা পাকা উকীলের মত, ফাঁক পাইয়া, বলিয়া উঠিলেন, “তা হ’লে ‘ত’ অর্থাৎ রাজার প্রসাদ হ’লে ‘ত’ এটি আপনার হাত থেকে তফাৎ করা কি উচিত?” সুতরাং রাজাকে আঙটীটি ফিরাইয়া লইতে হইল। কালিদাস রাজা যে আঙটী ফিরাইয়া লইয়াছিলেন, সে কথা বলেন নাই। কিন্তু লওয়াটা সত্য; কারণ, অভিজ্ঞান দেওয়ার সময় যদি প্রিয়ংবদার কাছে আর একটা আঙটী থাকিত, সেটির কথা অবশ্যই উঠিত, “তাত” উঠে নাই। যাবার দিন শকুন্তলাকে রাজা যে আঙটী দিয়াছিলেন, তাহারই কথা উঠিয়াছিল। আঙটী ফিরাইয়া দিয়া প্রিয়ংবদা শকুন্তলাকে বলিলেন, “এখন তুমি যাইতে পার।” এটা মর্ম্মান্তিক ঠাট্টা, শকুন্তলা গেলেন না।

শকুন্তলার অসুখের সময় তিনি খস্‌খসে ও পদ্মের মৃণাল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। শকুন্তলার যখন বড় অসুখ, পদ্মপাতার বাতাসও তাঁহার গায়ে লাগিতেছে না। অনসূয়া অসুখের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আর শকুন্তলা ইতস্ততঃ করিতেছেন,

তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "এ ত বেশ বলিতেছে, আপনার অসুখ গোপন করিতেছ কেন? তোমার শরীর রোজ রোজ রোগা হইয়া যাইতেছে। কেবল লাবণ্যময়ী ছায়া তোমায় ত্যাগ করিতেছে না।" শেষ শকুন্তলা যখন সব খুলিয়া বলিলেন, তখন কাজের ভার প্রিয়ংবদা লইলেন। "সখি, বেশ হইয়াছে। তুমি যাকে ভালবাস, সে পুরুবংশের প্রদীপ! সাগর ছাড়িয়া কি অন্যত্র মহানদী গিয়া পড়ে? মাধবীলতা কি আমগাছ ছাড়া তালগাছে শোভা পায়?" অনসূয়া যখন বলিলেন, গোপনেও শীঘ্র মিলন হওয়া চাই, তখন বুদ্ধিমতী প্রিয়ংবদা বলিলেন, "শীঘ্র হ'তে বড় কষ্ট হবে না, কিন্তু গোপনে হওয়াই দুর্ঘট। কেন না, শকুন্তলাকে দেখিয়া অবধি রাজাও যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছেন। দেখিলে বোধ হয় যেন, রাত্রে তাঁহার ভাল ঘুম হয় না, তাই তিনি শুকিয়ে যাইতেছেন।" এটা অনসূয়া দেখেন নাই; কিন্তু প্রিয়ংবদা দেখিয়াছেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, "তবে এখন শকুন্তলা আপনার মনের ভাব খুলিয়া লিখুক, আপনাকে রাজার হাতে সঁপিয়া দিক্। একখানি পত্র লিখুক, আমি নির্ম্মাল্যের ভিতর পুরিয়া রাজার হাতে পঁহুছিয়া দিব। গানের আকারেই লিখুক।" গান লেখা হইলে শকুন্তলা বলিলেন, "গান ত তৈয়ার হ'ল, লেখার উপায়?" উপস্থিতবুদ্ধি প্রিয়ংবদা বলিলেন, "পদ্মপাতার উপর নখের আঁচড় দিয়া লেখ।" রাজা যখন অনসূয়ার কথায় শকুন্তলার সঙ্গে এক বিছানায় বসিলেন, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "আপনারা দুজনেই পরস্পরকে খুব ভালবাসেন, আমার কোন কথার দরকার নাই, তবে সখীকে বড় ভালবাসি, তাই জিজ্ঞাসা করিতে হয়।" রাজা অনুমতি দিলে, বলিলেন, "রাজার অধিকারে যদি কাহারও দুঃখ হয়, রাজার উচিত নয় কি সে দুঃখমোচন করা?" রাজা বলিলেন, "সেও আবার কথা, তাও আবার বলিতে হয়?" তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "আমার সখী আপনার জন্য বড় কাতর, উহাঁর কাতরতা যাহাতে যায়, তাহা করিয়া দিউন।"

শকুন্তলাকে রাজা পাটরাণী করিবেন স্বীকার করিলে দুই সখীরই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু প্রিয়ংবদা বুঝিল, আমাদের আর এখানে থাকা উচিত নয়। উহারা যাহা জানে করুক; বলিলেন, "অনসূয়া, ঐ দেখ, হরিণ-শিশুটা আমাদের দিকে দৃষ্টি দিয়া রহিয়াছে, আহা, বেচারার মা কাছে নাই, মাকেই খুঁজিতেছে। এস আমরা উহার মাকে খুঁজিয়া দিই।" বলিয়া অনসূয়াকে সঙ্গে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন।

রাজার বিদায়ের দিন যখন অতিথি "অয়মহং ভোঃ" বলিলেন, তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "ঘরের কাছে শকুন্তলা আছে, তবে কি না, তাহার মন এখন তাতে নাই।" দুর্ব্বাসার শাপ যখন শোনা গেল, তখন প্রিয়ংবদা প্রথম বলিলেন, এ ত যে সে অতিথি নয়, স্বয়ং দুর্ব্বাসা এবং অনসূয়ার কথায় দৌড়িয়া দুর্ব্বাসাকে ধরিলেন,

পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে নরম করিলেন এবং শাপের একটা অবসান করিলেন। সমস্ত কথা অনসূয়াকে বলিলেন এবং যাইতে যাইতে শকুন্তলাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, শকুন্তলা বাঁ হাত গালে দিয়া কেমন ভাবিতেছে। যেন একখানি ছবি। রাজার চিন্তায় ওর এখন আপনার কথাই মনে নাই, তাতে আবার অতিথি।"

শকুন্তলার বিদায়ের দিন প্রিয়ংবদাই অনসূয়াকে খবর দিল। শকুন্তলা আজ শ্বশুরবাড়ী যাবে। অনসূয়া ত শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিল, আর ভাবিয়া আকুল হইতেছিল। সে কাশ্যপের আসা হইতে দৈববাণী শোনা ও শকুন্তলার যাওয়ার উদ্যোগ সব অনসূয়ার কাছে গল্প করিল। শকুন্তলাকে সাজাইতে হইবে, প্রিয়ংবদা ফুলের মালা গাঁথিতে লাগিল। এমন সময়ে হস্তিনাপুর যাইবার জন্য শিষ্যদের ডাক পড়িল। প্রিয়ংবদার কথায় তাহারা দুইজনেই সেই দিকে যাইতে লাগিল। প্রিয়ংবদা বলিল, "ঐ দেখ, শকুন্তলা সকালেই 'শিখাসম্মর্জন' স্নান করিয়া অর্থাৎ মাথা ধুইয়া, ঐখানে দাঁড়াইয়া আছেন। আশীর্ব্বাদ শেষ হইয়া গেলে সখীরা শকুন্তলাকে সাজাইতে লাগিলেন। প্রিয়ংবদা বলিলেন, "এ রূপ অলঙ্কারেরই উপযুক্ত। ফুলের মালায় ইহার অবমান করা হয়।" বনদেবতাদের দেওয়া অলঙ্কার আনিলে প্রিয়ংবদা বলিলেন, "বনদেবতারা যখন এত অনুগ্রহ করিয়াছেন, তখন বোধ হয়, রাজার ওখানে তুমি রাজলক্ষ্মী ভোগ করিবে।" যাইবার সময় যখন শকুন্তলা বলিলেন, "আশ্রমত্যাগ করিয়া যাইতে আমার আর পা উঠিতেছে না;" তখন প্রিয়ংবদা বলিলেন, "তুমিই যে কেবল তপোবন-বিরহে কাতর, এমন নহে। তপোবনেরও কি দশা হইয়াছে, দেখ। হরিণের মুখ থেকে কুশের গ্রাস পড়িয়া যাইতেছে, ময়ূর নাচিতেছে না, গাছের ডাল থেকে শাদা পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে—বোধ হইতেছে, যেন তাহারা চোখের জল ফেলিতেছে।"

কালিদাস এক একটি সখীদ্বারা এতগুলি কথা বলাইয়াছেন। যাহার যেমন স্বভাব, যাহার যেমন প্রকৃতি, তাহার মুখে সেই কথাই বলাইয়াছেন। কিন্তু দুজনেই ত সখী। শকুন্তলার অনেক কাজে দুজনেরই সমান টান, কিছুই ইতরবিশেষ নাই। সেই জন্য কালিদাস অনেক জায়গায় দুজনেরই মুখে এক সময়ে একই কথা বাহির করিয়াছেন। টৈকডিয়েজন দিয়াছেন "সথ্যৌ"—একেবারে দ্বিবচনে। সেইগুলি একবার পড়িলে দুটি সখীর প্রকৃতি বেশ বুঝা যাইবে। প্রথম রাজা যখন আশ্রমে ঢুকিলেন, দূর হইতে তাঁহার কানে গেল—"ইদো ইদো সহীয়ো" "সখীরা এই দিকে এই দিকে"। রাজা প্রথম বুঝিতে পারিলেন না, এটা মানুষের শব্দ কি দূরে ভ্রমরের গুঞ্জন, কি পাখীর ডাক, কি দূরস্থ সঙ্গীতের ধ্বনি। তাই বলিলেন, "যেন দূরে কে

আলাপ করিতেছে।" কালিদাস এখানে ঐ যে "আলাপ ইব শ্রূয়তে" লিখিয়াছেন এবং "ইব" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, উহার অর্থ অনেক। সে কথা যাক।

গোড়ায়ই. কালিদাস বলিয়াছিলেন যে, শকুন্তলার দুই সখীর প্রতিই সমান টান। তিনি দুজনে বড় ইতরবিশেষ করেন না। সেটা জেনে রাখা প্রেক্ষকের পক্ষে বড় দরকার। তার পর অনেকক্ষণ দুজনে নানা কথাবার্ত্তা হইলে পর, ভোম্‌রাটা যখন শকুন্তলাকে বড় জ্বালাতন করিতেছে, আবার শকুন্তলা দুই সখীকেই পরিত্রাণের জন্য ডাকিলেন, তখন দুই জনেই বলিয়া উঠিল, "আমরা তোমার পরিত্রাণ করিবার কে? দুষ্মন্তকে ডাক। তপোবন "ত" রাজাই রক্ষা করেন।" এ জায়গায় দুই সখীর মুখ থেকেই এক কথা বাহির হইল। রাজা যখন সত্য সত্যই আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন দুজনেই সমান আশ্চর্য্য হইয়া গেল। আবার যখন শকুন্তলা ও রাজার আকার-প্রকার দেখিয়া দুজনেই বুঝিলেন, একটা কিছু হইয়াছে, শকুন্তলা রাজাকে ভালবাসিয়াছে, রাজাও শকুন্তলার রূপ দেখিয়া ভুলিয়াছেন; তখন দুজনেই শকুন্তলাকে আস্তে আস্তে বলিলেন, "শকুন্তলা, আজ যদি বাবা এখানে থাকিতেন।" শকুন্তলা বলিলেন, "তা হ'লে কি হ'ত," "আপনার জীবনসর্ব্বস্ব দিয়াও এমন অতিথির সৎকার করিতেন।" এ জায়গায় কেহ মনে করিতে পারেন, এ কথাটা প্রিয়ংবদার মুখে দিলেই ভাল হইত। সেই ঠাট্টা ভালবাসে, তারই মুখে শোভা পাইত। অনসূয়া গম্ভীরা, তার মুখে তত শোভা পায় না। কিন্তু আসল কথাটা এই যে, এমন একটা সুযোগ পেলে যতই ভালমানুষ হউক, কোন মেয়েই ছাড়ে না। তাই কালিদাস দুটি মেয়ের মুখেই ঠাট্টাটা তুলিয়া দিয়াছেন।

রাজা আবার যখন বলিলেন, "আমি আপনাদের সখীর সম্বন্ধে গোটাকতক কথা জিজ্ঞাসা করিব", তখন দুজনেই বলিলেন, "এ ত আপনার অনুগ্রহ, এর জন্য আবার প্রার্থনা কেন?" দুজনেই যেমন রাজার পরিচয় পাইতে ব্যস্ত, তেমনি দুজনেই শকুন্তলার পরিচয় দিতেও ব্যস্ত। রাজা যখন দুকলসী জলের বদলে আঙটীটি দিলেন, তখন দুজনেই পরস্পরের মুখের দিকে চাহিলেন। দুজনেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন, আনন্দিত হইয়াছেন, দুজনেরই যেন মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার পথ হইয়াছে। আবার যখন হাতীর উপদ্রবে সকলেই আপন আপন জায়গায় যাইতে উদ্যত, তখন দুই সখী একবাক্যে বলিলেন, "আজ ভাল করিয়া অতিথিসৎকার করিতে পারিলাম না। তাই লজ্জা হয় বলিতে, আবার কি দেখা হবে?"

শকুন্তলা একখানা বড় পাথরে শুইয়া আছেন, তার উপর ফুলের চাদর বিছান, আর সখীরা বাতাস করিতেছে, তখন দুই সখীই একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদ্মপত্রের বাতাস তোমার ভাল লাগিতেছে ত?" শকুন্তলার জবাবে দুজনেরই মুখে বিষাদের ছায়া

পড়িয়া গেল। দুজনে দুঃখে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। শকুন্তলা যখন গান রচনা করিতেছেন, কিন্তু পাছে রাজা তাচ্ছল্য করেন, সেই ভয়ে একটু কাতরও হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে একটু উৎসাহিত করা দুজনেরই দরকার, তাই দুজনেই বলিলেন, "হাতী আপনার শরীর দেখিতে পায় না, মনে করে, আমি কত ছোট। তোমারও ভাই হয়েছে তাই! তুমি আপনার গুণ জান না, চাঁদের কিরণে শরীর জুড়ায়। পৃথিবীতে কে এমন আছে যে, আঁচল দিয়া চাঁদের আলো গায়ে পড়িতে দেয় না?" শকুন্তলার রূপ যে অপরূপ, আর তাহার গুণও যে অনেক, তাহা দুই সখীরই ধ্রুব বিশ্বাস। শকুন্তলার গান বাঁধা হইয়া গেলে দুজনকেই শুনাইতে চাহিলেন। দুজনেই মন দিয়া শুনিলেন। রাজা যখন প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন, শকুন্তলাই তাঁহার পাটরাণী হইবেন, তখন দুজনেই একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "আঃ! বাঁচ্‌লাম!"

অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা দুজনেই লতার ঘর হইতে চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইল। শকুন্তলা যখন বলিলেন, "তোমাদের দুজনের একজন আমার কাছে থাক। নহিলে আমি একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িব।" তাহাতে দুজনেই বলিলেন, "যিনি সমস্ত পৃথিবীর আশ্রয়, তিনি যখন তোমার নিকটে আছেন, তখন তুমি নিরাশ্রয় কিসে?"

শকুন্তলাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবার সময়ে যখন তাপসীরা আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, দুই সখীই একেবারে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার স্নান হইয়াছে ত?" শকুন্তলা দুজনকেই আদর করিয়া বসাইলেন। উভয়েই মাঙ্গল্যদ্রব্যের দ্বারা তাঁহাকে সাজাইতে চাহিলেন। শকুন্তলা বলিলেন, "এখন এটা আমার ভাগ্য করিয়া মানিতে হইবে। আর আমার 'ত' সখীদের হাতে এ রকম সাজসজ্জা হইবে না", বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দুজনেই বলিয়া উঠিলেন, "এটা মঙ্গলের সময়, এখন কাঁদিতে নাই।" আবার যখন ঋষিকুমারেরা রাশি রাশি অলঙ্কার আনিয়া দিল, তখন দুজনেই বিপদে পড়িলেন, অলঙ্কার কোথায় কি কি পরাইতে হয়, কেহই জানেন না। তখন দুজনেই একস্বরে বলিলেন, "আমি ত কখন অলঙ্কার কাহাকে বলে, জানি না। তবে অনেক ছবি আঁকিয়াছি ও দেখিয়াছি, সেইমত করিয়া সাজাই।" এখানে কালিদাস একবচন প্রয়োগ করিয়াছেন। দুজনেই আপনার আপনার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু একবচনেই বলিয়াছেন, "আমরা" বলেন নাই। সাজান হইয়া গেলে দুজনেই বলিলেন, "সাজান শেষ হইয়াছে। এখন চেলীখানি পর।" যখন শকুন্তলা তাঁহার বড় আদরের বনজ্যোৎস্নাকে দুই সখীর হাতে সঁপিয়া দিয়া গেলেন; তখন দুজনেই শোকে ও মোহে আচ্ছন্ন হইয়া বলিলেন, "আমাদের ভাই কাহার হাতে সঁপিয়া দিলে?" বিদায়ের সময় অন্য সকলের কাছে বিদায় লইয়া শকুন্তলা সখীদের কাছে আসিলেন; বলিলেন, "তোমরা দুজনে

আমায় একবারে আলিঙ্গন কর, কোল দাও।" সখীরাও তাহাই করিল। তখন দুজনেই বলিলেন, "যদি রাজা অভিজ্ঞান চাহিয়া বসেন, তাঁহাকে এই অঙ্গুরীটি দেখাইও।" শকুন্তলা এ কথায় অত্যন্ত ভীত হইলেন। অত প্রণয়—অত ভালবাসা—আবার অভিজ্ঞান চাহিবে? শকুন্তলা চলিয়া গেলে দুজনেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "হায় হায়, মাঝে বন পড়িয়া গেল, আর যে শকুন্তলাকে দেখা যায় না।" তাঁহারা দুজনেই শকুন্তলার পথের দিকে চাহিয়াছিলেন, যতক্ষণ দেখা যাইতেছিল, একবারও চক্ষু ফিরাইতে পারেন নাই। এখন গাছের আড়াল পড়িয়া গেল, "আর দেখা যায় না" বলিয়া উঠিলেন। দুজনেরই এখন কণ্বের আশ্রম শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

কণ্বের আর এক করুণামূর্ত্তি তাঁহার ভগিনী গোতমী। কণ্ব বিদেশে গেলে শকুন্তলা আশ্রমের কর্ত্রী হইলেও, গোতমী আছেন, তিনিই ভরসা। প্রিয়ংবদা যখন নানারকম ঠাট্টা-তামাসা করিয়া শকুন্তলাকে একটু জ্বালাতন করিলেন, তখন শকুন্তলা রাগিয়া বলিলেন, "আমি যাই, প্রিয়ংবদা বাজে কথা বলিতেছে, আর্য্যা গোতমীকে বলিয়া দিই গিয়া।" শিষ্য যখন কুশ আনিতে গিয়া শুনিল, শকুন্তলার বড় অসুখ, সে বলিল, "আমি গোতমীর হাতে শান্তিজল পাঠাইয়া দিতেছি।" গোতমী যখন লতাগৃহে যাইতেছেন, সখীরা দুজনেই তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া গেলেন। তিনি গিয়াই শকুন্তলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটু ভাল আছ ত?" শকুন্তলা "হাঁ আছি" বলিলে, তিনি তাঁহার মাথায় শান্তিজল দিয়া বলিলেন, "যদি কিছু কসুর থাকে, এই শান্তিজলেই তোমার শরীর স্বচ্ছন্দ হইবে।" তাহার পর বেলা আর নাই দেখিয়া শকুন্তলাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন।

শকুন্তলা শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় যখন তাপসীরা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে আসিয়াছিলেন, গোতমীও সেই সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাপসীরা আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলে গোতমী রহিয়া গেলেন। ঋষিকুমারেরা অলঙ্কার আনিলে, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এ সব কোথায় পাইলে?" উত্তর হইল, "তাত কাশ্যপের প্রভাবে।" গোতমী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি মানসী সিদ্ধি?" উত্তর হইল "না। তিনি আমাদের বলিয়াছিলেন, শকুন্তলার জন্য বড় বড় গাছ থেকে ফুল আন, আমরা ফুল আনিতে গিয়া এই সব পাইয়াছি; কোন গাছ গরদের সাড়ী দিয়াছে, কোন গাছ আল্‌তা দিয়াছে, কোন কোন গাছে আবার বনদেবতারা হাতের পোঁচাটি বাহির করিয়া এক একখানি করিয়া গহনা দিয়াছেন।" কণ্ব আসিতেছেন দেখিয়া গোতমী শকুন্তলাকে বলিলেন, "এই তোমার

বাপ আসিতেছেন। তাঁহার চোখ দিয়া আনন্দের স্রোত ছুটিতেছে, যেন চোখ দিয়াই তোমায় কোলে করিতেছেন। উহাঁকে নমস্কার কর।" কণ্ব আশীর্ব্বাদ করিলে গোতমী বলিলেন, "এ তোমার আশীর্ব্বাদ নয়—'বর'!" আশীর্ব্বাদ ফলিতেও পারে, না ফলিতেও পারে, কিন্তু বর ফলিবেই। তাই ভগিনী গোতমী ভাইএর আশীর্ব্বাদকে "বর" করিয়া দিলেন। গুরু ভট্টাচার্য্যদিগের বাড়ী এরূপ দু একটি পিসীমা প্রায়ই থাকেন—"এ কথা যখন দাদা বলিয়াছেন, এ কখন ব্যর্থ হইবার নহে।" গোতমীও আমাদের সেই পিসীমা। যখন কোকিল ডাকিয়া উঠিল, যখন বনদেবতারা কোকিলের মুখে শকুন্তলাকে স্বচ্ছন্দমনে বিদায় দিলেন, তখন পিসীমা বলিলেন, "যাদু, তপোবনদেবতারা তোমায় বড় ভালবাসেন, তাঁরা যেন তোমার জ্ঞাতি, তাঁহারা তোমায় যাইবার অনুমতি দিতেছেন; বিদায় দিতেছেন। তাঁহাদের প্রণাম কর।" শ্বশুরবাড়ী গিয়া কি করিতে হইবে, সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া কণ্ব যখন "গোতমী কি মনে করেন?" জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তিনি বলিলেন, "নূতন বৌকে এই উপদেশই দিতে হয়। শকুন্তলা, কথাগুলি সব মনে করিয়া রাখিও।"

গোতমী যখন দেখিলেন, ডুমুরগাছের তলায় বসিয়া কণ্ব ও শকুন্তলার কথা ও কান্নাকাটি আর থামে না, শাঙ্গ´রব "সূর্য্য মাথার উপর উঠিল, শকুন্তলা, শীঘ্র শীঘ্র কথাবার্ত্তা সারিয়া লও" বলিয়াও উহাঁদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না, তখন নিজেই বলিয়া উঠিলেন, "যাওয়ার সময় উতরিয়া গেল। বাবাকে ফিরিয়া যাইতে বল, অথবা শকুন্তলাকে বলিয়াই বা কি হইবে? সে ক্রমেই নানা কথা কহিতে থাকিবে, ক্রমেই কালক্ষেপ করিবে। দাদা, আপনিই ফিরুন, থামুন।" তাহার পর কোলাকুলির পালা পড়িল, ফিরিবার চেষ্টা হইল।

রাজবাড়ীতে শিষ্টাচারের পর যখন শাঙ্গ´রব ঋষি-আজ্ঞা শুনাইয়া রাজাকে বলিলেন, "আপনি শকুন্তলাকে 'সহধর্ম্মাচরণের' জন্য গ্রহণ করুন," তখন গোতমী বলিলেন, "আমি কিছু বলিতে চাই; কিন্তু আমার কোন কথা বলিবার কোনও পথ তোমরা রাখ নাই। ইনিও গুরুজনের অপেক্ষা করেন নাই। তুমিও বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা কর নাই। পরস্পরে এরূপ ব্যবহার করিলে অন্যে এক জনের হইয়া আর এক জনকে কি বলিতে পারে?"

যখন রাজা ও শাঙ্গ´রব বেশ গরম হইয়া উঠিয়াছেন, কথা-কাটাকাটি হইতেছে, গোতমী বলিলেন, "যাদু, লজ্জা করিও না, তোমার মুখের কাপড় খুলিয়া দিই, তা হ'লে রাজা তোমায় চিনিতে পারিবেন।" যখন অঙ্গুরী না পাইয়া শকুন্তলা ক্ষোভে দুঃখে গোতমীর দিকে চাহিলেন, তখন গোতমী বলি-

লেন, "ইন্দ্রের ঘাটে শচীতীর্থে জল লইয়া নমস্কার করিবার সময় তোমার আংটীটি পড়িয়া গিয়াছে।" রাজা একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকের কি উপস্থিতবুদ্ধি!" রাজা আবার যখন শকুন্তলা মিছা কথা বলিয়া তাঁহাকে ছলনা করিতেছেন, বলিয়া উঠিলেন, তখন গোতমীর আর সহিল না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এ রকম কথাটা বলা একেবারেই ভাল নয়। ইনি তপোবনেই পালিত, জুয়াচুরি কাহাকে বলে, তাহার লেশও জানেন না।" তখন রাজা বলিলেন, "বুড়ি, পশুপক্ষীদের মধ্যেও স্ত্রীগুলা বড়ই চালাক হয়, মানুষ ত হবেই। দেখ না, কোকিলগুলা কাকের বাসায় রাখিয়া কেমন ডিম ফুটাইয়া লয়।" রাজা ও শার্ঙ্গরবে যখন ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত, শারদ্বত বলিলেন, "আর কথায় কাজ কি, গুরু বলিয়া দিয়াছিলেন, শকুন্তলাকে পঁহুছিয়া দিতে, আমরা দিলাম। ইনি আপনার ধর্ম্মপত্নী—আপনি ইহাঁকে গ্রহণ করুন বা না করুন, সে আপনার ইচ্ছা ও অধিকার" বলিয়াই গোতমীকে বলিলেন, "তুমি আগে আগে যাও।" তাহাতে শকুন্তলা সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তখন গোতমী বলিলেন, "বাবা শার্ঙ্গরব, এ যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে। স্বামী যখন ত্যাগই করিল, তখন আর কি করেই বা বেচারা?" এইখানে গোতমীর কথা শেষ হইল।

আবার বলি, অনসূয়া শকুন্তলার জন্য দিন-রাত ভাবেন, আপনার ভাবনার চেয়ে শকুন্তলার ভাবনা তাঁহার বেশী। প্রিয়ংবদাও নিজের জন্য কিছুই করেন না। যাহা কিছু করেন শকুন্তলারই ভালর জন্য। আর গোতমী, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার স্নেহ অপার, শকুন্তলার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অপার। শকুন্তলার জন্য তিনি মান অপমান কিছুই জ্ঞান করেন না। বলিতে কি, তিনিই শকুন্তলার এক রকম মা।

শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

স্বামী

সৌদামিনী নামটা আমার বাবার দেওয়া। আমি প্রায়ই ভাবি, আমাকে এক বছরের বেশী ত তিনি চোখে দেখে যেতে পাননি, তবে এমন ক'রে আমার ভিতরে বাহিরে মিলিয়ে নাম রেখে গিয়েছিলেন কি কোরে? বীজমন্ত্রের মত এই একটি কথায় আমার সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবনের ইতিহাসটাই যেন বাবা ব্যক্ত ক'রে গেছেন।

রূপ? তা আছে মানি; কিন্তু, না গো না, এ আমার দেমাক নয়—দেমাক্ নয়। বুক চিরে যে দেখান যায় না, নইলে এই মুহূর্ত্তেই দেখিয়ে দিতুম, রূপ নিয়ে গৌরব করবার আমার আর বাকি কিচ্ছু নেই—একেবারে কিচ্ছু নেই! আঠারো—উনিশ? হাঁ, তাই বটে। বয়স আমার উনিশই। বাইরের দেহটা আমার তার বেশী প্রাচীন হতে পায়নি। কিন্তু এই বুকের ভিতরটায়? এখানে যে বুড়ী তার উনআশী বছরের শুক্‌নো হাড়গোড় নিয়ে বাস ক'রে আছে, তাকে ত দেখ্‌তে পাচ্চো না? পেলে এতক্ষণ ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌তে!

একলা ঘরের মধ্যে মনে হলেও ত আজও আমার লজ্জায় মর্‌তে ইচ্ছা করে; তবে এ কলঙ্কের কালী কাগজের ওপর ঢেলে দেবার আমার কি আবশ্যক ছিল! সমস্ত লজ্জার মাথা খেয়ে সেইটেই ত আজ আমাকে বল্‌তে হবে। নইলে আমার মুক্তি হবে কিসে?

সব মেয়ের মত আমিও ত আমার স্বামীকে বিয়ের মন্তরের ভিতর দিয়েই পেয়েছিলুম। তবে, কেন তাতে আমার মন উঠ্‌ল না। তাই যে দামটা আমাকে দিতে হ'ল, আমার অতি বড় শত্রুর জন্যেও তা একদিনের জন্যে কামনা করিনে। কিন্তু দাম আমাকে দিতে হ'ল। যিনি সমস্ত পাপ-পুণ্য, লাভ-ক্ষতি, ন্যায়-অন্যায়ের মালিক, তিনি আমাকে একবিন্দু রেহাই দিলেন না। কড়ায় ক্রান্তিতে আদায় ক'রে, সর্ব্বস্বান্ত ক'রে যখন আমাকে পথে বার কোরে দিলেন—লজ্জা-সরমের আর যখন কোথাও কিছু অবশিষ্ট রাখ্‌লেন না—তখনই শুধু দেখিয়ে দিলেন, ওরে সর্ব্বনাশী, এ তুই করেছিস্ কি? স্বামী যে তোর আত্মা! তাঁকে ছেড়ে তুই যাবি কোথায়? একদিন-না-একদিন তোর ঐ শূন্য বুকের মধ্যে তাঁকে যে তোর পেতেই হবে। এ জন্মে হোক্, আগামী জন্মে হোক্, কোটি জন্ম পরে হোক্, তাঁকে যে তোর চাই-ই। তুই যে তাঁরই।

জানি, যা হারিয়েছি, তার অনন্ত গুণ আজ ফিরে পেয়েছি। কিন্তু তবু যে এ কথা কিছুতেই ভুলতে পারিনে, এটা আমার নারী-দেহ। আজ আমার আনন্দ রাখ্‌বার জায়গা নেই, কিন্তু ব্যথা রাখ্‌বারও যে ঠাঁই দেখি না প্রভু! এ দেহের প্রত্যেক অণু-পরমাণু যে অহোরাত্র কাঁদ্‌চে—ওরে অস্পৃশ্যা, ওরে পতিতা, আমাদের আর বেঁধে পোড়াস্‌নে—আমাদের ছুটি দে,—আমরা একবার ম'রে বাঁচি!

কিন্তু থাক্ সে কথা।

বাবা মারা গেলেন, একবছরের মেয়ে নিয়ে মা বাপের বাড়ী চলে এলেন। মামার ছেলেপিলে ছিল না, তাই গরীবের ঘর হলেও আমার আদর যত্নের কোন ত্রুটি হ'ল না। বড় বয়স পর্য্যন্ত তাঁর কাছে বসে ইংরাজী বাঙ্‌লা কত বই না আমি পড়েছিলুম।

কিন্তু মামা ছিলেন ঘোর নাস্তিক। ঠাকুর-দেবতা কিছুই মান্‌তেন না। বাড়ীতে একটা পূজা-অর্চ্চনা, কি বার-ব্রতও কোন দিন হতে দেখিনি—এ সব তিনি দুচক্ষে দেখ্‌তে পার্‌তেন না।

নাস্তিক বই কি! মামা মুখে বল্‌তেন বটে তিনি 'Agnostic' কিন্তু সেও ত একটা মস্ত ফাঁকি! কথাটা যিনি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি ত শুধু লোকের চোখে ধূলা দিবার জন্যেই নিজেদের আগাগোড়া ফাঁকির পেছনে আর একটা আকাশ-পাতাল জোড়া ফাঁকি জুড়ে দিয়ে আত্মরক্ষা করেছিলেন! কিন্তু তখন কি ছাই এ সব বুঝেছিলুম! আসল কথা হচ্চে সূয্যির চেয়ে বালির তাতেই গায়ে বেশি ফোস্কা পড়ে। আমার মামারও হয়েছিল সেই দশা।

শুধু আমার মা বোধ করি যেন লুকিয়ে ব'সে কি সব করতেন। সে কিন্তু আমি ছাড়া আর কেউ জান্‌তে পেত না। তা মা যা খুসি করুন, আমি কিন্তু মামার বিদ্যে ষোল আনার জায়গায় আঠার আনা শিখে নিয়েছিলুম।

আমার বেশ মনে পড়ে, দোরগোড়ায় সাধু-সন্ন্যাসীরা এসে দাঁড়ালে সঙ্ দেখ্‌বার জন্যে ছুটে গিয়ে মামাকে ডেকে আন্‌তুম। তিনি তাদের সঙ্গে এমনি ঠাট্টা সুরু ক'রে দিতেন যে, বেচারারা পালাবার পথ পেত না। আমি হেসে হাততালি দিয়ে গড়িয়ে লুটিয়ে পড়্‌তুম। এম্‌নি করেই আমার দিন কাট্‌ছিল।

শুধু মা এক-একদিন ভারি গোল বাধাতেন। মুখ ভার ক'রে এসে বল্‌তেন, "দাদা, সদুর ত দিন দিন বয়স হচ্চে, এখন থেকে একটু খোঁজা-খুঁজি না করলে সময়ে বিয়ে দিবে কি ক'রে?"

মামা আশ্চর্য্য হয়ে বল্‌তেন, "বলিস্ কি গিরি, তোর মেয়ে ত এখনো বারো পেরোয়নি—এর মধ্যেই তোর—সাহেবদের মেয়েরা ত এ বয়সে—"

মা কাঁদ কাঁদ গলায় জবাব দিতেন, "সাহেবদের কথা কেন তুলচ দাদা,

আমরা ত সত্যিই আর সাহেব নই! ঠাকুর-দেবতা না মানো, তাঁরা কিছু আর ঝগড়া কর্‌তে আস্‌চেন না, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের সমাজ ত আছে? তাকে উড়িয়ে দেবে কি ক'রে?"

মামা হেসে বল্‌তেন,"ভাবিস্‌নে বোন্‌, সে সব আমি জানি। এই যেমন তোকে হেসে উড়িয়ে দিচ্চি, ঠিক এম্‌নি ক'রে আমাদের নচ্ছার সমাজটাকেও হেসে উড়িয়ে দেব।"

মা মুখ ভার করে বিড়্‌বিড়্‌ করে বক্‌তে বক্‌তে উঠে যেতেন। মামা গ্রাহ্য কর্‌তেন না বটে, কিন্তু আমার ভারি ভয় হ'ত। কেমন ক'রে যেন বুঝ্‌তে পার্‌তুম, মামা যাই বলুন, মার কাছ থেকে আমাকে তিনি রক্ষা কর্‌তে পার্‌বেন না।

কেন যে বিয়ের কথায় ভয় হতে সুরু হয়েছিল, তা বল্‌চি। আমাদের পশ্চিম পাড়ার বুক চিরে যে নালাটা গ্রামের সমস্ত বর্ষার জল নদীতে ঢেলে দিত, তার দুই পাড়ে যে দু'ঘরের বাস ছিল, তার এক ঘর আমরা, অন্য ঘর গ্রামের জমিদার বিপিন মজুমদার। এই মজুমদার-বংশ যেমন ধনী, তেমনি দুর্দ্দান্ত। গাঁয়ের ভেতরে বাইরে এদের প্রতাপের সীমা ছিল না। নরেন ছিল এই বংশের একমাত্র বংশধর।

আজ এত বড় মিথ্যেটা মুখে আন্‌তে আমার যে কি হচ্চে, সে আমার অন্তর্যামী ছাড়া আর কে জান্‌বে বল, কিন্তু তখন ভেবেছিলুম, এ বুঝি একটা সত্যি জিনিস,—সত্যিই বুঝি নরেনকে ভালবাসি।

কবে যে এই মোহটা প্রথম জন্মেছিল, সে আমি বল্‌তে পারি না। কলকাতায় সে বি, এ পড়্‌ত; কিন্তু ছুটির সময় বাড়ী এলে মামার সঙ্গে ফিলজফি আলোচনা কর্‌তে প্রায়ই আস্‌ত। তখনকার দিনে 'agnosticism'ই ছিল বোধ করি লেখাপড়া-জানাদের ফ্যাস্যান। এই নিয়েই বেশী ভাগ তর্ক হ'ত। কতদিন মামা তাঁর গৌরব দেখাবার জন্যে নরেন বাবুর তর্কের জবাব দিতে আমাকে ডেকে পাঠাতেন। কতদিন সন্ধ্যে ছাড়িয়ে রাত্রি হয়ে যেত, দুজনের তর্কের কোন মীমাংসা হ'ত না। কিন্তু আমিই প্রায় জিত্‌তুম, তার কারণও আজ আর আমার অবিদিত নেই।

মাঝে মাঝে সে হঠাৎ তর্কের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়ে মামার মুখপানে চেয়ে গভীর বিস্ময়ে ব'লে উঠ্‌ত, "আচ্ছা ব্রজ বাবু, এই বয়সে এত বড় লজিকের জ্ঞান, তর্ক কর্‌বার এমন একটা আশ্চর্য্য ক্ষমতা কি আপনি একটা ফিনোমিনন ব'লে মনে করেন না?"

আমি গর্ব্বে, সৌভাগ্যে ঘাড় হেঁট কর্‌তুম। ওরে হতভাগী! সে দিন ঘাড়টা তোর চিরকালের মত একেবারে ভেঙে মাটীতে লুটিয়ে পড়েনি কেন?

মামা উচ্চ অঙ্গের একটু হাস্য ক'রে বল্‌তেন, "কি জান নরেন, এ শুধু শেখাবার ক্যাপাসিটি।"

কিন্তু তর্কাতর্কি আমার তত ভাল লাগ্‌ত না, যত ভাল লাগ্‌ত তার মুখের মন্টিক্রিষ্টোর গল্প। কিন্তু গল্পও আর শেষ হ'তে চায় না, আমার অধৈর্য্যেরও আর সীমা পাওয়া যায় না। সকালে ঘুম ভেঙে পর্য্যন্ত সারাদিনে একশ বার মনে কর্‌তুম, কখন্ বেলা পড়্‌বে, কখন্ নরেন বাবু আস্‌বে।

এম্‌নি তর্ক ক'রে আর গল্প শুনে আমার বিয়ের বয়স বারো ছাড়িয়ে তেরোর শেষে গড়িয়ে গেল, কিন্তু বিয়ে আমার হ'ল না।

তখন বর্ষার নবযৌবনের দিনে মজুমদারদের বাগানের একটা মস্ত বকুলগাছের তলা ঝরা ফুলে-ফুলে একেবারে বোঝাই হয়ে যেত। আমাদের বাগানের ধারের সেই নালাটা পার হয়ে আমি রোজ গিয়ে কুড়িয়ে আন্‌তুম। সে দিন বিকালেও মাথার উপর গাঢ় মেঘ উপেক্ষা করেই দ্রুতপদে যাচ্ছি, মা দেখ্‌তে পেয়ে বল্‌লেন, "ওলো, ছুটে ত যাচ্চিস্, জল যে এল ব'লে।" আমি বল্‌লুম, "জল এখন আস্‌বে না, মা, ছুটে গিয়ে দুটো কুড়িয়ে আনি।" মা বল্‌লেন, "পোনর মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি নাম্‌বে, সদু কথা শোন্—যাস্‌নে। এই অবেলায় ভিজে গেলে ঐ চুলের বোঝা আর শুকোবে না, তা ব'লে দিচ্চি।"

আমি বল্‌লুম, "তোমার দুটি পায় পড়ি মা, যাই। বৃষ্টি এসে পড়্‌লে মালীদের ওই চালাটার মধ্যে গিয়ে দাঁড়াব।"—বল্‌তে বল্‌তেই ছুটে পালিয়ে গেলুম। মায়ের আমি একটি মেয়ে—দুঃখ দিতে আমাকে কিছুতে পার্‌তেন না। ছেলেবেলা থেকেই ফুল যে কত ভালবাসি, সে ত তিনি নিজেও জানতেন, তাই চুপ ক'রে রইলেন। কত দিন ভাবি, সে দিন যদি হতভাগীর চুলের মুঠি ধ'রে টেনে আন্‌তে মা, এমন ক'রে হয় ত তোমার মুখ পোড়াতুম না।

বকুল-ফুলে কোঁচড় প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এসেছে, এমন সময় মা যা বল্‌লেন, তাই হ'ল। ঝম্-ঝম্ ক'রে বৃষ্টি এল। ছুটে গিয়ে মালীদের চালার মধ্যে ঢুকে পড়্‌লুম। কেউ নেই, খুঁটি ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে মেঘের পানে চেয়ে ভাব্‌চি, দুম্ দুম্ ক'রে ছুটে এসে কে ঢুকে পড়্‌ল। মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখি—ও মা! এ যে নরেন বাবু! কলকাতা থেকে তিনি যে বাড়ী এসেছেন, কৈ, সে তো আমি শুনিনি!

আমাকে দেখে চম্‌কে উঠে বল্‌লেন, "অ্যাঁ, সদু যে! এখানে? অনেক দিন তাঁকে দেখেনি, অনেকদিন তাঁর গলা শুনিনি, আমার বুকের মধ্যে যেন আনন্দের ঢেউ ব'য়ে গেল। কান পর্য্যন্ত লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠ্‌ল;—মুখের পানে চেয়ে ত জবাব দিতে পারলুম না, মাটীর দিকে চেয়ে বল্‌লুম, "আমি ত রোজই ফুল কুড়ুতে আসি। কবে এলেন?" নরেন মালীদের একটা ভাঙা খাটিয়া টেনে নিয়ে ব'সে বল্‌লে, "আজ সকালে। কিন্তু তুমি কার হুকুমে ফুল চুরি কর শুনি?"

গম্ভীর গলায় আশ্চর্য্য হয়ে হঠাৎ মুখ তুলে দেখি, চোখ দুটো তার চাপা হাসিতে নাচ্‌চে।

লজ্জা! লজ্জা! এই পোড়ার মুখেও কোথা থেকে হাসি এসে পড়্‌ল; বল্‌লুম, "তাই বই কি! কষ্ট ক'রে কুড়িয়ে নিলে বুঝি চুরি করা হয়?" নরেন ফস্ ক'রে দাঁড়িয়ে উঠে বল্‌লে, "আর আমি যদি ঐ কুড়োনো ফুলগুলো তোমার কোঁচড়ের ভেতর থেকে আর একবার কুড়িয়ে নিই, তাকে কি বলে?"

জানিনে, কেন আমার ভয় হ'ল, সত্যিই যেন এইবার সে এসে আমার আঁচল চেপে ধর্‌বে। হাতের মুঠো আমার আল্‌গা হয়ে গিয়ে চোখের পলকে সমস্ত ফুল ঝপ্ ক'রে মাটীতে প'ড়ে গেল।

"ও কি কর্‌লে?"

আমি কোনমতে আপনাকে সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লুম, "আপনাদেরই ত ফুল, বেশত, নিন্ না কুড়িয়ে।"

"এ্যাঁ! এত অভিমান!" বলে সে উঠে এসে আমার আঁচলটা টেনে নিয়ে ফুল কুড়িয়ে কুড়িয়ে রাখ্‌তে লাগ্‌ল। কেন জানিনে, হঠাৎ আমার দুচোখ জলে ভ'রে গেল, আমি জোর ক'রে মুখ ফিরিয়ে আর একদিকে চেয়ে রইলুম।

সমস্ত ফুলগুলি কুড়িয়ে আমার আঁচলে একটা গেরো দিয়ে নরেন তার জায়গায় ফিরে গেল। খানিকক্ষণ আমার পানে চুপ ক'রে চেয়ে থেকে বল্‌লে, "যে ঠাট্টা বুঝ্‌তে পারে না, এত অল্পে রাগ করে, তার ফিলজফি পড়া কেন? আমি কালই গিয়ে ব্রজ-বাবুকে ব'লে দেব, তিনি আর যেন পণ্ডশ্রম না করেন।"

আমি আগেই চোখ মুছে ফেলেছিলুম, বল্‌লুম, "কে রাগ করেচে?"

"যে ফুল ফেলে দিলে।"

"ফুল ত আপনি পড়ে গেল।"

"মুখখানাও বুঝি আপ্‌নি ফিরে আছে?"

"আমি ত মেঘ দেখ্‌চি।"

"মেঘ বুঝি এ দিকে ফিরে দেখা যায় না?"

"কৈ যায়?" ব'লে আমি ভুলে হঠাৎ মুখ ফেরাতেই দুজনের চোখোচোখি হয়ে গেল। নরেন ফিক্ ক'রে হেসে বল্‌লে, "একখানা আরসি থাক্‌লে যায় কি না দেখিয়ে দিতুম। নিজের মুখে চোখেই একসঙ্গে মেঘ-বিদ্যুৎ দেখ্‌তে পেতে; কষ্ট ক'রে আকাশে খুঁজ্‌তে হ'ত না।"

আমি তখ্‌খুনি চোখ ফিরিয়ে নিলুম। রূপের প্রশংসা আমি ঢের শুনেছি, কিন্তু নরেনের চাপা হাসি, চাপা ইঙ্গিত সে দিন আমার বুকের মধ্যে ঢকে আমার

হৃৎপিণ্ডটাকে যেন সজোরে দুলিয়ে দিলে। এই ত সে পাঁচ বছর আগের কথা, কিন্তু আজ মনে হয়, সে সৌদামিনী বুঝি বা আর কেউ ছিল! নরেন বল্লে, "মেঘ না কাট্‌লে ব্রজ বাবুকে ব'লে দেব, লেখা-পড়া শেখানো মিছে। তিনি আর যেন কষ্ট না করেন।"

আমি বল্লুম, "বেশ ত, ভালই ত। আমি ও সব পড়্‌তেও চাইনে, বরং গল্পের বই পড়্‌তেই আমার ঢের ভাল লাগে।"

নরেন হাততালি দিয়ে ব'লে উঠ্‌ল, "দাঁড়াও ব'লে দিচ্ছি,—আজকাল নভেল পড়া হচ্চে বুঝি?"

আমি বল্লুম, "গল্পের বই তবে আপনি নিজে পড়েন কেন?"

নরেন বল্লে, "সে শুধু তোমাকে গল্প বল্‌বার জন্যে। নইলে পড়্‌তুম না।" বৃষ্টির দিকে চেয়ে বল্লে, "আচ্ছা, এ জল যদি আজ না থামে? কি কর্‌বে?"

বল্লুম, "ভিজে-ভিজে চ'লে যাব।"

"আচ্ছা, এ যদি আসামের পাহাড়ী বৃষ্টি হ'ত তা'হলে?"

গল্প জিনিসটা চিরদিন কি ভালই বাসি! একটুখানি গন্ধ পাবা-মাত্র আমার চোখের দৃষ্টি একমুহূর্ত্তে আকাশ থেকে নরেনের মুখের উপর নেমে এল। জিজ্ঞেসা ক'রে ফেল্লুম, "সে দেশে বৃষ্টির মধ্যে বুঝি বেরোনো যায় না?"

নরেন বল্লে, "একেবারে না। গায়ে তীরের মত বেঁধে।"

"আচ্ছা, তুমি সে বৃষ্টি দেখেচ?" পোড়া মুখ দিয়ে 'তুমি' বার হয়ে গেল। ভাবি জিভ্‌টা সঙ্গে সঙ্গে যদি মুখ থেকে খসে পড়ে যেত!

সে বললে, "এর পর যদি একজন 'আপনি' ব'লে ডাকে, সে আর একজনের মরা-মুখ দেখবে।"

"কেন দিব্যি দিলেন? আমি ত কিছুতে 'তুমি' বল্‌বো না।"

"বেশ, তা হ'লে মরা-মুখ দেখো।"

"দিব্যি কিছুই না। ও আমি মানিনে।"

"কেমন মান না, একবার 'আপনি' ব'লে প্রমাণ ক'রে দাও।"

মনে মনে রাগ ক'রে বল্লুম, "পোড়ারমুখী! মিছে তেজ তোর রইল কোথায়? মুখ দিয়ে ত কিছুতে বার করতে পার্‌লিনে! কিন্তু ঐখানেই সেদিন দুর্গতির যদি শেষ হয়ে যেত!"

ক্রমে আকাশের জল থাম্‌ল বটে, কিন্তু পৃথিবীর জলে সমস্ত দুনিয়াটা যেন ঘুলিয়ে একাকার ক'রে দিলে। সন্ধ্যা হয়-হয়। ফুল কটি আঁচলে বাঁধা, কাদা-ভরা বাগানের পথে বেরিয়ে পড়্‌লুম।

নরেন বল্লে, "চল, তোমাকে পৌঁছে দি।"

আমি বললুম, "না।"

মন যেন ব'লে দিলে, সেটা ভাল না। কিন্তু অদৃষ্টকে ডিঙিয়ে যাবো কি ক'রে? বাগানের ধারে এসে ভয়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম। সমস্ত নালাটা জলে পরিপূর্ণ! পার হই কি কোরে?

নরেন সঙ্গে আসেনি, কিন্তু, সেইখানে দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিল, আমাকে চুপ ক'রে দাঁড়াতে দেখে অবস্থাটা বুঝে নিতে তার দেরি হ'ল না। ছুটে এসে বললে, "এখন উপায়?"

আমি কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললুম, "নালায় ডুবে মরি, সেও আমার ভালো, কিন্তু একলা অত দূর সদর রাস্তা ঘুরে আমি কিছুতে যাব না। মা দেখ্‌লে—"

কথাটা আমি শেষ করতেই পারলুম না।

নরেন হেসে বললে, "তার আর কি, চল, তোমাকে সেই পিঠুলি গাছটার উপর দিয়ে পার ক'রে দিই।"

তাই ত বটে! আহ্লাদে মনে-মনে নেচে উঠ্‌লুম। এতক্ষণ আমার মনে পড়েনি যে, খানিকটে দূরে একটা পিঠুলি গাছ বহুকাল থেকে ঝড়ে উপ্‌ড়ে নালার ওপর ব্রিজের মত পড়ে আছে। ছেলেবেলায় আমি নিজেই তার উপর দিয়ে এপার-ওপার হয়েচি।

খুসি হয়ে বললুম, "তাই চল—"

নরেন তার চেয়েও খুসি হয়ে বললে, "কেমন মিষ্টি শোনালে বলত!"

বললুম, "যাও—"

সে বললে, "নির্ব্বিঘ্নে পার না ক'রে দিয়ে কি আর যেতে পারি!"

বল্‌লুম, "তুমি কি আমার পারের কাণ্ডারী না কি?"

আমি আজও ভেবে পাইনি, এ কথা কোথায় শিখ্‌লুম এবং কেমন করেই বা মুখ দিয়ে বার করলুম। কিন্তু, সে যখন আমার মুখপানে চেয়ে একটু হেসে বললে, "দেখি, তাই যদি হ'তে পারি"—আমি ঘেন্নায় যেন ম'রে গেলুম।

সেখানে এসে দেখি, পার হওয়া সোজা নয়। একে ত স্থানটা গাছের ছাওয়ায় অন্ধকার, তাতে, সেই পিঠুলি গাছটাই জলে ভিজে ভিজে যেমন পিছল, তেমনি উঁচু-নীচু হয়ে আছে। তলা দিয়ে সমস্ত বৃষ্টির জল হুহু শব্দে বয়ে যাচ্চে—আমি একবার পা বাড়াই, একবার টেনে নিই। নরেন খানিকক্ষণ দেখে বললে, "আমার হাত ধ'রে যেতে পারবে?"

বললুম, 'পারব।' কিন্তু তার হাত ধ'রে এমনি কাণ্ড কর্‌লুম যে, সে কোন মতে টাল্ সাম্‌লে এদিকে লাফিয়ে পড়ে আত্মরক্ষা করলে। কয়েক মুহূর্ত্ত সে চুপ ক'রে আমার মুখপানে চেয়ে রইল, তার পরেই তার চোখ দুটো যেমন ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌ল। বললে, "দেখ্‌বে, একবার সত্যিকারের কাণ্ডারী হ'তে পারি কি না?"

আশ্চর্য্য! হয়ে বল্‌লুম "কি কোরে?"

"এম্‌নি কোরে" বলেই সে নত হয়ে আমার দুই হাঁটুর নীচে এক হাত, ঘাড়ের নীচে অন্য হাত দিয়ে চোখের নিমিষে তার বুকের কাছে তুলে নিয়ে সেই গাছটার উপর পা দিয়ে দাঁড়াল। ভয়ে আমি চোখ বুজে বাঁ হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধর্‌লুম। নরেন দ্রুতপদে পার হয়ে এপারে চলে এল। কিন্তু নামাবার আগে,—আমার ঠোঁট দু'টোকে একেবারে যেন পুড়িয়ে দিলে। কিন্তু থাক্ গে। কম ঘেন্নায় কি আর এ দেহের প্রতি অঙ্গ অহর্নিশ গলায় দড়ি দিতে চায়!

শিউরুতে শিউরুতে বাড়ী চলে এলুম, ঠোঁট দুটো তেমনি জ্বল্‌তেই লাগ্‌ল বটে, কিন্তু সে জ্বালা লঙ্কামরিচখোরের জ্বলুনির মত যত জ্বল্‌তে লাগ্‌ল, জ্বালার তৃষ্ণা তত বেড়ে যেতেই লাগ্‌ল।

মা বল্‌লেন, "ভ্যালা মেয়ে তুই সদু,—এলি কি কোরে? নালাটা ত জলে জলময় হয়েচে দেখে এলুম। সেই গাছটার ওপর দিয়ে বুঝি হেঁটে এলি? পড়ে মর্‌তে পার্‌লিনে!"

না, মা, সে পুণ্য থাক্‌লে আর এ গল্প লেখ্‌বার দরকার হবে কেন! কিন্তু সে দিন তোমার অভিসম্পাতটা যদি ফলে যেত মা, হতভাগিনীর এত বড় বর তবে আর ছিল কি!

তার পর দিন নরেন, মামার সঙ্গে দেখা করতে এল। আমি সেইখানেই ব'সে ছিলুম,—তার পানে চাইতে পার্‌লুম না, কিন্তু আমার সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালাই, কিন্তু ঘরের পাকা মেঝে যেন চোরা বালির মত আমার পা দুটোকে একটু একটু ক'রে গিল্‌তে লাগ্‌ল—আমি নড়্‌তেও পার্‌লুম না, মুখ তুলে দেখ্‌তেও পার্‌লুম না।

নরেনের যে কি অসুখ হ'ল, তা শয়তানই জানে, অনেকদিন পর্য্যন্ত আর সে কলকাতায় গেল না। রোজই দেখা হতে লাগ্‌ল। মা মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে আমাকে আড়ালে ডেকে পাঠিয়ে বল্‌তে লাগ্‌লেন, "ওদের পুরুষমানুষদের লেখা-পড়ার কথাবার্ত্তা হয়, তুই তার মধ্যে হাঁ ক'রে বসে কি শুনিস্ বল্‌ত? যা বাড়ীর ভেতরে যা। এত বড় মেয়ের যদি লজ্জা সরম এতটুকু আছে!"

একপা একপা ক'রে আমার ঘরে চলে যেতুম, কিন্তু কোন কাজে মন দিতে পার্‌তুম না। যতক্ষণ সে থাক্‌তো, তার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর অবিশ্রাম বাইরের পানেই আমাকে টান্‌তে থাক্‌ত।

আমার মামা আর যাই হোন্, তাঁর মনটা প্যাঁচালো ছিল না। তা'ছাড়া, লিখে পড়ে, তর্ক ক'রে ভগবান্‌কে উড়িয়ে দেবার ফন্দিতেই সমস্ত অন্তঃকরণটা তাঁর এম্‌নি

অনুক্ষণ ব্যস্ত হয়ে থাকৃত যে, তাঁর নাকের ডগায় কি যে ঘট্‌চে, তা দেখ্‌তেও পেতেন না। আমি এই বড় একটা মজা দেখেছি, জগতের সব চেয়ে নামজাদা নাস্তিকগুলোই হচ্চে সব চেয়ে নিরেট বোকা। ভগবানের যে লীলার অন্ত নেই, তিনি যে এই 'না' রূপেই তাদের পোনর আনা মন ভরে থাকেন, এ তারা টেরই পায় না। সপ্রমাণ হোক্‌, অপ্রমাণ হোক্‌, তাঁর ভাব্‌নাতেই সারাদিন কাটিয়ে দিয়ে বলে, সংসারে মানুষগুলো কি বোকা! তারা সকাল-সন্ধ্যায় বসে মাঝে মাঝে ভগবানের চিন্তা করে! আমার মামারও ছিল সেই দশা! তিনি কিছুই দেখতে পেতেন না। কিন্তু, মা ত তা' নয়। তিনি যে আমারই মত মেয়েমানুষ। তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেওয়া ত সহজ ছিল না। আমি নিশ্চয় জানি, মা আমাদের সন্দেহ করেছিলেন।

আর সামাজিক বাধা আমাদের দুজনের মধ্যে যে কত বড় ছিল, এ শুধু যে তিনিই জান্‌তেন, আমি জান্‌তুম না, তা নয়। ভাব্‌লেই আমার বুকের সমস্ত রস শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠ্‌ত, তাই ভাবনার এই বিশ্রী দিক্‌টাকে আমি দুহাতে ঠেলে রাখ্‌তুম। কিন্তু শত্রুর বদলে যে বন্ধুকেই ঠেলে ফেল্‌চি, তাও টের পেতুম। কিন্তু হলে কি হয়? যে মাতাল একবার কড়া-মদ খেতে শিখেচে, জল-দেওয়া মদে আর তার মন ওঠে না। নির্জ্জলা বিষের আগুনে কলজে পুড়িয়ে তোলাতেই যে তখন তার মস্ত সুখ!

আর একটা জিনিস আমি কিছুতে ভুল্‌তে পার্‌তুম না। সেটা মজুমদারদের ঐশ্বর্য্যের চেহারা। ছেলেবেলা মায়ের সঙ্গে কতদিনই ত তাদের বাড়ীতে বেড়াতে গেছি। সেই সব ঘর-দোর, ছবি-দেয়ালগিরি-আলমারি সিন্দুক, আসবাব-পত্রের সঙ্গে কোন্ একটা ভাবী ছোট্ট একতালা শ্বশুরবাড়ীর কদাকার মূর্ত্তি কল্পনা কোরে মনে মনে আমি যেন শিউরে উঠ্‌তুম।

মাসখানেক পরে একদিন সকালবেলা নদী থেকে স্নান ক'রে বাড়ীতে পা দিয়েই দেখি, বারান্দার ওপর একজন প্রৌঢ়া-গোছের বিধবা স্ত্রীলোক মায়ের কাছে ব'সে গল্প করচে। আমাকে দেখে মাকে জিজ্ঞেসা কর্‌লে, "এইটি বুঝি মেয়ে?"

মা ঘাড় নেড়ে বল্‌লেন, "হাঁ মা, এই আমার মেয়ে। বাড়ন্ত গড়ন ন'ইলে—"

স্ত্রীলোকটি হেসে বল্‌লে, "তা হোক্‌। ছেলেটির বয়েসও প্রায় ত্রিশ, দুজনের মানাবে ভাল। আর ঐ শুন্‌তেই দোজ্‌বরে, নইলে যেন কার্ত্তিক।

আমি দ্রুতপদে ঘরে চ'লে গেলুম। বুঝ্‌লুম, ইনি ঘটক ঠাকরুণ, আমার সম্বন্ধ এনেছেন।

মা চেঁচিয়ে বল্‌লেন, "কাপড় ছেড়ে একবার এসে বোস্ মা।"

কাপড় ছাড়া চুলোয় গেল, ভিজে কাপড়েই দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে কান পেতে শুন্‌তে লাগ্‌লুম। বুকের কাঁপুনি যেন আর থামতে চায় না। শুন্‌তে পেলুম, চিতোর গ্রামের কে একজন রাধাবিনোদ মুখুয্যের ছেলে ঘনশ্যাম। পোড়াকপালে না কি অনেক দুঃখ ছিল, তাই আজ যে নাম জপের মন্তর, সে নাম শুনে সে দিন গা জ্বলে যাবে কেন!

শুন্‌লুম, বাপ নেই, কিন্তু মা আছেন। ছোট দুটি ভাই, এক ভায়ের বিয়ে হয়েচে, একটি এখনও পড়ে। সংসার বড়রই ঘাড়ে, তাই, এন্‌ট্রান্স পাশ করেই রোজগারের ধান্দায় পড়া ছাড়্‌তে হয়েচে। ধান, চাল, তিসি, পাট প্রভৃতির দালালি ক'রে, উপায় মন্দ করেন না। তাঁরই উপর সমস্ত নির্ভর। তা'ছাড়া ঘরে নারায়ণ-শিলা আছেন, দুটো গরু আছে, বিধবা বোন্‌ আছে—নেই কি?

নেই শুধু সংসারের বড়-বৌ। সাত বছর আগে বিয়ের একমাসের মধ্যেই তিনি মারা যান, তার পরে এতদিন বাদে এই চেষ্টা। সাত বচ্ছর! ঘটকীকে উদ্দেশ ক'রে মনে মনে বল্‌লুম, 'পোড়ার মুখী, এত দিন কি তুই শুধু আমার মাথা খেতেই চোখ বুজে ঘুমুচ্ছিলি?'

মায়ের ডাকাডাকিতে কাপড় ছেড়ে কাছে এসে বস্‌লুম। সে আমাকে খুঁটিয়ে দেখে বল্‌লে, "মেয়ে পছন্দ হয়েচে, এখন দিনস্থির কর্‌লেই হ'ল। মায়ের চোখ দুটিতে জল টল্‌টল্‌ করতে লাগ্‌ল, বল্‌লেন, "তোমার মুখে ফুলচন্নন পড়ুক, মা, আর কি বল্‌ব!"

মামা শুনে বল্‌লেন, "এন্‌ট্রান্স? তবে, বলে পাঠা, এখন বছর দুই সদুর কাছে ইংরিজি পড়ে যাক্‌, তার পরে বিয়ের কথা কওয়া যাবে।"

মা বল্‌লেন, "তোমার পায়ে পড়ি দাদা, অমত কোরো না, এমন সুবিধে আর পাওয়া যাবে না। দিতে থুতে কিছু হবে না—"

মামা বল্‌লেন,"তা'হলে হাত-পা বেঁধে গঙ্গায় দিগে যা, সেও এক পয়সা চাইবে না।"

মা বললেন, "পোনর পা দিলে যে—"

মামা বল্‌লেন, "তা'ত দেবেই; পোনর বছর বেঁচে রয়েছে যে!"

মা রাগে দুঃখে কাঁদ-কাঁদ হয়ে বল্‌লেন, "তুমি কি ওর তবে বিয়ে দেবে না দাদা? এর পরে যে একেবারেই পাত্র জুটবে না।"

মামা বল্‌লেন, "সেই ভয়ে ত আগে থেকে ওকে জলে ফেলে দিতে পারা যায় না।"

মা বল্‌লেন, "ছেলেটিকে একবার নিজের চোখে দেখে এসো না দাদা, পছন্দ না হয়, না দেবে।"

মামা বল্লেন, "সে ভাল কথা। রবিবারে যাবো ব'লে চিঠি লিখে দিচ্চি।"

ভাঙ্‌চির ভয়ে কথাটা মা গোপন রেখেছিলেন এবং মামাকেও সাবধান ক'রে দিয়েছিলেন। তিনি ত জানতেন না, এমন চোখ-কানও ছিল—যাকে কোন সতর্কতা ফাঁকি দিতে পারে না।

বাগানে একটুকুরো শাকের ক্ষেত করেছিলুম। দিন দুই পরে দুপুরবেলা একটা ভাঙা খুন্‌তি নিয়ে তার ঘাস তুলচি, পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখি নরেন। তার সে রকম মুখের চেহারা অনেক দিন পরে আর একবার দেখেছিলুম, সত্যি, কিন্তু, আগে কখনো দেখিনি। বুকে এমন একটা ব্যথা বাজ্‌ল, যা কখনো কোন দিন পাইনি। সে বল্লে, "আমাকে ছেড়ে কি সত্যিই চল্লে?"

কথাটা বুঝেও যেন বুঝ্‌তে পার্‌লুম না। ব'লে ফেল্লুম, "কোথায়?"

সে বল্লে, "চিতোর।"

স্পষ্ট হ'বামাত্রই লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গেল—কোন উত্তর মুখে এলো না।

সে পুনরায় বল্‌লে, "তাই আমিও বিদায় নিতে এসেছি। বোধ হয়, জন্মের মতই। কিন্তু, তার আগে দুটো কথা বল্‌তে চাই। শুনবে?" বল্‌তে বল্‌তেই তার গলাটা যেন ধ'রে গেল। তবুও আমার মুখে কথা যোগাল না—কিন্তু মুখ তুলে চাইলুম। এ কি? দেখি, তার দু'চোখ বয়ে ঝর্‌-ঝর্‌ ক'রে জল পড়্‌চে।

ওরে পতিতা! ওরে দুর্ব্বল নারী! মানুষের চোখের জল সহ্য কর্‌বার ক্ষমতা ভগবান্‌ তোরে যখন একেবারে দেন নি, তখন তোর আর সাধ্য ছিল কি! দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমারও চোখের জলে বুক ভেসে গেল। নরেন কাছে এসে কোঁচার খুঁট দিয়ে আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হাত ধ'রে বল্‌লে, "চল, ওই গাছটার তলায় গিয়ে বসি গে—এখানে কেউ দেখ্‌তে পাবে।"

মনে বুঝ্‌লুম, এ অন্যায়—একান্ত অন্যায়! কিন্তু তখনও যে তার চোখের পাতা ভিজে, তখনও যে তার কণ্ঠস্বর কান্নায় ভরা!

বাগানের এক প্রান্তে একটা কাঁঠালি-চাঁপার কুঞ্জ ছিল, তার মধ্যে সে আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বসালে।

একটা ভয়ে আমার বুকের মধ্যে দুর্ দুর্ কর্‌ছিল, কিন্তু, সে নিজেই দূরে গিয়ে ব'সে বল্‌লে, "এই একান্ত নির্জ্জন স্থানে তোমাকে ডেকে এনেচি বটে, কিন্তু তোমাকে ছোঁব না। এখনও তুমি আমার হওনি।"

তার শেষ কথায় আবার পোড়া চোখে জল এসে পড়্‌ল। আঁচলে মুছে মাটীর দিকে চেয়ে চুপ ক'রে ব'সে রইলুম।

তার পরে অনেক কথাই হ'ল, কিন্তু থাক্ গে সে সব। আজও ত প্রতিদিনকার অতি তুচ্ছ ঘটনাটি পর্য্যন্ত মনে করতে পারি,—মরণেও যে বিস্মৃতি আসবে, সে আশা করতেও যেন ভরসা হয় না। একটা কারণে আমি আমার এত বড় দুর্গতিতেও কোন দিন বিধাতাকে দোষ দিতে পারিনি। স্পষ্ট মনে পড়ে, আমার চিত্তের মাঝে থেকে নরেনের সংস্রব তিনি কোন দিন প্রসন্ন-চিত্তে গ্রহণ করেন নি। সে যে আমার জীবনে কত বড় মিথ্যে এ তো তাঁর অগোচর ছিল না। তাই তার প্রণয়-নিবেদনের মুহূর্ত্তের উত্তেজনা পরক্ষণের কত বড় অবসাদে যে ডুবে যেত সে আমি ভুলিনি। যেন কার কত চুরি-ডাকাতি, সর্ব্বনাশ ক'রে ঘরে ফিরে এলুম এম্নি মনে হত। কিন্তু এম্নি পোড়া কপাল যে, অন্তর্যামীর এত বড় ইঙ্গিতেও আমার হুঁস হয় নি। হবেই বা কি ক'রে? কোন দিনত শিখিনি যে ভগবান্ মানুষের বুকের মধ্যেও বাস করেন। এ সব তাঁরই নিষেধ।

মামা পাত্র দেখ্‌তে যাত্রা করলেন। যাবার সময় কতই না ঠাট্টা-তামাসা ক'রে গেলেন। মা মুখ চূণ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে বেশ বুঝ্‌লেন, এ যাওয়া পণ্ডশ্রম। পাত্র তাঁর কিছুতে পছন্দ হবে না।

কিন্তু আশ্চর্য্য, ফিরে এসে আর বড় ঠাট্টা, বিদ্রূপ করলেন না। বল্‌লেন, "হাঁ ছেলেটি পাশ-টাশ তেমন কিছু করতে পায়নি বটে, কিন্তু মুখ্যু বলেও মনে হ'ল না। তা ছাড়া বড় নম্র, বড় বিনয়ী। আর একটা কি জানিস্ গিরি, ছেলেটির মুখের ভাবে কি একটু আছে, ইচ্ছে হয়, ব'সে ব'সে আরও দুদণ্ড আলাপ করি।"

মা আহ্লাদে মুখখানি উজ্জ্বল ক'রে বল্‌লেন, "তবে, আর আপত্তি কোরো না দাদা, মত দাও—সত্বর একটা কিনারা হয়ে যাক্।"

মামা বল্‌লেন, "আচ্ছা ভেবে দেখি।"

আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে নিরাশার আশাটুকু বুকে চেপে ধ'রে মনে মনে বল্‌লুম, "যাক্, মামা এখনো মনস্থির করতে পারেন নি। এখনো বলা যায় না। কিন্তু কে জান্‌ত, তাঁর ভাগ্নীর বিয়ের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার পূর্ব্বেই তাঁর নিজের সম্বন্ধে মতিস্থির করবার ডাক এসে পড়্‌বে। যাঁকে সারাজীবন সন্দেহ ক'রে এসেছেন, সে দিন অত্যন্ত অকস্মাৎ তাঁর দূত এসে যখন একেবারে মামার শিয়রে দাঁড়াল, তখন তিনি চম্‌কে গেলেন। তাঁর কথা শুনে আমাদেরও বড় কম চমক্ লাগ্‌ল না। মাকে কাছে ডেকে বললেন, "আমি মত দিয়ে যাচ্ছি বোন্, সত্বর সেইখানেই বিয়ে দিস্। ছেলেটির যথার্থ ভগবানে বিশ্বাস আছে। মেয়েটা সুখে থাকবে।"—অবাক্ কাণ্ড!

হৃদ্‌রোগে মামা মারা গেলেন, আমরা অকূল পাথারে পড়্‌লুম্। দুঃখে দুঃখে কিছুদিন গেল বটে, কিন্তু যে বাড়ীতে অবিবাহিতা মেয়ের বয়স পোনর পার হয়ে

যায়, সেখানে আলস্যভরে শোক করবার সুবিধে থাকে না। মা চোখ মুছে উঠে ব'সে আবার কোমর বেঁধে লাগলেন।

অবশেষে অনেক দিন, অনেক কথা কাটাকাটির পর, বিবাহের লগ্ন যখন সত্যিই আমার বুকে এসে বিঁধ্‌ল, তখন বয়সও ষোল পার হয়ে গেল। তখনও আমি প্রায় এম্‌নিই লম্বা। আমার এই দীর্ঘ দেহটার জন্য জননীর লজ্জা ও কুণ্ঠার অবধি ছিল না। রাগ ক'রে প্রায়ই ভর্ৎসনা করতেন, 'হতভাগা মেয়েটার সবই সৃষ্টিছাড়া!' একেত বিয়ের কনের পক্ষে সতেরো বছর একটা মারাত্মক অপরাধ, তার উপর এই দীর্ঘ গড়নটা যেন তাকেও ডিঙিয়ে গিয়েছিল। অন্ততঃ, সে রাতটার জন্যও যদি আমাকে কোন রকমে মুচ্‌ড়ে-মাচ্‌ড়ে একটু খাটো ক'রে তুলতে পারতেন, মা বোধ করি তাতেও পিছুতেন না। কিন্তু সে তো হবার নয়। আমি আমার স্বামীর বুক ছাড়িয়ে একেবারে দাড়ির কাছে গিয়ে পৌঁছুলুম।

কিন্তু শুভদৃষ্টি হ'ল না, আমি ঠিক রাগে নয়, কেমন যেন একটা বিতৃষ্ণায় চোখ বুজে রইলুম। কিন্তু তাও বলি, এমন কোন অসহ্য মর্ম্মান্তিক দুঃখও তখন আমি মনের মধ্যে পাইনি।

ইতিপূর্ব্বে কত দিন সারা রাত্রি জেগে জেগে ভেবেচি, এমন দুর্ঘটনা যদি সত্যিই কপালে ঘটে, নরেন এসে আমাকে না নিয়ে যায়, তবু আর কারও সঙ্গে আমার বিয়ে কোনমতেই হ'তে পারবে না। সে রাত্রে নিশ্চয় আমার বুক চিরে ভলকে ভলকে রক্ত মুখ দিয়ে গড়িয়ে পড়বে, ধরাধরি ক'রে আমাকে বিবাহ-সভা থেকে বিছানায় তুলে নিয়ে যেতে হবে, এ বিশ্বাস আমার মনে একেবারে বদ্ধমূল হয়ে ছিল। কিন্তু কৈ, কিছুইত হল না! আরও পাঁচজন বাঙ্গালীর মেয়ের যেমন হয়, শুভকর্ম্ম তেম্‌নি করে আমারও সমাধা হয়ে গেল, এবং তেম্‌নি করেই একদিন শ্বশুরবাড়ী যাত্রা করলুম।

শুধু যাবার সময়টিতে পাল্কীর ফাঁক দিয়ে সেই কাঁটালি-চাঁপার কুঞ্জটায় চোখ পড়ায় হঠাৎ চোখে জল এল। সে যে আমাদের কত দিনের কত চোখের জল, কত দিব্যি-দিলাশার নীরব সাক্ষী।

আমার চিতোর গ্রামের সম্বন্ধটা যে দিন পাকা হ'য়ে গেল, ওই গাছটার আড়ালে বসেই অনেক অশ্রু-বিনিময়ের পর স্থির হয়েছিল, সে এসে একদিন আমাকে নিয়ে চলে যাবে। কেন, কোথায় প্রভৃতি বাহুল্য প্রশ্নের তখন আবশ্যকও হয় নি।

আর কিছু না, শুধু যাবার সময় একবার যদি দেখা হ'ত! কেন সে আমাকে আর চাইলে না, কেন আর একটা দিনও দেখা দিলে না—শুধু যদি খবরটা পেতুম!

শ্বশুরবাড়ী গেলুম, বিয়ের বাকি অনুষ্ঠানগুলোও শেষ হয়ে গেল। অর্থাৎ আমি আমার স্বামীর ধর্ম্মপত্নীর পদে এইবার পাকা হয়ে বোসলুম।

দেখলুম, স্বামীর প্রতি বিতৃষ্ণা শুধু একা আমার নয়। বাড়ীশুদ্ধই আমার দলে। শ্বশুর নেই সৎ শাশুড়ী, তাঁর নিজের ছেলে দুটি, একটি বউ এবং বিধবা মেয়েটি নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। এতদিন নিরাপদে সংসার করছিলেন, হঠাৎ একটা সতেরো আঠারো বৎসরের মস্ত বৌ দেখে তাঁর সমস্ত মন সশস্ত্র জেগে উঠল। কিন্তু মুখে বল্‌লেন, "বাঁচলুম বৌমা, তোমার হাতে সংসার ফেলে দিয়ে এখন দুদণ্ড ঠাকুরদের নাম কর্‌তে পাবো। ঘনশ্যাম আমার পেটের ছেলের চেয়েও বেশী; সে বেঁচে থাকলেই তবে সব বজায় থাক্‌বে। শুধু এইটি বুঝে কাজ করো মা, আর কিছু আমি চাইনে।" তাঁর কাজ তিনি করলেন, আমার কাজ আমি কর্‌লুম। বল্‌লুম, "আচ্ছা"। কিন্তু সে ওই কুস্তিগীরের তাল ঠোকার মত। প্যাঁচ মারতে যে দুজনেই জানি, তা ইসারায় জানিয়ে দেওয়া।

কিন্তু কত শীঘ্র মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে চিন্‌তে পারে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। তাঁকে জান্‌তে আমারও যেমন দেরি হোল না, আমাকেও দুদিনের মধ্যে চিনে নিয়ে তিনিও তেমনি আরামের নিশ্বাস ফেল্‌লেন। বেশ বুঝলেন, স্বামীর খাওয়া পরা, ওঠা বসা, খরচপত্র নিয়ে দিবারাত্র চক্র ধরে ফোঁস ফোঁস করে বেড়াবার মত আমার উৎসাহও নেই, প্রবৃত্তিও নেই।

মেয়েমানুষের তূণে যত প্রকার দিব্যাস্ত্র আছে "আড়ি পাতাটা" ব্রহ্মাস্ত্র। সুবিধে পেলে এতে মা মেয়ে, শাশুড়ী-বৌ, জা-ননদ, কেউ কাকে খাতির করে না। আমি ঠিক জানি, আমি যে পালঙ্কে না শুয়ে ঘরের মেঝেতে একটা মাদুর টেনে নিয়ে সারা রাত্রি পড়ে থাক্‌তুম, এ সুসংবাদ তাঁর অগোচর ছিল না। আগে যে ভেবেছিলুম, নরেনের বদলে আর কারো ঘর করতে হ'লে সেই দিনই আমার বুক ফেটে যাবে, দেখলুম সেটা ভুল। ফাটবার চেরবার কোন লক্ষণই টের পেলুম না। কিন্তু তাই ব'লে এক শয্যায় শুতেও আমার কিছুতে প্রবৃত্তি হলো না।

দেখলুম, আমার স্বামীটি অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। আমার আচরণ নিয়ে তিনি কিছুদিন পর্য্যন্ত কোন কথাই কইলেন না। অথচ, মনে মনে রাগ কিংবা অভিমান ক'রে আছেন, তাও না। শুধু একদিন একটু হেসে বল্‌লেন, "ঘরে আর একটা খাট এনে বিছানাটা বড় ক'রে নিলে কি শুতে পার না?"

আমি বল্‌লুম, "দরকার কি, আমার তো এতে কষ্ট হয় না।"

তিনি বললেন, "না হলেও একদিন অসুখ করতে পারে যে।"

আমি বললুম, "তোমার এতই যদি ভয়, আমার আর কোন ঘরে শোবার ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার না ?"

তিনি বললেন, "ছিঃ, তা কি হয় ? তাতে কত রকমের অপ্রিয় আলোচনা উঠবে।"

বললুম, "ওঠে উঠুক, আমি গ্রাহ্য করিনে।"

তিনি একমুহূর্ত্ত চুপ ক'রে আমার মুখের পানে চেয়ে থেকে বললেন, "এত বড় বুকের পাটা যে তোমার চিরকাল থাকবে, এমন কি কথা আছে ?" বোলে একটুখানি হেসে কাজে চলে গেলেন।

আমার মেজ দেওর টাকা চল্লিশের মত কোথায় চাকুরি করতেন, কিন্তু, একটা পয়সা কখনো সংসারে দিতেন না। অথচ, তাঁর আফিসের সময়ের ভাত, অফিস থেকে এলে পা ধোবার গাড়ু-গামছা, জলখাবার, পান-তামাক ইত্যাদি যোগাবার জন্যে বাড়ী শুদ্ধ সবাই যেন ত্রস্ত হয়ে থাকত। দেখতুম, আমার স্বামী আর আমার মেজ দেওর হয় ত কোন দিন এক সঙ্গেই বিকেলবেলায় বাড়ী ফিরে এলেন, সবাই তাঁর জন্যেই ব্যতিব্যস্ত ; এমন কি, চাকরটা পর্য্যন্ত তাঁকে প্রসন্ন করবার জন্যে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্চে। তাঁর একতিল দেরী কিংবা অসুবিধা হলে যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে। অথচ আমার স্বামীর দিকে কেউ চেয়েও দেখত না। তিনি আধঘণ্টা ধ'রে হয় ত এক ঘটি জলের জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন—কারও সে দিকে গ্রাহ্যই নেই। অথচ এদের খাওয়া-পরা সুখ-সুবিধের জন্যেই তিনি দিবা-রাত্রি খেটে মরচেন। ছ্যাকড়া গাড়ীর ঘোড়াও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে, কিন্তু, তাঁর যেন কিছুতেই শ্রান্তি নেই, কোন দুঃখই যেন তাঁকে পীড়া দিতে পারে না। এমন শান্ত, এত ধীর, এত বড় পরিশ্রমী, এর আগে কখনো আমি চোখে দেখি নি। আর চোখে দেখেচি বলেই লিখতে পারচি, নইলে শোনা কথা হলে বিশ্বাস করতেই পারতুম না, সংসারে এমন ভাল মানুষও থাকতে পারে। মুখে হাসিটি লেগেই আছে। সবতাতেই বলতেন, "থাক্ থাক, আমার এতেই হবে।"

স্বামীর প্রতি আমার মায়াই ত ছিল না, বরঞ্চ বিতৃষ্ণার ভাবই ছিল, তবু এমন একটা নিরীহ লোকের উপর বাড়ীশুদ্ধ সকলের এত বড় অন্যায় অবহেলায় আমার গা যেন জলে যেতে লাগলো।

বাড়ীতে গরুর দুধ বড় কম হ'ত না। কিন্তু তাঁর পাতে কোন দিন বা একটু পড়ত, কোন দিন পড়ত না। হঠাৎ এক দিন সইতে না পেরে ব'লে ফেলেছিলুম আর কি ! কিন্তু পরক্ষণেই মনে হ'ল, ছি ছি, কি নির্লজ্জাই আমাকে তা হ'লে এরা মনে করত ! তা ছাড়া এরা সব আপনার লোক হয়েও যদি দয়া-মায়া না করে, আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন ? আমি কোথাকার কে ? পর বই ত না !

দিন পাঁচ ছয় পরে একদিন সকালবেলা রান্নাঘরে ব'সে মেজ ঠাকুরপোর জন্যে চা তৈরী করছি, স্বামীর কণ্ঠস্বর আমার কানে গেল। তাঁর সকালেই কোথায় বার হবার দরকার ছিল, ফিরতে দেরি হবে, মাকে ডেকে বললেন, "কিছু খেয়ে গেলে বড় ভাল হ'ত, মা, খাবার টাবার কিছু আছে?"

মা বললেন, "অবাক্ করলে ঘনশ্যাম! এত সকালে খাবার পাবো কোথায়?"

স্বামী বললেন, "তবে থাক্ ফিরে এসেই খাবো।" বলে চলে গেলেন।

সে দিন আমি কিছুতে আপনাকে আর সামলাতে পারলুম না। আমি জানতুম ওপাড়ার বোসেরা তাদের বেয়াই-বাড়ীর পাওয়া সন্দেশ-রসোগোল্লা পাড়ায় বিলিয়েছিল। কাল রাত্রে আমাদেরও কিছু দিয়েছিল।

শাশুড়ী ঘরে ঢুকতেই ব'লে ফেললুম, "কালকের খাবার কি কিছুই ছিল না মা?"

তিনি একেবারে আকাশ থেকে পড়ে বললেন্ "খাবার আবার কে কিনে আনলে বউ মা?"

বললুম, "সেই যে বোসেরা দিয়ে গিয়েছিল?"

তিনি বললেন, "ও মা, সে আবার কটা যে, আজ সকাল পর্য্যন্ত থাকবে? সে তো কালই শেষ হয়ে গেছে।"

বললুম, "তা ঘরেই কি কিছু খাবার তৈরি ক'রে দেওয়া যেত না মা?"

শাশুড়ী বললেন, "বেশ ত বৌমা, তাই কেন দিলে না? তুমিও ত বসে বসে সমস্ত শুনছিলে বাছা।"

চুপ ক'রে রইলুম। আমার কিই বা বলবার ছিল! স্বামীর প্রতি ভালবাসার টান্ ত আর বাড়ীতে কারো অবিদিত ছিল না।

চুপ করে রইলুম সত্যি কিন্তু ভেতরে ভেতরে মনটা আমার জলতেই লাগল। দুপুরবেলা শাশুড়ী ডেকে বললেন, "খাবে এস বউ মা, ভাত বাড়া হয়েচে।"

বললুম, "আমি এখন খাব না মা, তোমরা খাও গে।"

আমার আজকের মনের ভাব শাশুড়ী লক্ষ্য করছিলেন, বললেন, "খাবে না, কেন শুনি?"

বললুম, "এখন ক্ষিদে নেই।"

আমার মেজ যা আমার চেয়ে বছর চারেকের বড় ছিলেন। রান্নাঘরের ভেতর থেকে ঠোকর দিয়ে ব'লে উঠলেন, "বট্‌ঠাকুরের খাওয়া না হলে বোধ হয় দিদির ক্ষিদে হবে না মা।"

শাশুড়ী বললেন, "তাই না কি বউ মা? বলি, এ নূতন ঢঙ শিখলে কোথায়?"

তিনি কিছু মিথ্যে বলেন নি, আমার পক্ষে এ ঢঙই বটে, তবু খোঁটা সইতে পারলুম না, জবাব দিয়ে বললুম, "নূতন হবে কেন মা, তোমাদের সময়ে কি এ রীতির চলন ছিল না? ঠাকুরদের খাবার আগেই কি খেতে?"

"তবু ভালো, ঘনশ্যামের এতদিনে কপাল ফিরল" ব'লে শাশুড়ী মুখখানা বিকৃত ক'রে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

মেজ জায়ের গলা কানে গেল। তিনি আমাকে শুনিয়েই বললেন, "তখনি ত বলেছিলুম মা, বুড়ো শালিক পোষ মানবে না।"

রাগ ক'রে ঘরে এসে শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু এইবার সমস্ত জিনিসটা মনে মনে আলোচনা ক'রে লজ্জায় যেন মাথা কাটা যেতে লাগল। কেবলই মনে হ'তে লাগল, তাঁর খাওয়া হয় নি বলে খাইনি, তাঁর কথা নিয়ে ঝগড়া করেচি, ফিরে এসে এ সব যদি তাঁর কানে যায়? ছি ছি! কি ভাববেন তিনি! আমার এতদিনের আচরণের সঙ্গে এ ব্যবহার এমনি বিসদৃশ, খাপছাড়া যে, নিজের লজ্জাতেই নিজে মরে যেতে লাগলুম।

কিন্তু বাঁচলুম, ফিরে এলে এ কথা কেউ তাঁকে শোনালে না।

সত্যিই বাঁচলুম, এর এক বিন্দু মিছে নয়। কিন্তু আচ্ছা—একটা কথা যদি বলি, তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে কি? যদি বলি, সে রাত্রে পরিশ্রান্ত স্বামী শয্যার উপর ঘুমিয়ে রইলেন, আর নীচে যতক্ষণ না আমার ঘুম এল, ততক্ষণ ফিরে ফিরে কেবলই সাধ হ'তে লাগল কেউ যদি কথাটা ওঁর কানে তুলে দিত, অভুক্ত স্বামীকে ফেলে আজ আমি কিছুতে খাইনি, এই নিয়ে ঝগড়া করেচি, তবু মুখ বুজে এ অন্যায় সহ্য করিনি—কথাটা তোমাদের বিশ্বাস হবে কি? না হলে তোমাদের দোষ দেব না, হলে বহু ভাগ্য বলে মানব। আজ আমার স্বামীর বড় ত ব্রহ্মাণ্ডে আর কিছুই নেই, তাঁর নাম নিয়ে বলচি, মানুষের মন পদার্থটার যে অন্ত নেই, সেই দিন তার আভাস পেয়েছিলুম। এত বড় পাপিষ্ঠার মনের মধ্যেও এমন দুটো উলটো স্রোত এক সঙ্গে বয়ে যাবার স্থান হতে পারে দেখে তখন অবাক্ হয়ে গিয়েছিলুম।

মনে মনে বলতে লাগলুম এ যে বড় লজ্জার কথা। নইলে এখুনি ঘুম থেকে জাগিয়ে ব'লে দিতুম শুধু সৃষ্টিছাড়া ভালোমানুষ হলেই হয় না, কর্ত্তব্য করতে শেখাও দরকার। যে স্ত্রীর তুমি একবিন্দু খবর নাও না, সে তোমার জন্য কি করেচে, একবার চোখ মেলে দেখ। হা রে পোড়া কপাল! খদ্যোৎ চায় সূর্য্যদেবকে আলো ধরে পথ দেখাতে! তাই বলি, হতভাগীর স্পর্দ্ধার কি আর আদি অন্ত দাওনি ভগবান্!

গরমের জন্য কি না বল্‌তে পারিনে, কদিন ধরে প্রায়ই মাথা ধর্‌ছিল। দিন পাঁচেক পরে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত ছটফট্ ক'রে কখন্ একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। ঘুমের মধ্যেই যেন মনে হচ্ছিল, কে যেন পাশে বসে ধীরে ধীরে পাখার বাতাস করচে। একবার ঠক করে গায়ে পাখাটা ঠেকে যেতে ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে আলো জ্বলছিল, চেয়ে দেখ্‌লুম স্বামী!

রাত জেগে বসে পাখার বাতাস ক'রে আমাকে ঘুম পাড়াচ্চেন!

(আগামীবারে সমাপ্য)

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

আহ্বান

"এসো, এসো, বঁধু এসো, আধ আঁচরে বসো,
নয়ন ভরিয়ে তোমায় দেখি"
এসেছে মধুর মধু আইস রাধার বঁধু
কলিকা খুলেছে লাজ আঁখি।
শীতের প্রকোপ-দন্ত হয়ে গেছে গুঁড়া
জেগেছে বনের ভেরী ঐ কৃষ্ণ চূড়া!

গুচ্ছে গুচ্ছে বনফুল ফুটেছে সৌরভাকুল
এসেছে মধুপকুল লয়ে গুঞ্জরণ
আকুলা তোমার আলি এস এস বনমালী
পরিপূর্ণ ফুলডালি রাধা-বিনোদন!

ডাকিছে নন্দের বাধা আয় আয় আয় মাধা
ডাকিছেন মা যশোদা লইয়া নবনী
পরিপূর্ণ ক্ষীর বাটী অঞ্চল লুটায় মাটী
এস এস এস এস আরে নীলমণি!

বাজাইয়া শিঙা বেণু রাখাল ডাকিছে কাণু ;
গগনে উদেছে ভানু, ডাকে ধেনুপাল।
ছায়াময় সুশীতল ডাকিছে তমালতল
লয়ে বেণু এসো কাণু, এসো নন্দলাল!—

কল্ কল্ চল্ চল্ চুমিয়া সোপান-তল
ডাকে যমুনার জল ডাকিছে মরালী
অমল-কমল-নিভ বাঁকায়ে ধবল গ্রীব,
ডাকিছে মৃণালদল চঞ্চুপুটে তুলি।

সজল নয়ন তুলে ডাকিছে গো-ধন কুলে,
নীরব আহ্বানে ডাকে কদম্বের তল।
শিরে দধিঘট সারি ডাকিছে আভিরী নারী
ডাকিছে খেয়ার তরী, নাচি-টলমল!

ডাকিতেছে বিলম্বিনী দুলে দুলে শিরঃবেণী
ডাকিছে ওঢ়নী চারু চঞ্চল-অঞ্চল!
মৃদু মৃদু শ্রুতিমূলে কুণ্ডল ডাকিছে দুলে,
চুমি চুমি গ্রীবাতল ইঙ্গিত-কুশল।

মৃদু ঘুণু ঘুণু বোল কাঞ্চী ডাকে তুলি রোল
রুণু ঝুণু রুণু ঝুণু ডাকিছে নূপুরা।
লুঠি লুঠি পদতলে না জানি কি কথা বলে
তুলিয়া অতীত স্মৃতি নিলাজ-মুখরা!

এসো এসো বঁধু, বলি ডাকিছে তরঙ্গ তুলি
রাধার সর্ব্বাঙ্গ মন হৃদয় পরাণ—
এস এস এস পিয়া! ডাকিছে তোমার প্রিয়া
সুরভি মাখিয়া ডাকে নিভৃত-শয়ান।

শ্রীগিরীন্দ্র মোহিনী।

বাংলার চিত্রকলা

বাংলায় এক নবযুগ আসিয়াছে। এই নবযুগের কথা অনেকেই অনেকবার অনেক বিষয়ে বলিয়াছেন। এই নবযুগ বাংলার বিভিন্ন চারুকলায়ও বিশেষরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। আমরা এখানে আর তাহার অবতারণা করিব না। এখানে আমরা কেবল বাংলার চিত্রকলার নবযুগের কথাই বলিব। বাংলার চিত্রকলা এক নবজীবন পাইয়াছে। বাংলার চিত্রকলায় আবহমান কাল হইতে যে স্রোত চলিয়া আসিতেছিল, বাংলা বহুল ঘাত-প্রতিঘাতে এবং বিবিধ প্রেরণায় তাহা এখন কতকটা বুঝিতে পারিয়াছে। হিন্দুর চিত্রকলা, বৌদ্ধের চিত্রকলা, উড়িষ্যার মধ্য-যুগের চিত্রকলা, মোগলদিগের চিত্রকলা, রাজপুতদিগের চিত্রকলা এবং বাংলার পুরাতন চিত্রকলা বাংলার আধুনিক চিত্রকরের চক্ষু খুলিয়া দিয়াছে। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার সাহিত্যের আদর্শ উপনিষদ, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, কাত্যায়ন, পাণিনি, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, বৈষ্ণব-কবিতা। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার ভাস্কর্য্যের আদর্শ ধ্যানী বুদ্ধ এবং শিবের তাণ্ডব নৃত্য। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার গৃহনির্ম্মাণ শিল্পের চরম আদর্শ। ভারতের বিভিন্ন হিন্দু এবং বৌদ্ধমন্দির, কণারকের সূর্য্য-মন্দির, আগ্রার তাজমহল। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার গুহাশিল্পের আদর্শ অজন্তা গুহা, ইলোরার গুহা, এলিফান্টা গুহা, এবং উড়িষ্যার উদয়গিরি ও খণ্ডগিরি। তাঁহার মনে পড়িয়াছে—তাঁহার সঙ্গীতের আদর্শ পৌরাণিক হিন্দুসঙ্গীত, মোগলের সঙ্গীত, তানসেনের সঙ্গীত এবং বৈষ্ণবদিগের কীর্ত্তন। যখন বাংলার চিত্রকর ভারতের এই বিভিন্ন চিত্রগুলি দেখিলেন এবং ভারতের সেই সাহিত্যের, ভাস্কর্য্যের এবং সঙ্গীতের কথা মনে করিলেন, তখন তাঁহার চমক ভাঙ্গিল; তিনি তখন দেখিলেন যে, বাংলার চিত্রকলার বিশেষত্ব কোথায়? তিনি তখন সম্পষ্ট বুঝিলেন যে, বাংলার চিত্র-কলার আদর্শ বাংলার জাতীয় জীবনের মত, ইউরোপীয় চিত্রকলার আদর্শ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। তিনি আরও বুঝিলেন যে, ইউরোপীয় চিত্রকলার অনুকরণে বা আনুগত্যে বাংলার চিত্রকলার অভিব্যক্তি হইবে না। তিনি দেখিলেন যে, বাংলার চিত্রকলা দৈবী প্রকৃতি—সত্ত্বপ্রধান। কেবলমাত্র করুণ এবং প্রেমরসের পূর্ণবিকাশ। তিনি দেখিলেন, বাংলার চিত্রকলায় অঙ্কনের অত বৈশিষ্ট্য নাই—রংএর অত বাহার নাই—বস্তুত্বের অত স্ফূর্ত্তি নাই। আছে আধ্যাত্মিকতা—অন্তস্ফূর্ত্তি—আত্মবিকাশ

বা এক কথায় পূর্ণ-রস- ফুর্ত্তি। বস্তুর অন্তরের রহস্যটি কেবল ফুটাইয়া তোলে—বহিরা- ড়ম্বর মোটেই নাই। বাংলার জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার চিত্রকরেরও ঘুম ভাঙ্গিল।

কলিকাতায় একটি কলা-বিদ্যালয় আছে। কিছুকাল পূর্ব্বে হেভেল সাহেব এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি ভারতের পুরাতন চারুকলা দেখিয়া অতিশয় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাংলায় যখন নবযুগ আসিল, তখন তিনিও এই নবভাবে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। এই বিদ্যালয়ে ইতিপূর্ব্বে চিত্রকলা ইউরোপীয় প্রণালীতে শেখান হইত,—তিনি এক নূতন ভারতীয় প্রথা অবলম্বন করিলেন। ইউরোপীয় ভাস্কর্য্যের এবং চিত্রের আদর্শ ফেলিয়া দিয়া ভারতীয় ভাস্কর্য্য এবং চিত্রের আদর্শ স্থাপন করিলেন। বাংলার চিত্রকলার নববন্যা খুলিয়া গেল। শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রমুখ এই মহা-বন্যায় ভাসিয়া গেলেন। অজন্তা গুহার চিত্রলিপি তাঁহাদের আদর্শ হইল। মোগল এবং রাজপুতদিগের চিত্রের আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইলেন। ভারতীয় পুরাতন চিত্রের এবং ভাস্কর্য্যের আদর্শ তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা বাংলার চিত্রকলার জীবন্ত প্রাণের কতকটা সাক্ষাৎ পাইলেন।

বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা ইউরোপীয় কলাবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়াছিলেন, এই শিক্ষা তাঁহারা বর্জ্জন করিতে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছেন; কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তাই ইউরোপীয় কলাবিদ্যার আভাষ তাঁহাদের চিত্রকলায় কখন কখন লক্ষিত হয়। কোন কোন ইউরোপীয় কলাবিদ্ ইংলণ্ডের পূর্ব্ব র‍্যাফেল-পন্থী চিত্রকরদের আভাষ বাংলার আধুনিক চিত্রকলায় পাইয়াছেন। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। বাংলার চিত্রকরেরা ভারতের পুরাতন আদর্শের অনুকরণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অজন্তা গুহার আদর্শই প্রধান এবং সেই আদর্শ ভারতীয় চিত্রকলার উচ্চতম আদর্শ। সেই আদর্শ অনুকরণ করিতে যাইয়া আধুনিক চিত্রকলায় অনেক দোষ ঘটিয়াছে। চিত্রকলার আত্মস্ফূর্ত্তি হয় নাই। তাই তাঁহারা সেই দোষ খানিকটা ঢাকিবার জন্য সাজান-গুজান চিত্রলিপির আশ্রয় লইয়াছেন। ইউরোপীয় চিত্রকলায় পূর্ব্ব-র‍্যাফেল-পন্থীদেরও সেই একই দোষ ঘটিয়াছে। এই দুই-ই অনুকরণজনিত দোষে দূষিত। তাই খানিকটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়। কেহ কেহ আবার বলেন যে, ইউরোপীয় * ছায়াপন্থী চিত্রকর-দের অনুকরণ এই আধুনিক চিত্রকরেরা খানিকটা করিয়াছেন। এই অনুযোগের সত্যতা আমরা স্বীকার করি না; কারণ, এই দুইয়েরই আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাংলার চিত্রকরেরা অন্তস্ফূর্ত্তি লইয়া ব্যস্ত—আর ছায়াপন্থীরা ছায়ার আভাষ দিয়াই ক্ষান্ত। বরং জোরের সহিত বলা যাইতে পারে যে, এই ভারতীয় চিত্রকলার আধ্যাত্মিকতা

* Impressionist School.

ইউরোপীয় ছায়াপন্থী চিত্রকরেরা ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সময়ে ইহা আশা করা যায় যে, এই আধ্যাত্মিকতা স্ফূর্তির আদর্শ ইউরোপীয় চিত্রকলা ক্রমে গ্রহণ করিবে। এই বাংলার চিত্রকলায় পারস্যের চিত্রকলার আভাষ লক্ষিত হয়। ইহা স্বাভাবিক। ভারতের সহিত পারস্যের সম্বন্ধ অনেক দিন যাবৎ চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, পারস্যকলার আদর্শ মোগল-সময় হইতেই ভারতীয় কলার আদর্শের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সুতরাং পারস্য চিত্রকলার যে আভাষ বাংলার আধুনিক চিত্রকলায় থাকিবে, তাহার আর বিচিত্র কি? ইহা বরং আমাদের চিত্র-কলার গৌরবই বৃদ্ধি করিয়াছে। তবে পারস্যের আদর্শে আমাদের চিত্রকলার পরিমাণ বড় ছোট হইয়া গিয়াছে। মোগল চিত্রকরেরা এবং তাঁহাদের অনুকরণে রাজপুতেরা ছোট ছোট চিত্র আঁকিতেন; কিন্তু পুরাতন বা মধ্যযুগের হিন্দু বা বৌদ্ধ চিত্র স্বল্প আয়তনের নহে। আর কেহ কেহ বলেন যে, আমাদের এই বাংলার চিত্র-কলা খানিকটা জাপানের আদর্শেও গঠিত হইয়াছে, ইহা অনেকটা সত্য। তবে এশিয়ার সকল দেশেরই কলার আদর্শের অনেকটা সামঞ্জস্য আছে। তার পর বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রভাবে জাপানের আদর্শের সহিত ভারতীয় আদর্শের অনেক মিল আছে। ভারতীয় বৌদ্ধকলার অনেক আভাষ জাপানী কলায় দেখা যায়।

ভারতবর্ষের পুরাতন চারুকলার আদর্শ হইতেই এই নূতন চিত্রকলার আদর্শ গঠিত হইতেছে। ইউরোপীয় আদর্শ যথাসম্ভব বর্জ্জিত হইয়াছে, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, আদর্শ অনুকরণে—সে যে আদর্শই হউক না কেন, বিদেশীয়ই হউক বা স্বদেশীয়ই হউক, বিশেষ দোষ আছে। অনুকরণে কলার আত্মস্ফূর্ত্তি বা রসসৃষ্টি হয় না। অনুকরণে কলার উন্নতি অসম্ভব। এই কথা স্বতঃসিদ্ধ! ইহা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অনেক বিষয়েই প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। এই কথা রাষ্ট্রনীতিতে যতটা প্রযোজ্য—কলা সম্বন্ধেও ততটাই খাটে। এই বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যেও ইহা বিশেষ লক্ষিত হয়। সম্প্রতি বৈষ্ণব বা পুরাতন বাংলা কবিতা অনুকরণ করা একটা আদর্শের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। বৈষ্ণব কবিতার প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্ব সবাই একবাক্যে মানিবে। কিন্তু তাহার আধুনিক অনুকরণে যে কবিতা রচিত হইতেছে, তাহা কি গীতিকবিতার অপভ্রংশ নহে? রবীন্দ্রনাথ যে বড় কবি, ইহা বলা বাহুল্য। কিন্তু তাঁহারও বিদেশীয় আদর্শের ছাঁচে যে কবিতা আছে, তাহাতেও কি বিশেষ দোষ লক্ষিত হয় না?

সেই রকম চিত্রকলা সম্বন্ধেও খাটে। আমরা ফরাসী চিত্রকলার ইতিহাসেও ইহা দেখিতে পাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফরাসী চিত্রকর ডেভিড্ এবং

ইংগ্রেস * গ্রীক এবং রোমান আদর্শে উদ্ভাসিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের চিত্রকলাও সেই আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সত্বরই তাঁহাদের অনুকরণের দোষ লক্ষিত হইল। ফরাসী চিত্রকরেরা তাঁহাদের নিজের আদর্শ খুঁজিতে এবং চিত্রকলায় ফুটাইয়া তুলিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার প্রথম চেষ্টা † ছায়াপন্থীরা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেবল বাহিরের জিনিস লইয়াই তোলপাড় করিলেন। এই চেষ্টায়ও আদর্শ ফুটিল না। তার পর ‡ রসপন্থী চিত্রকরেরা এই আদর্শ আবার তাঁহাদের চিত্রকলায় ফুটাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহাদের আদর্শ কবিজনোচিত, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়া, ফরাসীর আদত আদর্শ সম্পূর্ণভাবে ফুটিল না। তখন ফরাসী চিত্রকর কুর্বে তাঁহার এবং তাঁহার কাল কুকুরের সেই বিখ্যাত চিত্র আঁকিলেন। ফরাসীর আদর্শ ফুটিয়া উঠিল —ফরাসীর আত্মবিকাশ হইল—ফরাসীর চিত্রকলার আত্মস্ফূর্ত্তিতে নবযুগ আসিল। ইহাতে রোম বা গ্রীকের আদর্শের আভাষ নাই। ছায়াপন্থীদের বাহ্যিক আবরণের অন্তঃশূন্যতা নাই, স্বভাবপন্থীদের কল্পনাধিক্য নাই—আছে কেবল ফরাসীর প্রাণ এবং তাহার সরল বিকাশ। ¶

সেই রকম ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। রবিবর্ম্মার চিত্রগুলি সকলই ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত। এই চিত্রগুলি কি চিত্রকলার অপভ্রংশ নহে? রবিবর্ম্মার বিখ্যাত শকুন্তলা-চিত্র দেখিলেও ইহা সম্পষ্ট প্রতীত হয় এবং ভবানীচরণ লাহার গণেশজননীও তাহাই প্রমাণ করে।

কোন আদর্শের অনুকরণেই চিত্রকলার আদর্শের পূর্ণস্ফূর্ত্তি কখন হয় না বা হইতে পারে না। এমন কি, যে আদর্শ আমাদের দেশের, কিন্তু যাহা আমাদের অস্থিমজ্জাগত হয় নাই, তাহার অনুকরণেও প্রকৃত কলাসৃষ্টি হয় না। আবার বিদেশীয় আদর্শের অনুকরণে এই দোষ ত শতগুণে বাড়িয়া থাকে। যাহা চিত্রকরের অন্তরের কথা, তাহা চিত্রকর চিত্রে ফুটাইয়া তোলে। সে তাহা অন্যের ভাষায় কি করিয়া ফুটাইবে? সে অন্যের আদর্শই বা কি করিয়া ফুটাইবে? সে ত কেবল নিজের অন্তরের কথা—নিজের ভাষায় সরলভাবেই প্রকাশ করিতে পারে। ভাব থাকিলে ভাবপ্রকাশের উপায়ের অভাব হয় না। ভাবকে স্বাধীন ভাবে খেলিতে দিলে, সে নিজ ভাবে নিজকে সহজেই প্রকাশ করিবে। চিত্রকর

---

* Classical School.

† Impressionist School.

‡ Romantic School.

¶ Realistic School.

আপন ভাবে আত্মস্ফূর্ত্তি করিতে সহজেই পারে। এই কথাগুলি সকল চারুকলা-সম্বন্ধেই খাটে। কাব্যেও তাই, সঙ্গীতেও তাই, চিত্রকলায়ও তাই এবং ভাস্কর্য্যেও তাই। তাই চাই, চিত্রকরের চিত্রপটে সহজ আত্মবিকাশ—আত্মস্ফূর্ত্তি বা রস-সৃষ্টি—তবেই না আধুনিক চিত্রকলা চরম সীমায় উঠিবে।

বাংলার চিত্রকলার সাধকেরা তাঁহাদের সমস্ত প্রাণের সাধনায় চিত্রকলার আদর্শ উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন। উঁহারা সকলেই সেই একই মন্ত্রে, একই সাধনায়, একই ভাবে দীক্ষিত। কি করিয়া বাংলার আদর্শের আত্মস্ফূর্ত্তি দেখাই-বেন, তাহাই তাঁহাদের সমবেত এবং ঐকান্তিক চেষ্টা। তাঁহারা নানা বিঘ্ন, নানা বাধা অতিক্রম করিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সফল করিতে উদ্যত হইয়াছেন। ইহাতে তাঁহাদের অনেক সৎসাহস, অনেক স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রীতি এবং সাধনার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা বাংলার আবহমানকাল হইতে চলিত আদর্শ উদ্ধার করিতে যাইয়া কেবলমাত্র ভারতের পৌরাণিক আদর্শেরই অনুকরণ করিয়া বাংলার সেই মহা আদর্শেরই কেবল অংশমাত্র উদ্ধার করিয়াছেন। আবার দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহারা সেই পুরাতন আদর্শও সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। তাঁহারা সেই পৌরাণিক যুগের অন্তরাত্মার পূর্ণসাক্ষাৎ পান নাই। পৌরাণিক আদর্শ, পৌরাণিক ভাব, পৌরাণিক জীবন তাঁহারা নিজস্ব করিয়া লইতে পারেন নাই। পৌরাণিকত্বে তাঁহাদের যথেষ্ট ভক্তি এবং প্রীতি আছে, কিন্তু তাহা তাঁহাদের একেবারে নিজের হয় নাই। পৌরাণিকত্ব তাঁহাদের অস্থিমজ্জাগত হয় নাই। চিত্রগুলির বিষয় এবং ভাব অনেক সময়েই পুরাণ হইতে তাঁহারা লইয়াছেন। পৌরাণিক ভাব ও পৌরাণিক কথাই সাধারণতঃ এই চিত্রকরেরা প্রচার করিয়াছেন; এবং তাহা তাঁহারা পুরাতন চিত্রকলার আদর্শ অবলম্বনে চিত্রিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের চিত্রকলায় বাংলার আদর্শের আত্মস্ফূর্ত্তি হয় নাই এবং হইবারও কথা নহে। আমরা ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। ৺সুরেন্দ্র গাঙ্গুলীর "কার্ত্তিক" একটি অপরূপ সৃষ্টি। দেহের কান্তিতে, শৌর্য্যে, বীর্য্যে এবং সৌন্দর্য্যে এই চিত্রটি অতুলনীয়। কিন্তু আত্মস্ফূর্ত্তির অভাব। অন্তরাত্মার পূর্ণবিকাশ নাই। কার্ত্তিক তেমন জাগ্রত ও সজীব নহেন। পৌরাণিক আদর্শ হইতে এই ভাবটি উদ্ধার করা হইয়াছে এবং পুরাতন ভারতীয় চিত্রকলার অনুকরণে ইহা চিত্রিত হইয়াছে। কিন্তু চিত্রকর কি পৌরাণিক আদর্শ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন? আবার অনুকরণেই কি পূর্ণ আত্মস্ফূর্ত্তি সম্ভবে? তাই "কার্ত্তিকও" বাংলার চিত্রকলার আদর্শে পৌছিতে পারে নাই। গ্রীক ভাস্কর্য্যের বিখ্যাত "এপল বেলভেডিয়ার"এর সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে।

দুই-ই পূর্ব্বোক্ত দোষে সমভাবে দূষিত। দুই-ই খানিকটা অন্তঃসারশূন্য। যেন পূর্ণ-রসস্ফূর্ত্তি নাই। অবনীন্দ্র ঠাকুরের “বুদ্ধ এবং সুজাতাও” এই দোষে দূষিত। বুদ্ধের বৌদ্ধত্বের স্ফূর্ত্তি হয় নাই। শ্রীনন্দলাল বোসের “সাবিত্রী ও যম” ইহারই আর একটি উদাহরণ।

অনেক সময়ে বাংলার চিত্রকরেরা এই দোষ ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। পৌরাণিক কথা হইতে বিষয় সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু বিষয়ের অন্তর্ভাবে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং সেই ভাবকে চিত্রে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। পুরাতন চিত্রকলার আদর্শ অনুকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই আদর্শকে নিজস্ব করিয়া লইয়াছেন। যেখানেই এই অন্তর্ভাবের প্রস্ফুটন এবং আদর্শের নিজস্বকরণ হইয়াছে, সেখানেই এই চিত্রগুলি চিত্রকলার উচ্চতম আদর্শে পৌছিয়াছে। আমরা ইহা এখন উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “তিষ্যরক্ষিতা” আর একটি চিত্রকলার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। হিংসা, দ্বেষে প্রাণ জর্জ্জরিত, অহঙ্কারে স্ফীত ও সৌন্দর্য্যবোধে গর্ব্বিত। ছবিটি এই ভাবগুলির জলন্ত ও সজীব প্রতিমা। রুদ্র ও শান্ত ভাবের আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য। চিত্রকলার অন্তরাত্মার পূর্ণ-বিকাশ ও আত্মস্ফূর্ত্তি ইহাতে লক্ষিত হয়। শ্রীনন্দলাল বোসের “কৈকেয়ী”ও চিত্রকলার উচ্চতম আদর্শের আর একটি উদাহরণ। কৈকেয়ীর অন্তরাত্মার পূর্ণমাত্রায় প্রস্ফুটন হইয়াছে। ৺সুরেন্দ্র গাঙ্গুলীর “লক্ষ্মণ সেন” আর একটি উদাহরণ। ইতিহাসে ইহাঁর সত্যতা নাই। কিন্তু কাল্পনিক লক্ষ্মণসেনের অন্তরাত্মার এবং বাঙ্গালীর কলঙ্কের ইহা আশ্চর্য্য অন্তস্ফূর্ত্তি। শ্রীঅবনীন্দ্র ঠাকুরের “দেয়ালী,” “আঁধার রাত,” এবং শ্রীনন্দলাল বোসের “কুমারী-পূজা” এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

বাংলার আধুনিক চিত্রকরদের অঙ্কনবিদ্যাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ইউরোপীয় কলাবিদেরা মনে করেন যে, বাংলার চিত্রকরেরা অঙ্কনে বা চিত্রের আকার-প্রকারগঠনে বিশেষ পটু নহেন। কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। পুরাতন ভারতের চিত্রগুলিতে রেখা অঙ্কনের এবং আকারগঠনের বিশেষ পটুতা লক্ষিত হয়, এবং এই কথা আধুনিক চিত্রগুলিতেও সম্পূর্ণভাবে খাটে। তাঁহাদের অঙ্কন এবং আকার-গঠনের ক্ষমতা ইউরোপীয় চিত্রকর হইতে কিছুতেই ন্যূন নহে; বরং অধিক। এই প্রাধান্যের বিশেষ কারণ আছে। ইউরোপীয় চিত্রকরেরা পেন্সিল প্রয়োগ করিয়া হাতের রেখা অঙ্কনের নৈপুণ্য লাভ করেন। ভারতীয় চিত্রকরেরা তুলি প্রয়োগ করেন। পেন্সিলের গতির তত স্বাধীনতা নাই, কিন্তু তুলির গতির স্বাধীনতা পেন্সিলের গতি অপেক্ষা অনেক অধিক, তাই ভারতীয় চিত্রকরের অঙ্কন-নৈপুণ্য এত সহজ। খুঁটিনাটি জিনিসেও তাঁহাদের যথেষ্ট দৃষ্টি

আছে। এখন ইহা আমরা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্র ঠাকুরের "পাগল বাজনদার" এই অঙ্কন-নৈপুণ্যের একটি অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত; ইহাতে যেমন রেখার আশ্চর্য্য নৈপুণ্য, তেমন ভাবপ্রকাশেরও অদ্ভুত ক্ষমতা লক্ষিত হয়। বাজনদার আপনার বাজনা শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, এবং সেই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছেন। শ্রীনন্দলাল বসুর "জগাই মাধাই" আর একটি দৃষ্টান্ত। জগাই মাধাইর প্রাণের আনন্দ রেখায় রেখায়, দেহের কান্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জগাই মাধাইর পৌরাণিক সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই বিদ্রূপ করিয়া বলেন যে, সরু সরু এবং কাঠি কাঠি হাত-পা, অদ্ভুত আকৃতি, টানা চোখ না হইলে নাকি চিত্রকলার পরিসমাপ্তি হয় না। ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা আরও বলেন যে, তাঁহারা আমাদের এই আধুনিক চিত্রকলার সৌন্দর্য্য দেখিতেও পান না, বুঝিতেও পারেন না। ইঁহাদের মত আমরা খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিব। প্রথমতঃ আমাদের বুঝিতে হইবে যে, বাংলার ও ইউরোপের চিত্রকলার আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইউরোপীয় আদর্শের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রগুলিতেও জড়ভাব লক্ষিত হয়। আত্মা যেন শরীর ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। অন্তস্ফূর্ত্তি হইয়াছে বটে, কিন্তু সেই অন্তরের শরীরের মধ্য দিয়া স্থূলভাবে স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। জড়, শরীর, মাংস সর্ব্বদাই চোখে ঠেকে। আমরা এখন ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইব। র‍্যাফেলের সিসটিন্‌কা মেডোনা চিত্র জগতের একটি অপরূপ সৃষ্টি—মাতৃত্বের চরম বিকাশ। কিন্তু তাহাতেও কি খানিকটা জড়ভাবের, শরীরের, দেহের, রক্তমাংসের বিকাশ দৃষ্ট হয় না? আবার গ্রীকদের ভাস্কর্য্যেও আমরা সেই জড়ভাব দেখিতে পাই। কিন্তু ভারতের চারুকলার আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভারত সভ্যতা নিবন্ধনই হউক কিংবা ভ্রমবশতই হউক, চিরকালই আত্মাকে দেহের অনেক উঁচুতে রাখিয়াছে। হয় ত জড়-জগৎকে খানিকটা তাচ্ছিল্য করিয়াছে। হয় ত শরীরকে, দেহকে, রক্তমাংসকে সত্য-স্বরূপ করিয়া সম্যক্‌ভাবে দেখে নাই। তাই ভারতের চারুকলায় আমরা কেবল শুদ্ধ আত্মারই পূর্ণবিকাশ-প্রয়াস দেখিতে পাই; কিন্তু শরীর, দেহ, বা রক্তমাংসের আতিশয্য দেখিতে পাই না। এইখানেই ইউরোপীয় এবং ভারতীয় চিত্রকলার আদর্শের বৈষম্য। আর বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা সনাতন এই পূর্ব্বোক্ত হিন্দু-আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এই ভাবকেই প্রচার করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। কাজেই ইউরোপীয় চারুকলার মাপকাঠি দিয়া বাংলার আধুনিক চিত্রকলাকে বিচার করিলে চলিবে না, ইউরোপীয় চিত্রকলায় অভ্যস্ত চক্ষে এই বাংলার চিত্রগুলিকে দেখিলে চলিবে না, ফটোগ্রাফের দৃষ্টিতে দেখিলে চলিবে না।

ইউরোপীয় দেহ-শাস্ত্র এই চিত্রগুলিতে খাটাইলে চলিবে না। ইউরোপীয় চিত্রের দেহ-কান্তির সৌন্দর্য্য এখানে মিলিবে না। এখানে আছে অন্তস্ফূর্ত্তি, এখানে দেখিবে আত্মার বিকাশ,—এখানে পাইবে ভাবের এবং রসের প্রস্রবণ। কিন্তু এই ভাব বাংলার চিত্রকরেরা বিশুদ্ধভাবে ফুটাইতে যাইয়া খানিকটা ভুল করিয়াছেন। শরীর, দেহ, রক্ত, মাংসও ত তাচ্ছিল্যের জিনিস নহে। তাহার স্থিতি আছে, সত্যতা আছে। দেখিব না বলিলে চলিবে কেন? আঁকিব না বলিলে কি স্থিতির লোপ হয়? শরীর ছাড়া কি আত্মা আছে? আত্মারও ত শরীরে বিকাশ—আবার শরীরেই আত্মার লয়। কাজেই দুই সত্য। তাই হয় ত আধুনিক বাংলার চিত্রকরেরা একটা ভাব ফুটাইতে যাইয়া আর একটা ভাবের অপলাপ করিয়াছেন। হয় ত সময়ে এই দোষ বাংলার চিত্রকরেরা দেখিতে পাইবেন—বুঝিতে পারিবেন—এবং আবার বাংলার সমগ্র আদর্শ বাংলার চিত্র কলায় পূর্ণবিকাশ করিবেন, তাহারও সূচনা আমরা এইখানেই দেখিতে পাইতেছি।

আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, আধুনিক চিত্রকরেরা ইউরোপের আদর্শ যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহারা এমন কি এশিয়ার আদর্শ, বিশেষতঃ জাপানের আদর্শও অনেকটা ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের পৌরাণিক আদর্শ ও চারুকলা তাঁহাদের চিত্রকলার আদর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা বিশেষতঃ অজন্তা গুহার চিত্র, রাজপুতদিগের চিত্র, তাঁহাদের চিত্রের আদর্শ করিয়াছেন। তাঁহারা ভারতের সেই পৌরাণিক আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়াছেন এবং চিত্রগুলিতে কেবল ভারতের সেই আদর্শই ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতের আদর্শ অনুকরণেই সেই চিত্রগুলি গঠন করিয়াছেন। সেই আদর্শেই চিত্রগুলি রচনা করিয়াছেন, সেই আদর্শেই চিত্রগুলি অঙ্কন এবং চিত্র করিয়াছেন। তাই এক কথায় বলা যাইতে পারে যে, বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা কেবলমাত্র ভারতের পৌরাণিক আদর্শই তাঁহাদের চিত্রগুলিতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের আদর্শ এবং বাংলার আদর্শ কি এক? বাংলার আদর্শের কি কোন বিশেষত্ব বা স্বাতন্ত্র্য নাই? বাংলার জীবনের কি কোন বিশেষ ধারা নাই? বাংলার ইতিহাসের কি কোন বিশেষ সূত্র-নাই? বাংলার চারুকলার কি কোন বিশেষ রসস্ফূর্ত্তি নাই? এই বাংলার বিশেষত্বের এবং স্বাতন্ত্র্যের কথা অনেকে অনেক জায়গায় অনেকবার বলিয়াছেন। তাহার সূচনা আমরা এখানে আর করিব না; তবে এইমাত্র বলিব যে, বাংলার আদর্শের একটা বিশেষত্ব আছে, বাংলার জীবনের একটা ধারা আছে, বাংলার ইতিহাসে একটা একত্ব-ভাব আছে, বাংলার চারু-কলার একটা অন্তস্ফূর্ত্তি আছে, এবং বাংলার প্রাণের একটা বিশেষ বিকাশ আছে। আমরা বাংলার সেই বিশেষত্ব এবং স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ বাংলার চারু-কলায় কতকটা দেখিতে চেষ্টা করিব।

ভারতীয় চারুকলায় সাধারণতঃ যোগ এবং জ্ঞানভাবের বিকাশ বিশেষ লক্ষিত হয়। ইউরোপীয় চারুকলায় এই ভাবগুলির বরং অভাবই লক্ষিত হয়। ভারতের অন্য প্রদেশের ন্যায় বাংলাতেও এই ভাবগুলির যথেষ্ট বিকাশ আছে। কিন্তু এই যোগ এবং জ্ঞানভাবের প্রথম বাংলাতেই প্রেমভাবের সহিত সমভাবে অভিব্যক্তি হয়। বুদ্ধদেব এবং শঙ্কর এই যোগ ও জ্ঞানভাব ভারতে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু বাংলার মাটীতে, বাংলার আকাশ এবং বাতাসের প্রভাবে বাঙ্গালীর ভাব-লালিত্য এবং মহাপ্রভু চৈতন্যের লীলামাধুর্য্যে এই ভাব বাংলায় প্রেমভাবে পরিণত হইয়াছে। বাংলার ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষে, বাংলার জীবনে, বাংলার ইতিহাসে এবং বাংলার চারুকলায় এই প্রেমভাবের বিশেষ বিকাশ দেখা যায়।

কালী, দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব ভাব,—রুদ্র এবং শান্ত, কোমল এবং কঠোর ভাব, সমভাবে যুগপৎ বাংলার প্রাণে বিরাজ করে। কিন্তু কোমল, শান্ত বা প্রেমভাবের অভিব্যক্তিই বাংলায় বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। রাধাকৃষ্ণের মোহন বাঁশরীর রবই, কালীদুর্গার অসির ঝনঝনানি অপেক্ষা বাংলার প্রাণে প্রাণে বেশী বাজে। এমন কি, বাংলার বৈষ্ণবভাবও অন্য-অন্য প্রদেশের বৈষ্ণবভাবের তুলনায় অনেক কোমল এবং মধুর। দাক্ষিণাত্যের রামানুজের বৈষ্ণবভাবের সহিত তুলনা করিলেই ইহা সম্পষ্ট প্রতীত হয়। আমরা বাংলার চারুকলায় এই প্রেমভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। বাংলার সেই প্রেমভাব বৈষ্ণব কবিতায় বিশেষ সরলভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিকাশ পাইয়াছে। চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস এবং গোবিন্দদাস এই প্রেমভাব তাঁহাদের কবিতায় প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর জীবন সেই প্রেমভাবেরই একটি বিচিত্র চিত্র। আমরা বাংলার বৈষ্ণব চারুকলায় সেই প্রেমভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। এই প্রেমরসের বিকাশ আর একবারমাত্র ইটালীতে হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কেবল চিত্রকলায়ই হইয়াছিল। ইটালীর সাধকেরা চিত্রকলায় অতি সুন্দরভাবে এই প্রেমরস ফুটাইয়াছিলেন। তাই চিত্রকলা-জগতে ইটালীর চিত্রকলা এত উচ্চস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বাংলা-দেশেও এই প্রেমরস ফুটিয়াছিল; কিন্তু তাহা কবিতাতে। তাই ইটালীর চিত্রকলা এবং বৈষ্ণব কবিতায় এতটা সামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, এবং তাই বৈষ্ণব কবিতা এবং ইটালীর চিত্রকলা কলা-জগতে এত উচ্চ আসন অধিকার করিয়াছে।

বাংলার চারুকলার সেই প্রেমভাব বাংলার গার্হস্থ্যজীবনে এখনও লক্ষিত হয়। বাংলা চারুকলাকে গৃহস্থালীর সামগ্রী করিয়া রাখিয়াছে। চারুকলাকে গার্হস্থ্যজীবনে পরিণত করিয়াছে। সমস্ত জীবনকে জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যেন এক কলাসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে। জন্মের আচার-পদ্ধতি, বাল্যের বিদ্যাভাস, নামকরণ, চূড়া-করণ, উপনয়নপদ্ধতি, যৌবনের শিক্ষা-দীক্ষার পদ্ধতি, আচার-ব্যবহার, বিবাহ, প্রৌঢ়ের কর্ম্ম-

পদ্ধতি এবং বুদ্ধের ধর্ম্মাচারপদ্ধতি আমাদের সমগ্র জীবনকে কলাময় করিয়া রাখিয়াছে। বারমাসের বারপূজা, তেরপার্ব্বণে সেই চারুকলারই পূর্ণ বিকাশ দেখিতে পাই। দেহের প্রসাধনে—তিলক, গোধূলি, চন্দনচর্চ্চায়, সিন্দূর ও আলতার প্রয়োগে সেই চারুকলারই বিকাশ দেখি। শাড়ীর বিচিত্র চিত্রে, গহনার কারুকার্য্যে, নামাবলীর সুন্দর বিচিত্র অঙ্কনেও সেই চারুকলারই প্রভাব দেখি। পিঠার ও আমসত্বের সাজে এবং নানাবিধ খাদ্যসামগ্রীর সুন্দর গঠনে আমরা সেই চারুকলারই মাধুর্য্য দেখিতে পাই। চিত্রকরের নানাবিধ সুন্দর পট অঙ্কনে, আঙ্গিনার আলপনায়, পিঁড়ি ও কুলা-চিত্রিতে, মধুথামের চিত্রিতে এবং গৃহের বিচিত্র চিত্রগুলিতে আমরা বাংলার সেই চিত্রকলার আভাষ পাই। বাংলার এই চারুকলার স্ফূর্ত্তি একই ধারাবাহিক সূত্রে চিরকাল চলিয়া আসিতেছে। বাংলার বিভিন্ন যুগ ভিন্ন করিয়া দেখিলে বাংলার চারুকলার সেই একভাবেরই বিকাশ দেখিতে পাই। বাংলার চারুকলার এই ধারাবাহিক একভাব বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা সম্যক্ উপলব্ধি করেন নাই। বাংলার চিত্রলিপিকে তাঁহারা তাঁহাদের আদর্শের অন্তর্ভূত করেন নাই। বাংলার চারুকলার আদর্শ তাঁহাদের সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাসিত করে নাই। বাংলার ইতিহাস, বাংলার কাব্য, বাংলার শিক্ষাদীক্ষা, বাংলার আকাশ-বাতাস তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করে নাই। বাংলার মাধুর্য্য, বাংলার রহস্য, বাংলার সুখ-দুঃখের কথা তাঁহাদের প্রাণের তারে সমতানে বাজিয়া উঠে নাই। শিশুর জননী-জঠরে যেমন মাতৃনাড়ীর সহিত সংযোগ থাকে, বাংলার চিত্রকরের বাংলার নাড়ীর সহিত তেমন সংযোগ হয় নাই। শিশু যেমন মাতৃপ্রাণে অনুপ্রাণিত হয়, বাংলার চিত্রকরেরা তেমন বাংলার প্রাণে অনুপ্রাণিত হন নাই। তাঁহারা সাধারণতঃ চিত্রগুলি বাংলার বিষয় হইতে রচনা করেন নাই। বাংলার চিত্র পদ্ধতিতে অঙ্কন করেন নাই। বাংলার চিত্রপ্রণালীতে চিত্র করেন নাই। তাঁহারা চিত্রগুলিতে বাংলাকে ফুটাইয়া তোলেন নাই। বাংলাকে প্রকাশ করেন নাই, বাংলার রসস্ফূর্ত্তি করেন নাই। তাই বাংলার চিত্রকলায় বাংলার জলন্ত প্রাণের সম্যক্ বিকাশ হয় নাই।

আমরা বিভিন্ন দেশের চিত্রকলায় বিভিন্ন দেশের স্বাতন্ত্র্যের অন্তস্ফূর্ত্তি দেখিতে পাই। ইটালী চিত্রকলার এক পুণ্যভূমি। র‍্যাফেল, লিওনার্ডিভিঞ্চি এবং টিসিয়ান এই চিত্রকলার মহারথী। কিন্তু তাঁহারাও ইটালীর বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষ রসই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইউরোপে, হল্যাণ্ডও চিত্রকলার আর একটি বিশেষ তীর্থ। রেমব্রাণ্ট, রুবেন্স এবং ভ্যেনডাইক এই চিত্রকলার মহারথী। কিন্তু তাঁহারাও এই হল্যাণ্ডের বিভিন্ন প্রদেশের বিশেষভাবেরই বিকাশ দেখাইয়াছেন। স্পেইনের মুরিলো এবং ভেলাকোয়েরের চিত্রেও আমরা ইহাই দেখিতে পাই।

এখন আমরা ইহা উদাহরণ দিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, বাংলার চারুকলার রস সাধারণতঃ অতি সহজভাবে বাংলার গীতি-কবিতাতেই বিকাশ পাইয়াছে। আমরা এখানে চণ্ডিদাসের গীতি-কবিতা হইতে ইহা দেখাইব। চণ্ডিদাস শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ আমাদের দেখাইতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ একদিন যমুনার ঘাটে শ্রীরাধিকাকে স্নান করিতে দেখিলেন। দর্শনমাত্রেই নায়কের প্রাণ নায়িকার ছটার ঝলকে চমকিয়া উঠিল। বড় আশা—রাধাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবেন। কিন্তু শ্রীরাধা যমুনার জল হইতে উঠিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। নায়ক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—গাহিয়া উঠিলেন—

"চলে নীল শাড়ী, নিঙ্গারি নিঙ্গারি
পরাণ সহিত মোর।"

এখানে চণ্ডিদাস নায়কের সমস্ত প্রাণের কথা দুই পদে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রেমিক-মাত্রই স্বীকার করিবেন যে, এই চিত্রে পূর্ণমাত্রায় নায়কের অন্তর্বিকাশ হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই যে, চণ্ডিদাস এই সুন্দর চিত্রে এই বাংলারই প্রাকৃতিক দৃশ্য আঁকিয়াছেন। বাংলার প্রেমিককেই নায়ক করিয়া রচনা করিয়াছেন এবং বাংলার সুন্দরীকেই নীল শাড়ী পরাইয়া নায়িকা করিয়া চিত্র করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বাঙ্গালী, শ্রীরাধা বাঙ্গালী, প্রকৃতি বাংলার, যমুনাও বাংলার। সমস্তটাকেই বাঙ্গালীর চক্ষে দেখিয়াছেন এবং সেই বাঙ্গালীকেই তাঁহার গীতিকবিতায় প্রকাশ করিয়াছেন। চণ্ডিদাস শ্রীকৃষ্ণকে মথুরার সাজে সাজাইতে পারিতেন, শ্রীরাধাকে ঘাগ্‌রী পরাইয়া বৃন্দাবনের সাজে সাজাইতে পারিতেন, এবং নায়ক-নায়িকাকে মথুরা-বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক দৃশ্যে শোভন করিতে পারিতেন এবং যমুনাকে মথুরা-বৃন্দাবনকে বিভাগ করিয়া কুলুকুলু স্বরে প্রবাহিত হইতেছে দেখাইতে পারিতেন। কিন্তু চণ্ডিদাস বাঙ্গালী, বাংলার আকাশ, বাংলার বাতাস, বাংলার দৃশ্য, বাংলার নর-নারী তাঁহার প্রাণের সঙ্গে জড়াইয়াছিল। তাই তিনি বাংলাকে ফুটাইয়াছেন, বাঙ্গালীকে প্রকাশ করিয়াছেন, এবং বাংলার কলারসের অন্তস্ফূর্ত্তি দেখাইয়াছেন। তাই তাঁহার গীতিকবিতা এত সহজ, সরল এবং স্বাভাবিক, এবং তাই তাঁহার গীতিকবিতা সাহিত্যজগতে এত উচ্চ আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। এই চিত্রটি আমাদের আধুনিক চিত্রকরেরা কি এইরূপই আঁকিতেন?

আমরা ইটালীর চিত্রকলায় এই আত্মবিকাশ দেখিতে পাই। র‍্যাফেল, লিওনার্ড-ভিন্সি ও টিসিয়ান ইটালীকে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই খ্রীষ্টের এবং তাঁহার মাতার চিত্র আঁকিয়াছেন। তাঁহারা খৃষ্টের মাতাকে ইটালীর নারীসাজে সাজাইয়াছেন এবং শিশু খৃষ্টকে ইটালীর বালগোপালের সাজে সাজাইয়াছেন।

আবার হল্যাণ্ডে রেমব্রেণ্ট, রুবেন্স এবং ভ্যানডাইক হল্যাণ্ডকে চিত্রে ফুটাইয়াছেন। এই মহাজনদের দুর্ভাগ্যবশতঃ হল্যাণ্ড নারীর রূপমাধুর্য্যের জন্য কখনও বিখ্যাত ছিল না। তথাপি এই চিত্রকরেরা সুন্দরীর অন্বেষণে দেশান্তরে যাওয়ার আবশ্যক বোধ করেন নাই। স্পেইনের মুরিলো এবং ভেলাকোয়েরের চিত্রেও তাহাই দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের এই আধুনিক চিত্রকরেরা বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পরিতৃপ্ত না হইয়া ভারতের অন্য প্রদেশের প্রকৃতিকে আঁকিয়াছেন। তাঁহারা বাংলার নরনারীর কমনীয় দেহকান্তিতে মুগ্ধ না হইয়া, অন্য প্রদেশের নরনারীতে তাঁহাদের চিত্রপট শোভিত করিয়াছেন। বাংলার কথা তাঁহাদের প্রাণে প্রাণে বাজিয়া উঠে নাই। তাঁহারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ও বিভিন্ন যুগের কথা তাঁহাদের চিত্রে প্রচার করিয়াছেন। তাই বলি যে, বাংলা তাঁহাদের অনুপ্রাণিত করে নাই; বাংলার আদর্শ তাঁহাদের চিত্রকলা উদ্ভাসিত করে নাই, তাঁহারা বাংলাকে বা বাঙ্গালীকে তাঁহাদের চিত্রকলায় পূর্ণ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আবার ইহাও বলি যে, বাংলার এই চিত্রকলায় একটি অনভিব্যক্ত শক্তি প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং এই শক্তি ক্রমে বিকশিত হইয়া বাংলার চিত্রকলাকে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবে এবং কলাজগতে বাংলার গীতিকবিতার ন্যায় শীর্ষস্থানীয় করিয়া তুলিবে।

বাংলার আধুনিক চিত্রকরেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের এই ভুল বুঝিতে পারিতে-ছেন। তাই তাঁহারা এখন বাংলার প্রাণে নিজেকে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিতেছেন, বাংলার আদর্শে নিজেকে গড়িতে চেষ্টা করিতেছেন, বাংলার ভাবে নিজেকে উদ্ভাসিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন এবং বাংলার সেই বিশেষ রস তাঁহাদের চিত্রগুলিতে ফুটাইতেছেন।

এই অল্পকালমধ্যেই বাংলার চিত্রকলা :অনেক উন্নতি লাভ করিয়াছে। এই চিত্রকলায় বাংলার অন্যান্য বিষয়ের মত ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। চিত্রকলা চিত্রকরের সাধনার এবং প্রচারের এক সহজ এবং সুন্দর উপায়। কবি কবিতা লেখেন, ভাস্কর মূর্ত্তি গড়েন, বাজনদার বাজান, গায়ক গান করেন এবং চিত্রকর চিত্র করেন। সকলেই নিজেকে প্রকাশ করেন, এবং আপনভাবে অন্যকে অনুপ্রাণিত করেন। এই আত্মবিকাশে এবং এই অনুপ্রাণনায় জগতের হিত সাধিত হয়। তাই অন্যান্য চারুকলার সাধকের মত বাংলার চিত্রকর বাঙ্গালীকে আপনভাবে বড় বেশী অনুপ্রাণিত করিতেছেন এবং বাংলার আদর্শ বাংলার চোখের সম্মুখে ধরিতেছেন। তাঁহাদের আশা যে, এই চিত্রকলার সাধনায় বাংলাকে পুনরায় জগৎমাঝে উঁচু করিয়া তুলিবেন। আমরা এই চিত্রগুলিতে তাহারই কেবল সূচনা দেখিতেছি।

শ্রীসুধীরচন্দ্র রায়।

কমলের দুঃখ

(হেনা—গোলাপ)

তোকে সে দিন ত আমি বল্লুম যে, সবাই সমান ; যেমন আমরা, তেমনি ওরা। তুই বল্লি, 'না লো না—তুই গরবে চোখে কানে দেখ্‌তে পাস্‌নি, তাই।' গরব কেন কর্‌ব না লো বল্‌—গরবের ঢের পেয়েছি, তাই গরব হয়েছে, তার গরবে এখন তাই গরবিণী ; তোরা এখন যা বলিস্‌, তা বল্‌ গে ধনি ! বেশ্যা হয়ে বেশ্যা-জন্মের সার্থক কর্‌তে যাচ্ছি—আমার গরব হবে না ? আহা ! রূপ বেচে সুখ কিনে—প্রাণের হাসিতে আগুন লাগিয়ে দাঁতে মিশি দিয়ে হাস্‌ছি—গরব কর্‌ব না ? বাবু সে দিন রস পেড়ে ভয় দেখিয়েছেন, হীরের কুঞ্জে বাসর জাগাবেন, তবে আমি ত ম'রে আছি—হায় ! হায় ! বলে

"এল কত গেল তল
উঠ্‌তে বস্‌তে এম্‌নি ছল"

আমার ত তায় প্রাণ উড়ে গেল আর কি ? ন্যাকামি দেখে গা জ্ব'লে যায়—যত সব হাবাতে, সাধ ক'রে কি ভাল লাগে না ? এটা বোঝে না যে, আমি তার জন্যে প্রায় ম'রে আছি আর কি ? যেখানে ইচ্ছা যাক্‌, তাতে আমার কি—আমার কি—আমি কি তার, না সেই আমার যে, তার জন্যে চোখের জল ফেল্‌ব—হা হুতোশ কর্‌ব ?—আহা, ব্যাটাছেলে সেয়না কত, আমার কাছে সাতলাক ছিনিমিনি খেল্‌লেন—দেবতার মত ভাই ছিল, তাই বাঁচ্‌লেন—এখন আবার বুড়মালিনীর কুঞ্জে তৃতীয় প্রহরে রাসের বাচ খেল্‌তে যাবেন, তাই আবার আমায় ভয় দেখাচ্ছেন ! চুলোয় যাক্‌ গে,—যা তার খুসী তাই করুক, আমার তাতে কিবা আসে যায় ! ও সব ভাব্‌বার আর ইচ্ছাও নেই। নদীর জল সাগরের দিকে ছোটে, সে দাঁড়িয়ে ভাবে না—আমিও দাঁড়াতে পার্‌ছি নি, ছুটেছি—উধাও—উধাও—কত দিনে তার চরণে গিয়ে পড়্‌ব। কত দিনে আমার সেই রূপের সাগরে প্রেমের ধারা বয়ে এক হয়ে মিশিয়ে যাবে। নদীস্রোত বাধা মানে না—আমার মনও বাধা মান্‌তে চায় না—সেও চলেছে ; যেমন স্রোতের জলে গাছের ছায়া মানুষের ছবি পড়্‌লে স্রোতের জলের কিছু হয় না—চলেছে—তেমনি এ নগেনের ছায়া, ওতে মন আর মাতে না। এখন টাকার সুখ, ইয়ারকির সুখ ভাল লাগ্‌ছে

না—সেই এক রূপের কথা প্রাণে টেনেছে—মনে লেগেছে। সেই দেবতার পায়ে ঝরা শিউলির মত সব গন্ধ নিয়ে—যৌবনের তনু মন তার প্রাণের সব আবেগ ঢেলে দিতে প্রাণ ছট্‌ফট্‌ করছে।

সে দিন মিত্‌যার আয়ী এসেছিল, বলে—'মর্ আবাগী, মানুষ গেছে, তার আবার ভাবনা? তোর তরে কত আলগোছ হয়ে রয়েছে, বলিস্‌ত' আজই—এখনই। তা নয়—গুণ গান কর, মানুষের আবার ভাবনা?—বলে—ফোটা ফুলে আবার ভোমরার অভাব?' আমি শুনে হেসে মরি। বুড়ীর কথা যদি শুনিস্ ত হাস্‌তে হাস্‌তে দম বন্ধ হয়ে যাবে। আমি বল্লুম 'আয়ি, মানুষ অমন ঢের মেলে, কিন্তু মনের মানুষ কৈ মেলে আয়ি?' আয়ী বলে—'আ মর্ লো মর্—মনের মানুষ কি জন্মায়? মন দিয়ে মন খুঁজে নেয়—সে এ রাস্তা নয় লো; মর্ মর্, এখন মনের মানুষ খুঁজ্‌ছে—তা বল্‌ছি ত গুণ গান কর্, অমনি কি হয়? এই আমাবস্তে আস্‌ছে—ভরা আমাবস্তের রেতের বেলা এলোচুলে সেই ফুল তুলে আন্‌বি, ওই শ্যামের বাগানে আছে—মাণিকযোড় গাছ, ডালে ডালে পাতায় পাতায় মেশামিশি—তার মাঝে এক শিস থেকে সাদা ফুল আর তার বুকের কাছটা লাল টুক্‌টুকে, সেই ফুল তুলে এনে যার বুকে মার্‌বি, সে ইন্দির, চন্দর, বায়ু, বরুণ হলেও পায়ে লুটিয়ে পড়্‌বে। মর্ লো মর্—মনের মানুষ খুঁজে মরছে—তা গুণ গান কর্—তা নয়—নিশি জাগ্‌ছে। মর্ লো মর্—সে ওই আমাবস্তের রাত্তিরেই ফোটে। যা বল্‌ছি, তা ক'রে দেখ্—মনের মানুষের আবার ভাবনা?' শুনে প্রাণের ভেতর সেই অবধি একটা ভয়ানক পিপাসা জেগেছে, তাকে আমার চাই—আমি চাই—দেখি—তেম্‌নি একবার চেষ্টা কর্‌ব—তাতেও কি হবে না? আয়ী আমায় ঠিক ব'লে গেছে, আজ দশমী—এই কদিন কাট্‌লে আমি তাই কর্‌ব।

কাল একজনরা—ওই সেনেরা বাগানের জন্যে এসেছিল, যাব নাই বলেছিলাম—বলেছি, আমি আর মজ্‌রো কর্‌ব না—ভাব্‌লুম বলি, যদি কমলবাবু তোমাদের বাগানে আসে, আমি তাঁকে একবার গান শোনাতে চাই—সে জন্যে আমি পয়সা নেব না। এতে যদি তোমরা রাজি হও, আমি যাব—নইলে—লক্ষটাকা দিলেও নয়। আমি ত টাকার কাঙালী নই। টাকা আমার ঢের আছে—আবার ভাব্‌লুম, তা কেন—তাদের কেন, বল্‌তে যাব; আমার লুকোন—প্রাণের লুকোন কথা তোর কাছে বলি ব'লে সবাইকে ব'লে বেড়াব। বল্লাম 'যাব না'—আবার তখনি মনে মনে সেই হিংসায় বুক জ্বলে যেতে লাগল; আমি যাকে ভালবাসি, তাকে কেন অন্যে ভালবাসে—আমি পাই আর নাই পাই, সেত আমার—সেত আমার; তাকে কেন—তার ছবির সাম্‌নে হাঁটু গেড়ে কেন—আর একজন পূজো করবে। মনে মনে

হয়, ভাবি—ছবিখানা কেড়ে নেব, তার পরই মনে হয়—বাইরের ছবি কেড়ে নিয়ে আর কি হবে—তার মনের আঁকা পটখানি ত মুছে ফেল্‌তে পারব না। আমার ত ঘরে তার ছবি নেই—আমি ত তাকে প্রাণভরে—সমস্ত মন এক ক'রে, কখন দেখ্‌তে পাই নি—তবুও প্রাণে যে ছবি—যে আলোর খেলা ফুটেছে, তাকে কে মুছ্‌তে পারে। এ ক্ষণিক বিদ্যুতের রেখার মত একবার ফুটে জলন্ত আগু-নের দাগ বসিয়ে গেছে,—সে কি ও সুখের রেখা, আর ওই সোহাগের তুলি তাকে মুছ্‌তে পারে। আবার ভাবি, আমিও ভালবাসি, সেও ভালবাসে—তার দোষ কি? হিংসা করি কেন,—না, তা হবে না, তাকে পেতে হবে, তাকে চাই। কিন্তু গোলাপ, মনে হয়, কি দিয়ে, কোন্ গুণে—তাকে চাই। কি আমার গুণ আছে যে, সে আমার এ প্রেমের—এ ভালবাসার—এ আত্মদানের সার্থকতা তাতে লাভ করব। এ উচ্ছিষ্ট দেহ নিয়ে কেমন ক'রে তাঁকে—তাঁর ভোগের জন্যে নিয়ে যাব। ভাবি—কতই ভাবি—কতই ভাবি—ভাবনার শেষ নেই। এ শোঁকা বাসিফুল নিয়ে—কেমন ক'রে তার কাছে যাব; কেমন ক'রে এ দেহকে পাত্র ক'রে, তার পুজোর ফুল সাজাব। ভাবি, বুঝতে পারি না—কি হবে—কি করব—শুধু ছুটেছি আত্মহারা দিশেহারা হয়ে, তার জন্যেই ছুটেছি। চাই তাকে,—পাব না কি? হায়! আমার এ কি দুরাশা,—চাতকের বাস মাটীতে গাছের ঝোপে—সে অমন দিগন্তের শেষে—সেই কোন্ ঊর্দ্ধে—সেই মেঘের ধারার জন্যে ছোটে কেন? কেন তার এ দুরাশা! প্রতি নিমেষেই বজ্রপতনের রোল, মেঘ মেঘের উপর গড়িয়ে যায়,—তবু সে ওই ফটিক জলের আশায়ই প্রমত্ত—সে কখন বাজের ভয় করে না! তোকে এই চিঠি লিখ্‌ছি, তখন আবার এই কতক্ষণ হ'ল, তারা এসেছিল। সঙ্গে মাষ্টার। বল্‌লে, 'বন্ধু,এ বাগানে কমলবাবু আস্‌ছেন, বুঝলে; বন্ধু,আমি তোমার হিতৈষী, তাই বল্‌তে এসেছি। অবুঝ হয়ো না বন্ধু—অবুঝ হয়ো না! হাজার টাকা দিতে চাইবে। তোমার ওর নাম কি—টাকার ভাবনার কথা বল্‌ছি নি—যা চাও, তাও ত একটা! হ্যাঁ হ্যাঁ কি বল—সুবিধেও হবে—বল ত আজ সব ঠিক করি। আস্‌ছে শনিবারে তবে সব ষোড়শোপচারে আয়োজন হ'ক—আর ব্রাহ্মণ বন্ধু, কিছু পেয়ে যাক্?' অনেকক্ষণ হাঁ ক'রে তার কথা শুনলুম; ভাবলুম—কখন্ এদের বাগানে আস্‌বে—আমি গাইতে যাব, সে শুন্‌তে তাই আস্‌বে—স্বপ্নের মত চোখের উপর সেই রাত্তিরের কথা মনে হ'ল, বুকটা তোলপাড় হ'য়ে গেল। বল্‌লুম—আচ্ছা যাব। মাষ্টার ত' নাচ্‌তে নাচ্‌তে গেল। কলম ফেলে চুপ ক'রে ভাব্‌তে লাগ্‌লুম, আমি চাই কি?—আমি ত তাকে অমন ক'রে চাইনে—আমি তাকে আমার প্রাণের মত ক'রে চাই, জগৎ থেকে আলাদা ক'রে প্রাণভরে চাই। ওই সব সকলের মত হয়ে আস্‌বে,—এসে আমার কাছে ধরা দেবে। তা হবে না—আমি তাকে আমার

মত ক'রে চাই! মনের মত, প্রাণের মত, বুকের ভাবের মত চাই! তখনই মনে পড়্‌ল, বেশ হয়েছে—ভালই হয়েছে, শনিবার আমাবস্তে—আয়ীমার সেই মাণিকজোড় ফুল—তার বুকে একবার সমস্ত প্রাণমন এক ক'রে নির্নিমেষ হয়ে মারব, দেখি হয় কি না? কিন্তু কি জানি কেন, প্রাণে এক মহা ভাবনা—যেন কি করতে কি হবে মনে হচ্ছে! যাই হোক, ভয় কিসের—যেমন ক'রে হোক্—তাকে পাবার জন্যে সব করব। তাকে পাবার জন্যে আমি সব করতে পারি, এ নারীজন্ম যে তায় সার্থক হবে। দেখি কি হয়! এ কটা দিন যে কি ক'রে কাটবে, তাই ভাবছি—না—কাটবে—আর কিছু না হয়, তাকে ত একবার দেখ্‌তে পাব; তার পায়ে একবার লুটিয়ে পড়্‌তে পাব ত। সে কি সত্যিই বাসি ফুল ব'লে ফেলে দেবে! কখন নয়। এখন ত তেমনি শিরায় তপ্ত স্রোত ছুটছে, এখন তেমনি প্রাণের আকুল আবেগ ভরে রয়েছে, তবে এখনও ত তেমনি আগ্রহের সঙ্গে সবাই ধেয়ে আসে, তবে সে কি তুলে নেবে না! কেন নেবে না,—আমি যে তাকে ভালবাসি—আমি দীনা-হীনা ব'লে, আমারও ত প্রাণ আছে, এ প্রাণের সমস্ত ভালবাসাখানির কি কোন মূল্য নেই? বিকিকিনির হাটে আমার এ পসরা সে কি একবার তুলে নিতে যাবে না? ভার হয় ফেলে দেবে,—তা ব'লে কি করব। আমি পসরা আর কাকেও বেচ্‌তে পারবো না—কেউ ত বিনামূল্যে কিন্‌তে পারবে না—কেউ ত অমন রূপ দিয়ে পসরা আলো ক'রে নিতে পারবে না। কেউ ত অমন চরণমূলে প্রাণপণের পাপড়ী খুলে দেবে না। একবার তাকে দেখ্‌তেও ত পাব। সেও কি তোমার ঢের নয়? তবু একবার দেখ্‌ব।

ওই নিশি ঘন ঘোর ক'রে এলো। যত রাত হয়, তত আমার আশা বাড়ে। মনে মনে কত ছবি আঁকি। ভাবি, এমনি নিশায় ওই তারাভরা আকাশের তলায়, আমায় বুকে ক'রে সে বল্‌বে ভালবাসি। বল্‌তে বল্‌তে চুমু দিয়ে আমায় ভরিয়ে দেবে। কখন ভাবি—যেমন পুকুরের জলে উল্টে পড়া পদ্মপাতার উপর ফোটা পদ্ম লুটিয়ে পড়ে, তেমনি করে তার—আমার সেই কমলের—কমল চরণের পাতার উপর আমার এই ঝামরাণ শিশিরে আহত পদ্মের মত মুখখানা পেতে রাখ্‌ব। কখন ভাবি, আমি মান ক'রে বসে থাক্‌ব, আমার পিয়া কত সোহাগে আমার এই বুকে সোনায় গাঁথা মুক্তার মালা দোলাবে, আমি অধর ফুলিয়ে হেসে—তার কোলে লুটিয়ে পড়ব। কখন ভাবি, বুকে বুকে মুখে মুখে নীরবে দুজনে ফুলশেযে সুখের আবেশে আতিশয্যে ঘুমিয়ে পড়্‌ব, কিন্তু কি দুর্ভাগ্য—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ি, স্বপনে চম্‌কে উঠি! পিয়া! পিয়া! ব'লে অন্ধকারে বাতাসকে বুকের ভেতর চেপে ধরতে যাই; প্রাণের ভেতর থেকে ডুক্‌রে ওঠে। কাকে

কোকিলে সাড়া দেয়, ভোর হয়, ঘুম ভাঙে, তখন দেখি, সারানিশি ধ'রে যে ছবি আঁকলেম, স্বপ্নে যাকে বুকে করলেম, নিঠুর প্রভাত দেখালে—সে সব হাসির ফাঁকি—একটি তার সত্য নয়! অবশ দেহ মন যেন—বিছানায় মিশিয়ে পড়ে থাকে। এমনি ক'রে আর বইতে পারি নে—ভাবছি তাই কতদিনে তাকে পাই। রাত্তিরের সমস্ত সঞ্চিত আশা ভোরের বেলায় নিরাশায় ঝরে যায়। যেমন আমাদের জীবন! সমস্ত রাতের কলকণ্ঠের ঝঙ্কার—যেমন নাকের হাড় উঁচু, জিব শুখনো, চোখের কোলে কালী—আর শরীর এলিয়ে পড়ছে। আশার স্বপনে আঁকি ছবি বার বার, সত্য কভু হ'ল না আমার। কি এ যেন কিসের দুর্ভোগ—যে কি এ জীবন। অন্ধকার আমাদের আশা, দিবা আমাদের নিরাশা! আর ত পারি না, জীবন যেন কেমন হয়ে গেল, কি হবে কি করব। ভাই, তুই হয় ত মনে করছিস্, আমি পাগল হয়েছি! পাগল হই নি লো—পাগল হই নি, সত্যি যা তাই তোদের কাছে বলছি। ভাণ করতে করতে এমন হয়ে যাই যে, সত্যিতে ও ছলনায় তফাৎ করতে পারি নি। তাই এমন দুর্দ্দশা! এতদিন ত ভাণ করেছি, এখন সত্যি করেই দেখি না, যদি কিছু পাই। এত ক'রে প্রাণ ধ'রে যার কামনা করছি, তার কি কিছুই হবে না! প্রাণের কামনা কি বিফল হয়!

অনেক রাত্রে নেশায় টলতে টলতে নগেন এসে গোলমাল করছিল। দরোয়ান ভয়ে-ডরে দরজা খুলে দেয়—আমায় এসে জ্বালাতন করে—আমি তার সঙ্গে দেখা করিনি। রাগে আপনি যখন ফিরল—তখন নেশার ঝোঁকে কত কি বকতে বকতে চ'লে গেল। গোলাপী, আজ সবাই কেমন জ্বালাতন ক'রে তুলেছে। পাখীটা পর্য্যন্ত চেঁচাচ্ছে। ছাড়লেও ছাড়ে না, এ কি অত্যাচার! আমি চাই না, তবু কেন আমায় ব্যস্ত করা। ইচ্ছে হচ্ছে তার সব টাকা-কড়ি ফিরিয়ে দিয়ে বলি, এই নাও—এই নাও, দেহের বিনিময়ে যা নিয়েছিলুম, তাও তোমায় ফিরিয়ে দিলুম; আর আমার তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই,—ফিরিয়ে নাও। সেই চাঁদের পানে চেয়ে চেয়ে মন তার মনের সঙ্গে মিশিয়ে যেতে চাইছে,—এখন আর হাটের বেচা-কেনা পারব না, প্রাণ আকাশে উঠেছে। যত দিন না তাকে পাই—তত দিনই এ জ্বালার নিবৃত্তি হবে না। প্রাণে প্রাণে এ এক অপূর্ব্ব জাগরণ, এ কখন আমার জীবনে হয় নি। তোরা যাই কেন মনে কর্ না—আমার এ মন তাকেই দিতে পারি! দেহ মন আমার সেই এক মহা-মিলনের জন্তে উন্মুখ হয়ে উঠেছে! আর কিছু চাই না! আর কোন সাধ আমার নেই! মনের মাঝে এ আমার কি আকুলতা—ভাবছি ফুল ছুঁড়ে মারলে আমার হবে; আর আমি যে প্রাণ-মন-দেহ পণে তাকে পাবার জন্তে লালায়িত—সে নিষ্ফল হবে!

ভাব্‌ছি ফুল ত বাইরের—আমার মনের ভেতরে যে ফুল ফুটেছে, তার পুজোয় সে ভুল্‌বে না—তার পুজো সে নেবে না! আর এলোচুলে, সোঁত কাপড়ে একটা ফুল ছুড়ে মার্‌লে—তার সমস্ত বুকে ফুলশর বিঁধ্‌বে। আমার এ ফুলের মত— ফুলের বজরার মত গাঁথনি, সাজিভরা স্তবকের মত দেহে ভুল্‌বে না,—আর ওই আরশীর কথায় সব হবে। জানি না—এ অদৃষ্টে কি আছে। আর আশা ও নিরাশার মাঝে, সুখ ও দুঃখের মাঝে, জন্ম ও মরণের মাঝে দোলায় দোলার মত প্রাণ হাঁপায়ে থাকতে পারি না। সব যেন কেমন এক পোঁচড়া টেনে কালীমাখা ঘরকে সাদা করার মত—কালী-ঝুলি তার অন্তর থেকে ফুটে ফুটে বের হচ্ছে; সে সাদা করা শুধু ও জোমড়ার চুণের কাজ নয়। ভাঙ্গ বালি,—বালি ভেঙ্গে নূতন কলি ধরিয়ে দিলে, তার পর যদি আবার সাদা হয়—যদি বালি সেই পুরণো ইঁটে ভাল ক'রে ধরে। বুঝ্‌তে পার্‌ছি নি—আর ভাব্‌তেও পারি নি—এ অদৃষ্টে কি শেষ দাঁড়াবে। এত যে সুখের জন্যে ঘুরে মলাম, সে সুখ কোথায়? শুধু একবার আকাশপানে চাই,—একবার নিজের মনের ভেতর ডুব্‌তে যাই, দেখি—সেই ছবি! রঙ নিয়ে তুলি নিয়ে মনে করি, মনের সেই ছবি আঁক্‌ব—মনের মতন ক'রে আঁক্‌ব। তুলি নিয়ে বসি, হাতের তুলি হাতেই থাকে,—সে ছবি দেখ্‌তে দেখ্‌তে বিভোর হয়ে যাই! তুলি তখন হাত থেকে কখন পড়ে যায়, মনেই থাকে না। এমনি ক'রে মানুষ কি ক'রে দিন কাটায় বল। ছবি আঁকাও আর আমার হয়ে উঠে না। কেবল খোঁজাই সার, সুখ কি মেলে! শুধু ধেয়েই চলি, শুধু ভাবি সুখ! সুখ! কি ক'রে দিতে হয় তা ত শিখিনি। না দিলে কি সুখ মিলে—দেওয়া কাকে বলে, কি ক'রে দিতে হয়! হায়! কে ব'লে দেবে, সে ভালবাসে কি না। হায়! সুখ, কোথায় তুমি? হেমন্তের কুয়াসার মত কোথা দিয়ে চলে যাও, বসন্তের স্নিগ্ধ স্পর্শের মত কোথা থেকে মুকুলে ভরে দাও। একবার ছুটি, পালিয়ে গাছের পাতা ঝরিয়ে দাও; : আবার ছুটি—বকুল ফুটিয়ে পথে ছড়িয়ে দাও। কিসে তোমায় মিলে ব'লে দাও—আমি তাই করি। কি দেব যে নেব, কি দিয়ে সুখ গড়ে তুল্‌ব,—কি দিয়ে তাকে পাব—এই কথা ভাব্‌ছি। ভাবের ঘোরে ছুটেছি, ধরি ধরি, যদি তায় পাই, কিন্তু হায়, কেবলই সে দূরে চলে যায়। হায় সুখ! হায় সুখ! হায় সুখ! কোথা তুমি জীবনের শেষ চরম— কোথা তুমি! কই? এই কি সুখ। ওই যে নরনারী কেমন হাস্‌ছে—কেমন সব পুরুষগুলো কেমন ভাবনা-শূন্য। ওই যে নৃত্যগীত, সুরার উল্লাস, তালে তালে কেউর বাজছে, কুন্তল দুল্‌ছে—ওই কেমন ললিত লীলাভঙ্গে লাবণ্য উছলে পড়্‌ছে,—যেন ধীর সমীরের সমুদ্র আবেগভরে উথলে উঠ্‌ছে। ওই তাল কাটল,

কথা জড়িয়ে এল, নরনারী পরস্পর পরস্পরকে কি দৃঢ় আবেগে সুখের আশায় জড়িয়ে ধর্‌লে—ও ধরণীতে লুটাল।

উন্মাদক মাদকের সুখমত্ততায় তারা দেখ্‌লে না, ঘন ঘোর তিমির ছেয়ে আস্‌ছে। সবই হ'ল, তবু তৃপ্তি নেই! ওই যারা সুন্দর ছিল, কত ক'রে সাজিয়ে মাখিয়ে রূপ তৈরী করেছিল,—সে রূপ নেই, চোখের কাজলে মুখ ভরে গেছে—অমন সুন্দর বিচিত্র বাস মলিন, ধূলায় ক্লিন্ন, চক্ষু কোটরগত, মড়ার মত পাণ্ডুর মুখের রঙ, সযত্নে বাঁধা কবরীর ছেঁড়া চুল লুটিয়ে পড়চে, রঙ-করা ছেঁড়া কাপড় টুক্‌রো টুক্‌রো হয়েছে,—কে জানে, কখন্ বাতি নিবে যায়, তাই তিমির, তাদের এই সুখের বাসর আর দেখ্‌তে দেয় না। এই সুখ গোলাপী—এই সুখ! মসীমাখা মৃত্যুর আঁধার গ্রাস করলে—তার পর কি? তার পর কি?

তোরই হেনা।

শ্রীসত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত।

অদৃষ্ট *

আমি একা বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, বেড়াইতে বেড়াইতে হঠাৎ আমার পশ্চাতে যেন কাহার লঘু পদক্ষেপ শুনিলাম। আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কেহ অনুসরণ করিতেছে, মনে করিয়া আমি পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলাম—দেখিলাম, এক বৃদ্ধা—তাহার সর্ব্বাঙ্গ মলিন বস্ত্রাচ্ছাদিত, কেবল পাণ্ডুর দন্তবিহীন মুখখানি দেখা যাইতেছিল।—আমি তাহার কাছে যাইবামাত্র সে থামিল।

আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কে? কি চাও? তুমি কি ভিখারী? ভিক্ষা চাও?" সেই বৃদ্ধা কোন উত্তর করিল না—আমি ঝুঁকিয়া দেখিলাম যে, তাহার দুটি চক্ষুই বন্ধ, সে চোখ খুলিল না এবং খুলিবার কোন চেষ্টাও করিল না দেখিয়া অনুমান করিলাম যে, সে অন্ধ—আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি ভিক্ষা চাও?" কিন্তু আগের মত এবারও সে নির্ব্বাক্ রহিল দেখিয়া তখন আমি ফিরিয়া আবার গন্তব্য পথে চলিলাম। কিছু দূর গিয়া পুনরায় পশ্চাতে সেই পদশব্দ শুনিলাম—আবার পশ্চাতে তাকাইলাম—দেখিলাম, সেই বৃদ্ধা। প্রথমে মনে হইল যে, এ আমাকে ছাড়িতেছে না কেন? শেষে মনে করিলাম, সে অন্ধ, হয় ত পথ হারাইয়া গিয়াছে—আমার পদশব্দ অনুসরণ করিলে লোকালয়ে যাইতে পারিবে বলিয়া হয় ত আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। কে জানে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আমার কেমন অসোয়াস্তি লাগিতে লাগিল—আমার কেমন মনে হইতে লাগিল যে, বৃদ্ধাটি শুধু আমাকে অনুসরণ করিতেছে না,—সে আমার অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন আমাকে পথ দেখাইয়া, জোর করিয়া ঠেলিয়া লইয়া যাইতে বাধ্য করিতেছে।

আমি অনন্যোপায় হইয়া চলিতে লাগিলাম—কিন্তু এ কি কি দেখিলাম? আমার সম্মুখে ভীষণ অন্ধকার—তমসাচ্ছন্ন সর্ব্বগ্রাসী দিগন্তব্যাপী ঘনান্ধকার—এ কি? এ কি বিশ্ব-সমাধি? তবে এইখানেই কি বৃদ্ধা আমাকে লইয়া যাইতেছে?

আমি তৎক্ষণাৎ পশ্চাদ্দিকে ফিরিলাম—আবার সেই বৃদ্ধা আমার দিকে চাহিল—কি আশ্চর্য্য! এইবার তাহার চোখে দৃষ্টি দেখিলাম—কিন্তু কি ভয়ানক—ঠিক যেন ক্ষুধার্ত্ত শকুনির দৃষ্টি! আমি আবার ঝুঁকিয়া দেখিলাম—ভাল করিয়া দেখিলাম—চোখ পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধ!

---

* Ivan Turgenieve এর 'Prose Poems' হইতে অনুবাদিত।

জানি না, কেন তখন আমার মনে হইল যে, এই আমার অদৃষ্ট—ইহার নিকট হইতে কেহ পলাইতে পারে না—ইহাকে কেহ ছাড়াইতে পারে না—যেখানেই যাও না কেন, ইহা সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে।

তখন বুঝিলাম না; একবার শেষ চেষ্টা করিব ভাবিয়া আমি অন্য পথে পলাইলাম।

আমি খুব তাড়াতাড়ি চলিলাম—কিন্তু ওই সেই!—আবার সেই পদশব্দ! এবার যেন কাছে - খুব কাছে—এবং সম্মুখে আবার সেই ঘনান্ধকার!

যখনি যে দিকে ফিরি না কেন, তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না—পশ্চাতের সেই পদশব্দ, আর সম্মুখের সেই অন্ধকার আমাকে ছাড়িল না।

এইবার মনে মনে ফন্দি আঁটিলাম—উহাকে ঠকাইব—আমি কোথাও যাইব না। এই ভাবিয়া আমি তৎক্ষণাৎ মাটীতে বসিয়া পড়িলাম—সেই বৃদ্ধা আমার পশ্চাতে থামিল। আমি এইবার আর তাহার পদশব্দ শুনিলাম না বটে, কিন্তু সে যে কাছে আছে, তাহা বেশ অনুভব করিলাম।

হঠাৎ আমি দেখিলাম, সেই সম্মুখের অন্ধকার যেন ক্রমশই আমার দিকে ঘনাইয়া আসিতেছে; তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিলাম; দেখিলাম, সেই বৃদ্ধা—আমার অদৃষ্ট—আমার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে।

বুঝিলাম, অদৃষ্টের হাত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই!!

শ্রীঅর্পণা দেবী।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

(১৮১৭—১৯০৫)

ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ (১৮৪৮)।

বেদকে ব্রাহ্মসমাজ কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, এই প্রশ্ন যখন অক্ষয়কুমার প্রথম উত্থাপন করিলেন—তখনই দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি বেদ-সমস্যার উপর পতিত হইল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শাস্ত্রের প্রামাণ্য সম্বন্ধে ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে যে প্রথম সংশয় ও আলোচনা উত্থিত হইয়াছিল—তাহা সর্ব্বাগ্রে অক্ষয়কুমারের প্রতিভা-প্রসূত। দেবেন্দ্রনাথ বা আর কেহ পরে এই সংশয় ও আলোচনায় যোগ দিয়াছেন, এবং অনুসন্ধান ও বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া, সম্ভবতঃ অল্লাধিক স্বতন্ত্র মীমাংসায় গিয়া উপনীত হইয়াছেন।

যে কালের মধ্যে বেদের প্রামাণ্য লইয়া অক্ষয়কুমার, দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের নেতাগণ অতিশয় বিব্রত এবং নানারূপ আলোচনা ও অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত, ঠিক সেই সময়েই দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের উদ্ভব। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের একটি স্মরণীয় কালের ইতিহাসের ছাপ এই গ্রন্থে আছে বলিয়া, ইহা একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ। তদ্ব্যতীত দেবেন্দ্রনাথ বেদ-সমস্যা-সম্বন্ধে কিরূপ মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, এই গ্রন্থ তাহার এক প্রধান প্রমাণ এবং পরিশেষে দেবেন্দ্রনাথের সমকালীন ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ এই গ্রন্থকে কিরূপ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সাধারণতঃ ব্রাহ্মসমাজের উপর এই ধর্ম্মগ্রন্থ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, ইহাও সম্যক্ আলোচনার বিষয়। দেবেন্দ্রনাথের নিজের জীবনের ও ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের দিক্ হইতে উপরি-উক্ত আলোচনার মূল্য যথেষ্ট বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

ইহা ছাড়া দেবেন্দ্রনাথ-প্রণীত এই ধর্ম্মগ্রন্থের আরও এক প্রকার সমালোচনা হইতে পারে, যাহা সাধারণতঃ বিশ্লেষণমূলক। তাহা হইতেছে এই ধর্ম্মগ্রন্থের মতবাদের বিচার, এবং এই গ্রন্থ-সংকলনের যে পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার বিচার।

অক্ষয়কুমারের হস্তে একরূপ 'তাড়া' খাইয়াই যখন ব্রাহ্মসমাজের নেতাগণ বেদের প্রামাণ্যসম্বন্ধে সচকিত হইয়া উঠিলেন এবং অক্ষয়কুমারের প্রখর যুক্তি যখন তাঁহাদিগকে বুঝাইতে লাগিল যে, আধুনিক যুগের জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতান্ত অলীক ও ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গিয়াছে, বেদ যখন সেই সমস্ত কাল্পনিক ও ভ্রমাত্মক সিদ্ধান্তকেই আপ্তবাক্য বলিয়া বক্ষে ধারণ করিয়া

আছে, তখন ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ হইতে বেদকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যায় কিরূপে? তখন দেবেন্দ্রনাথ এই যুক্তির হস্ত হইতে সহজে নিষ্ক্রান্ত হইবার পথ পাইলেন না। দেবেন্দ্র-পন্থী রাজনারায়ণ বাবু তাঁহাদের বেদ-বিশ্বাসের আনুকূল্যে নিতান্তই খোড়া এবং খেলো যুক্তি লইয়া আসরে নামিলেন। তাঁহার কথাটা সাদা বাংলায় এই যে, আমরা ত জানিতাম, বেদের মধ্যে কেবল জ্ঞানসম্মত বাক্যই আছে, এবং তাই জানিতাম বলিয়াই ত বেদকে ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিতেছি। কে জানিত যে, ঐ ঈশ্বর-বাক্যের মধ্যে এমন মারাত্মক ও ভ্রমাত্মক অবান্তর-কথার সন্নিবেশ রহিয়া গিয়াছে। বেদের বাক্যকে ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ জানিয়া কি আর আমরা তাহাকে অপৌরুষেয় বাণী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম? বস্তুতঃ আমরা জ্ঞান ও যুক্তি-তেই বিশ্বাসী ছিলাম এবং এখনও আছি। তা যখন বেদ যুক্তিযুক্ত নয় (অক্ষয় বাবু দেখাইতেছেন) তখন—না হয়—(যদি মহর্ষি অনুমোদন করেন) বেদকে ব্রাহ্ম-সমাজের পক্ষ হইতে বর্জ্জনই করা যাউক।

রাজনারায়ণ বাবু উপরি-উদ্ধৃত যুক্তির চাতুর্য্যে শুধু তাঁহার নিজের নয়, দেবেন্দ্র-নাথেরও বেদের প্রামাণ্য সম্বন্ধে মতপরিবর্ত্তনের একটা স্পষ্ট আভাস দিয়াছেন। সুতরাং সমগ্র বেদাদির প্রামাণ্য যখন স্বীকার্য্য নহে, তখন দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য কি প্রামাণ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করা যায়, ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, অক্ষয়কুমার জ্ঞান ও যুক্তির উপর দাঁড়াইয়াই বেদকে অস্বীকার করিতে-ছেন, সুতরাং জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, দেবেন্দ্রনাথ এই জ্ঞান ও যুক্তিকেই অনুসরণ করিলেন। অক্ষয়কুমারের জ্ঞান ও যুক্তি যেমন আত্মজ্ঞান ও আত্ম-যুক্তি, দেবেন্দ্রনাথও সম্ভবতঃ অক্ষয়কুমারকে অনুসরণ করিয়া এবং বিশেষতঃ নিজের স্বভাবানুযায়ী আত্মজ্ঞান ও আত্মযুক্তিকেই অবলম্বন করিলেন। শাস্ত্রের প্রামাণ্য দেবেন্দ্রনাথ বস্তুতঃই বর্জ্জন করিলেন।

কিন্তু অক্ষয়কুমারের মতবর্জ্জন করিবার ঐকান্তিক দুঃসাহস ও নির্ভীকতা দেবেন্দ্র-নাথের ছিল না, এবং ছিল না বলিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ-সংকলনে তিনি 'অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র' এরূপ উদার ও সার্ব্বভৌমিক সত্যকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে সাহসী হইলেন না; পুনরায় পিছু হটিয়া গিয়া উপনিষদের গণ্ডীর মধ্যেই আশ্রয় লইলেন। দেবেন্দ্রনাথ ভাবিলেন যে, আত্মজ্ঞান ও যুক্তির প্রমাণই ত অক্ষয় বাবু এ যুগের উপযোগী মনে করিতেছেন, এবং শাস্ত্রের সব কথাই কিছু অজ্ঞানের কথা বা অযুক্তির কথা বলিয়া প্রমাণ হইতেছে না, সুতরাং শাস্ত্রের যে অংশ আত্ম-জ্ঞান ও যুক্তির অনুমোদিত, তাহাই বাছাই করিয়া লইলেই ত হইল। তাহাতে শাস্ত্রও বাঁচিল, আত্মজ্ঞানও বজায় রহিল। এই চিন্তা করিয়া দেবেন্দ্রনাথ নিজের

জ্ঞানমত উপনিষদ হইতে শ্লোক বাছিয়া যে গ্রন্থ তৈয়ার করিলেন, তাহাই হইল 'ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ'।

সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে বেদের প্রামাণ্য লইয়া যখন সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই সংশয়ের ব্যথা, দ্বন্দ্ব, কোলাহল ও তর্কের মধ্য হইতে জন্ম লাভ করিয়াছিল এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে সেই সংশয়কালের কি ইতিহাস আমরা পাই? এই ইতিহাস যে, বেদাদি সমগ্র শাস্ত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের স্বীকার্য্য নহে। আর কি মীমাংসা এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে পাওয়া যায়? এই মীমাংসা যে—কতিপয় উপনিষদের কয়েকটি বিশেষ শ্লোকই ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি। সেই সমস্ত শ্লোক-সংগৃহীত গ্রন্থই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ।

দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রকে গ্রহণ করিয়াছেন কি বর্জ্জন করিয়াছেন,—এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রতি প্রথম দৃষ্টিতে তাহা স্থির করা কঠিন। সমস্ত শাস্ত্রকে তিনি গ্রহণ করেন নাই, এজন্য তাঁহাকে শাস্ত্রত্যাগী বলা যাইতে পারে। আবার প্রাচীন শাস্ত্রের উপরেই মূলতঃ তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এজন্য তাঁহাকে শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাও বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই দুই শ্রেণীর সমালোচকেরা এই দুই প্রকার পরস্পর-বিরোধী সমালোচনাই তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিয়াছেন,—ইহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এবং আশঙ্কার বিষয়ও বটে যে, সম্প্রতি আর এক তৃতীয় শ্রেণীর সমালোচনা দেখা দিয়াছে—যাহা উপরি-উক্ত পরস্পর-বিরোধী দুইটি সমালোচনাই একসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের প্রতি প্রয়োগ করিতে যত্নবান্! দেবেন্দ্রনাথকে শাস্ত্রত্যাগীদের প্রথম ও প্রধান বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বেদবর্জ্জন-রূপ এত বড় ঐতিহাসিক ব্যাপারের গৌরবটাকে কোনমতেই শুধু একা অক্ষয়কুমারের ভাগে বা ভোগে ফেলিয়া দেওয়া যায় না। আবার দেবেন্দ্রনাথকে শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাও বলা চাই। কেন না, তাহা না হইলে রাজা রামমোহনের সহিত তাঁহার সাদৃশ্যের খেই যে হারাইয়া যায়। অথচ সামলাইতে হইবে দুই দিক্ই। আধুনিক চেষ্টার মুস্কিল যে খুব বেশী, তা বুঝিতে পারি! কিন্তু এক নিঃশ্বাসে এইরূপ পরস্পর-বিরোধী দুই কার্য্য—অথবা দুষ্কার্য্য যাঁহারা করিতে পারেন, তাঁহারা যে কি না পারেন, চিন্তায় খুঁজিয়া পাই না।

যাহা হউক, ঐতিহাসিক ঘটনাগুলিকে অনুসরণ করিয়া আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, দেবেন্দ্রনাথ প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ অক্ষয়কুমারের যুক্তি দ্বারাই বেদ-বর্জ্জন-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং অক্ষয়কুমারের যুক্তি হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসীজাতির যুক্তিবাদ—যাহা নির্ভীক, প্রখর ও প্রচণ্ড, অথচ যাহা কেবল যুক্তি, শাস্ত্রনিরপেক্ষ যুক্তি। অক্ষয়কুমারের ভিতর দিয়া ফরাসীর এই অষ্টাদশ শতাব্দীর

যুক্তিবাদের তপ্ত হাওয়া যে কিঞ্চিৎ দেবেন্দ্রনাথে সংক্রামিত হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি? দেবেন্দ্রনাথের বেদ-বর্জ্জনে মূলতঃ এইরূপে বৈদেশিক যুক্তি-বাদের প্রেরণা কার্য্য করিয়াছে।

যুগসন্ধিক্ষণে নবযুগের উপযোগী শাস্ত্রব্যাখ্যার মীমাংসার ও সংস্কারের যে সনাতন-পদ্ধতি আবহমানকাল হইতে হিন্দুজাতির মধ্যে প্রচলিত আছে, প্রধানতঃ এ যুগে রাজা রামমোহনকে বলা যাইতে পারে যে, তিনি শাস্ত্রকে গ্রহণ করিলেন না; গ্রহণ করিলেন—তাঁহার 'আত্মপ্রত্যয়'কে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের ঐ সমস্ত বাছাই শ্লোক তাঁহার আত্মপ্রত্যয়েরই প্রতিধ্বনিমাত্র।

যদি তাহাই হয়, তবে অক্ষয়কুমার ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, আত্মপ্রত্যয়ের প্রতিধ্বনি শুধু হিন্দুজাতির বিরাট্ শাস্ত্রগ্রন্থাদির মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকখানি উপনি-ষদের গোটাকয়েক শ্লোকের গণ্ডীতে নিবদ্ধ করিয়া নিরাপদে শৈলশিখরে গিয়া চক্ষু মুদিলে ত চলিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্ম জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ব্রহ্মবাদীদিগের ধর্ম্ম। অন্যান্য জাতির ধর্ম্মশাস্ত্র হইতেও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিধ্বনিসূচক শ্লোক সংগ্রহ করিতে হইবে, এবং সেই সকলকে একসঙ্গে গ্রথিত করিতে হইবে। শুধু ধর্ম্মশাস্ত্র কেন? যাহা সত্য, তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম। কোমৎ ও লাপ্লাসের নাস্তিক্যবাদও সত্যমূলক। অতএব অক্ষয়কুমারের মতে তাহাও ব্রাহ্মধর্ম্ম! দেবেন্দ্রনাথ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, "কতকগুলা নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে,—ইহাদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের সুবিধা নাই।"

আবার পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার ভাবিলেন যে, দেবেন্দ্রনাথের এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ না হইলে উদার ও বিশ্বজনীন ব্রাহ্মধর্ম্ম বেদকে বর্জ্জন করিয়াও, কার্য্যতঃ উপনিষদের কয়েকটা শ্লোকের আওতায় পড়িয়া সম্যক্ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না। সুতরাং অক্ষয়কুমার প্রকাশ্যে এই গ্রন্থের প্রতিবাদ করিলেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে তিনি বক্তৃতা দিলেন যে, "অখিল সংসারই আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র। বিশুদ্ধ জ্ঞানই আমাদের আচার্য্য। যে পদ্ধতিকে অবলম্বন করিয়া শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, এবং রামমোহনের ব্যাখ্যায় শাস্ত্রের বর্জ্জন ও গ্রহণকার্য্য যে ভাবে সম্পাদিত হইয়াছে, দেবেন্দ্রনাথের শাস্ত্র-বর্জ্জন ও গ্রহণ সে দিক্ দিয়াই নহে। হিন্দুর আবহমান-প্রচলিত শাস্ত্র-সংস্কারের পদ্ধতিকে দেবেন্দ্রনাথ বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারেন নাই। শাস্ত্রের গ্রহণে ও বর্জ্জনেই তাহার প্রমাণ। রাজা রামমোহন সমগ্র শাস্ত্রটাকে হাতে লইয়া, নবযুগের বিশালতা ও আকাঙ্ক্ষাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, শাস্ত্রের প্রাচীন অবয়ব ও আয়তনের মধ্যেই বিশ্বমানবের ও হিন্দুর জাতীয় বিশিষ্টতার মূলমন্ত্রগুলিকে ধ্বনিত করিয়া দিয়াছেন। ব্যবহারশাস্ত্রের পরিবর্ত্তনকল্পে

—যুগসন্ধিক্ষণে, রোমক জাতির ব্যবস্থাপকেরাও এইরূপ পদ্ধতিই অবলম্বন করিতেন।

"যাহা হউক, দেবেন্দ্রনাথের বেদবর্জ্জন ত ফরাসীর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেরণায়; কিন্তু তাঁহার উপনিষদের শ্লোকসংগ্রহের প্রেরণা কোথা হইতে? আমাদের বিবেচনা এইরূপ যে, দেবেন্দ্রনাথের প্রতিভা খুব তীক্ষ্ণ ছিল না। রামমোহনের প্রতিভার ছায়ার কাছেও তাঁহার পক্ষে দণ্ডায়মান হওয়া শক্ত ছিল। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের রক্ষণশীল স্বভাবের মধ্যে একটা হিন্দুভাব চিরকালই ছিল। অথবা এই রক্ষণশীল স্বভাবই হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ার রূপান্তর মাত্র। সুতরাং এই রক্ষণশীলতার জন্যই বা হিন্দুভাবাপন্ন হওয়ার জন্যই হউক, কিংবা অক্ষয়কুমারের মত প্রবল যুক্তিবাদী হইয়া শাস্ত্রবর্জ্জনের দুঃসাহস তাঁহার মধ্যে না থাকার জন্যই হউক, অথবা এই সমস্ত কারণ একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়াই হউক, দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্রকে মূলতঃ বর্জ্জন করিয়া, বাহ্যতঃ শ্লোক-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া—তাহাকে পুনরায় গ্রহণই করিলেন।

"ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংক্রান্ত সমুদয় তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে, আর কিছুই নির্দ্ধারিত হইবার সম্ভাবনা নাই, আমাদের এরূপ অভিপ্রায় নয়।......ধর্ম্মবিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা কিছু নির্ণীত হইয়াছে, এবং উত্তরকালে যাহা নির্ণীত হইবে, সে সমুদয়ই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের অন্তর্গত। সহস্র শতাব্দী পরেও যদি কোন অভিনব ধর্ম্মতত্ত্ব উদ্ভাবিত হয়, তাহাও আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম।........."

অক্ষয়কুমারের এই প্রতিবাদ-বক্তৃতাটিকে কতকগুলি উৎসাহী ব্রাহ্ম "ধর্ম্মোন্নতি-সংসাধন" নাম দিয়া—উহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, অক্ষয়কুমার একা নহেন, অনেকগুলি ব্রাহ্ম দলবদ্ধ হইয়া এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রকাশের পরেই তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং অক্ষয়কুমার সেই প্রতিবাদী ব্রাহ্মদলের মুখপাত্রস্বরূপ।

সুতরাং দেখা গেল যে, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ অক্ষয়কুমারের মত-বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে এরূপ গ্রন্থ ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি হওয়া অসম্ভব ও অসঙ্গত। কেন না, ইহা কালে আবদ্ধ, সম্প্রদায়ে আবদ্ধ এবং দেশে আবদ্ধ। ব্রাহ্মধর্ম্ম দেশ, কাল ও সম্প্রদায়ে আবদ্ধ হইতে পারে না।

শুধু অক্ষয়কুমার নহেন,—এক দল উৎসাহী ব্রাহ্মও মনে করিতে লাগিলেন যে, এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ ধর্ম্মোন্নতির বিঘ্নস্বরূপ। সুতরাং তাঁহারা অক্ষয় বাবু কর্ত্তৃক এই গ্রন্থের প্রতিবাদ-বক্তৃতাকে "ধর্ম্মোন্নতিসংসাধন" এই নাম দিয়া বাহির করিলেন। রাখালদাস হালদার নামে আর একজন ব্রাহ্ম "ব্রাহ্মদিগের বর্ত্তমান আন্তরিক অবস্থা-বিষয়ক পর্য্যালোচনা" নাম দিয়া প্রকাশ্যতঃ দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের এক প্রতি-

বাদ প্রেরণ করেন। তাহাতে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্ত্তে উক্ত গ্রন্থে বাংলাভাষা-প্রবর্ত্তনের কথা বলা হয়, এবং আরও একটি গুরুতর অভিযোগ রাখালদাস বাবু করেন যে, ব্রাহ্ম-ধর্ম্মগ্রন্থে বহু স্ববিরোধী বাক্যের একত্র সমাবেশ রহিয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রকাশ বস্তুতঃ তখনকার ব্রাহ্মসমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। স্বপক্ষে দেবেন্দ্রনাথ ও রাজনারায়ণ প্রভৃতি, বিপক্ষে অক্ষয়কুমার, রাখালদাস হালদার প্রভৃতি। সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে সমস্ত ব্রাহ্মগণ তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া প্রথম হইতেই অস্বীকার করিয়াছেন। দেবেন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকালে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিবর্ত্তন ও বিকাশের যে চিত্র ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাও এই ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ, উপেক্ষা এবং অগ্রাহ্য করিয়াই ফুটিয়া উঠিয়াছে। পরন্তু পরবর্ত্তিগণ দেবেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া অক্ষয়কুমারের প্রতিবাদ-বক্তৃতার উপদেশ অনুসারে অক্ষয়কুমারকেই অনুসরণ করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রভাব কি দেবেন্দ্রনাথের সমকালীন ব্রাহ্মগণ, কি তাঁহার পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণ কেহই বিশেষ স্বীকার ত করেনই নাই। পরন্তু প্রকাশ্যে অস্বীকার করিয়াছেন। কোন একটা নূতনধর্ম্মের ধর্ম্মগ্রন্থ,—আপন সম্প্রদায়-মধ্যে এইরূপে উপেক্ষিত হইতে অল্পই দেখা গিয়াছে।

কারণ কি? দুইটি কারণ আমাদের বিবেচনায় আইসে। প্রথম কারণ ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট ধারণা। কেন না, এই ব্রাহ্মধর্ম্মসম্বন্ধে রাজা রামমোহনের ট্রাষ্ট-ডিডে যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষের একটা সাধারণ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম বলিয়াই মনে হয়। যে কোন মনুষ্য অপৌত্তলিক ও ব্রহ্মবাদী হইলেই ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু উপাসনার যে পদ্ধতি রাজা রামমোহনের ব্রহ্মসভায় দৃষ্ট হয়, তাহা ত খুব অসাম্প্রদায়িক নহে। হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রাধান্যই তাহাতে লক্ষিত হয়।

রামমোহনের ব্রহ্মসভার উপাসনাপদ্ধতির হিন্দুবিশেষত্বের উপরেই দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মকে এই হিন্দু-বিশেষত্বের দিক্ হইতেই দেখিয়াছেন। পক্ষান্তরে অক্ষয়কুমার ব্রহ্মসভার ট্রাষ্টডিডের উপরে লক্ষ্য রাখিয়া, ব্রাহ্মধর্ম্মকে অসাম্প্রদায়িকভাবে দেখিবার চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং কি দেবেন্দ্রনাথ, কি অক্ষয়কুমার ইঁহারা কেহই রামমোহনের ব্রাহ্মধর্ম্মের পূর্ণ স্বরূপটি দেখিতে পারেন নাই। ইঁহারা দুইজনে একই বস্তুর দুইটি বিভিন্ন দিক্ দেখিয়া, প্রত্যেকেই আপন আপন দিক্‌টাকেই সমগ্র ও পূর্ণ বস্তু বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। এই জন্য দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ প্রকৃত প্রস্তাবে—ব্রাহ্মদের ধর্ম্মগ্রন্থ হইবার যোগ্য নহে। ইহা অসম্পূর্ণ গ্রন্থ। দেবেন্দ্রনাথ যে হিসাবে উপ-নিষদকে খনির সহিত তুলনা করিয়া ইহাকে অসম্পূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন,

সে হিসাবে শুধু অসম্পূর্ণ নহে। অক্ষয়কুমারের অসাম্প্রদায়িক সংগ্রহ-প্রণালীও খুব উচ্চ শ্রেণীর মীমাংসা নহে। উহাও বৈদেশিক প্রণালীর অন্ধ, নিষ্ফল ও নিরর্থক অনুকরণ মাত্র। রামমোহন ঐরূপ সংগ্রহ-প্রণালীর (Electicism) পক্ষপাতী ছিলেন না। যাঁহারা Precepts of the Jesus এর মধ্যে ঐরূপ প্রণালী রাজা অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা রাজার প্রণালীও বুঝেন নাই এবং Electic প্রণালী সম্বন্ধেও অজ্ঞ।

দ্বিতীয় কারণ, যে জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থ সমকালীন ও পরবর্ত্তী ব্রাহ্মগণের মধ্যে অস্বীকৃত হইয়াছে,—তাহা হইতেছে দেবেন্দ্রনাথের উগ্র প্রভুত্বাভিমান ও অনুদার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য। শাস্ত্রবর্জ্জন দেবেন্দ্রনাথ করিলেন, কিন্তু প্রত্যেক ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের জন্যে একটা প্রামাণ্য শাস্ত্রের আবশ্যক, এই সংস্কারের হস্ত হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন না। কাজেই তিনি স্বয়ং সেই প্রামাণ্য শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে উদ্যোগী হইলেন এবং হিন্দুসমাজ যেমন সমগ্র বেদকে মানিয়া চলে, ব্রাহ্মসমাজও যাহাতে তদ্রূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থকে মানিয়া চলে, ইহাই ছিল দেবেন্দ্রনাথের মনের অভিপ্রায়। শাস্ত্র বর্জ্জন করিয়াও তিনি শাস্ত্রের অনুশাসন ব্রাহ্মসমাজে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিয়াছিলেন।

সেই প্রকার ব্রাহ্মগণ কৌলিক গুরু বর্জ্জন করিয়া আসিলেও, দেবেন্দ্রনাথকেই তাঁহারা ধর্ম্মগুরুর আসনে বসাইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ শাস্ত্র ও গুরুকে তাহাদের ঐতিহাসিক অবিচ্ছিন্ন ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ব্রাহ্মসমাজে নিজের প্রণীত গ্রন্থকে শাস্ত্র বলিয়া এবং স্বয়ং নিজেকে গুরু বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাহা রক্ষা পায় নাই। কেন না, যে ধারা তিনি নিজ হস্তে ছিন্ন করিয়াছেন, সেই ধারার মধ্যে তিনি নিজেকে ও ব্রাহ্মসমাজকে একসঙ্গে গ্রথিত করিতে পারেন নাই।

তার পর ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ যদি আত্মপ্রত্যয়েরই গ্রন্থ হয়, তাহা হইলে সেই আত্ম-প্রত্যয় দেবেন্দ্রনাথের নিজের। নিজের প্রত্যয়কে সকলের,—একটা উন্নতিশীল সমগ্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বলিয়া চালাইবার চেষ্টার মধ্যে এতখানি অসংযত প্রভুত্ব ও উগ্র ব্যক্তিত্বাভিমান আছে,—যাহা বস্তুতঃই "পৃথিবীর খুব অল্প জননায়কদের মধ্যেই দেখা গিয়াছে।"

এখন আমরা দেখিব, ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের মতবাদের বিচার। এই সকল গ্রন্থে দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার নিজের যে শ্লোকটি ভাল লাগিয়াছে, উপনিষদ্ হইতে সেই শ্লোকটিকেই তুলিয়া লইয়াছেন। যেমন মালী কোন একটি পুষ্প-কানন হইতে নানাবৃক্ষের নানাপুষ্প আপন পছন্দমত বৃক্ষ হইতে ছিন্ন করিয়া একত্রে গ্রথিত করে,—দেবেন্দ্র-নাথ উপনিষদ্ কাননে প্রবিষ্ট হইয়া তদতিরিক্ত আর কিছুই করেন নাই। তাঁহার

এই সঙ্কলন-গ্রন্থের প্রামাণ্যের মূল কি? ইহা শ্রুতিবাক্য বলিয়া প্রামাণ্য, না ইহা দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয় বলিয়া প্রামাণ্য? শ্রুতিবাক্য বলিয়া ইহার যে প্রামাণ্য-মর্য্যাদা,—দেবেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দাম্ভিকতার সহিত তাহার গৌরব হইতে এই সমস্ত শ্লোককে ভ্রষ্ট করিয়াছেন। ইহার প্রামাণ্য নির্ভর করিতেছে, তাঁহারই আত্মপ্রত্যয়ের উপর,—প্রাচীন ঋষিদের উপলব্ধির উপর নহে। প্রামাণ্যের কষ্টি-পাথর তাঁহার প্রত্যয়; আর কিছুই নহে। ঋষি-সজ্মপুষ্টের ঐতিহাসিক সত্যোপ-লব্ধির অবিচ্ছিন্ন ধারাকে তিনি এইরূপ অসংযত ঔদ্ধত্যে আঘাত করিয়াছেন। ঋষিরা সেই প্রাচীন যুগে কোন্ উপলব্ধিটাকে কেন সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, কোন্ অবস্থায় কোন্ মন্ত্রের সাক্ষাৎ তাঁহারা পাইয়াছিলেন,—অবস্থাভেদে, কালভেদে আজ তাহা কিরূপে গ্রহণীয়,—এ সম্বন্ধে কোনই সন্ধান দেবেন্দ্রনাথ করেন নাই, এবং আমাদের বিশ্বাস, তদ্রূপ সন্ধানের উপযোগী প্রতিভাও তাঁহার ছিল না।

দেবেন্দ্রনাথ যেমন আত্মপ্রত্যয়ের দোহাই দেন, প্রাচীন ঋষিরাও তদ্রূপ আত্ম-প্রত্যয়েই শ্রুতিবাক্যসমূহ লাভ করিয়াছিলেন। তবে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিদের আত্ম-প্রত্যয় উপেক্ষা করিয়া দেবেন্দ্রনাথের আত্মপ্রত্যয়ে অধিকতর আস্থাবান্ হইবার কি কারণ বিদ্যমান?

ঋষি তাঁহারা—যাঁহারা তত্ত্বের প্রথম সাক্ষাৎ পান ও সেই তত্ত্বকে ঘোষণা করেন। আর সাধক তাঁহারা—যাঁহারা সেই প্রদর্শিত তত্ত্বকে জীবনে সাধনা দ্বারা লাভ করেন। দেবেন্দ্রনাথ আত্মপ্রত্যয়ের বলে এমন একটি তত্ত্বও লাভ করেন নাই, যাহা নূতন অনাবিষ্কৃত, যাহা তাঁহার পূর্ব্বের কোন ঋষিই উপলব্ধিতে পান নাই। তাঁহার স্বাধীন-ভাবে প্রাপ্য (যদি ধরিয়া লওয়া যায়) সমস্ত তত্ত্বই ঋষিদের বহু বর্ষে আয়ত্তীকৃত। ঋষি-দৃষ্টি কেবল পুরাতনের আবছায়া দেখে না, নূতনের সাক্ষাৎ লাভ করে। কিন্তু আক্ষেপ এই, নূতন বাদ দেখিলে আমরা চঞ্চল হইব কেন? দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মানুভূতিতে বিন্দুমাত্রও নূতন উপলব্ধি নাই। পুরাতনের গুটিকয়েক শ্রুতিবাক্যেই তাহা নিঃশেষিত। তার পর আমাদের শ্রুতিবাক্যের বহু ঋষি। বহু ঋষির বিভিন্ন উপলব্ধির একত্র সমাবেশ বলিয়া, শ্রুতিবাক্যে যে আপাততঃ বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহা ঋষিদের মত-বিভিন্নতা মাত্র এবং ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের একার অনু-ভূতির মধ্যে অসামঞ্জস্য ও স্ববিরোধিতার কৈফিয়ৎ কোথায়? ক্রমোন্নতি? এক গ্রন্থে এত বেশী ক্রমোন্নতি বড়ই অশোভন, আমাদের বিবেচনায় যেরূপ উপলব্ধিতে স্বাধীনভাবে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় দেবেন্দ্রনাথের সেরূপ উপলব্ধি ছিল না। তাহা হইতে অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর উপলব্ধি হইতে তিনি নিজের পছন্দমত শ্লোক বাছাই করিয়াছেন। এই জন্যই মন্ত্রের প্রথম দ্রষ্টা, নব নব ধর্ম্মতত্ত্বের প্রথম আবিষ্কর্ত্তাদিগকে